উপক্রমণিকা

মহান দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত এই মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনে আপনাকে স্বাগত। সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ন্যাক (NAAC) মূল্যায়নে 'এ'-গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রকাশিত নির্দেশনামায় স্নাতক শিক্ষাক্রমকে পাঁচটি পৃথক প্রকরণে বিন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল — 'কোর কোর্স', 'ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক ইলেকটিভ', 'জেনেরিক ইলেকটিভ' এবং 'স্কিল' / 'এবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স'। ক্রেডিট পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে বিন্যস্ত এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর কাছে নির্বাচনাত্মক পাঠক্রমে পাঠ গ্রহণের সুবিধে এনে দেবে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ষান্মাষিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ। শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক এই ব্যবস্থা মূলত গ্রেড-ভিত্তিক যা অবিচ্ছিন্ন আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সার্বিক মূল্যায়নের দিকে এগোবে এবং শিক্ষার্থীকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুবিধা দেবে। শিক্ষাক্রমের প্রসারিত পরিসরে বিবিধ বিষয় চয়নের সক্ষমতা শিক্ষার্থীকে দেশের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্তঃব্যবস্থায় অর্জিত ক্রেডিট স্থানান্তরে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীর অভিযোজন ও পরিগ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যাসই এই নতুন শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য।

UGC (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations, 2020 অনুযায়ী সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্নাতক পাঠক্রমে এই সি.বি.সি.এস. পাঠক্রম পদ্ধতি কার্যকরী করা বাধ্যতামূলক— উচ্চশিক্ষার পরিসরে এই নতুন শিক্ষাক্রম এক বৈকল্পিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আগামী ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে এই নির্বাচনভিত্তিক পাঠক্রম কার্যকরী করা হবে, এই মর্মে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমান পাঠক্রমগুলি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের নির্ণায়ক কৃত্যকের যথাবিহিত প্রস্তাবনা ও নির্দেশাবলী অনুসারে রচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেইসব দিকগুলির প্রতি যা ইউ.জি.সি. কর্তৃক চিহ্নিত ও নির্দেশিত।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্ব-শিক্ষা পাঠ-উপকরণ শিক্ষার্থী সহায়ক পরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সি.বি.সি.এস. পাঠক্রমের এই পাঠ-উপকরণ মূলত বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধের কথা মাথায় রেখে আমরা ইংরেজি পাঠ-উপকরণের বাংলা অনুবাদের কাজেও এগিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শিক্ষকরাই মূলত পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন— যদিও পূর্বের পরম্পরা অনুযায়ী অন্যান্য বিদ্যায়তনিক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংযুক্ত অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য আমরা অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছি। তাঁদের এই সাহায্য পাঠ-উপকরণের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলেই আমার বিশ্বাস। এই নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান বিদ্যায়তনিক সাহায্যের জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই পাঠ-উপকরণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি ও প্রকরণে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। একথা বলা বাহুল্য যে, এ বিষয়ে উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের পঠন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত সকল শিক্ষকের সদর্থক ও গঠনমূলক মতামত আমাদের আরও সমৃদ্ধ করবে।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির এই বিদ্যায়তনিক উদ্যোগের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। মুক্তশিক্ষাক্রমে উৎকর্ষের প্রশ্নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার

উপাচার্য

Netaji Subhas Open University

Under Graduate Degree Programme
Choice Based Credit System
Sub. : Honours in Education (HED)
Course : Sociological Foundation of Education
Course Code : CC-ED-03

প্রথম মুদ্রণ : আগষ্ট, ২০২২
First Print : August, 2022

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষার ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

Netaji Subhas Open University

Under Graduate Degree Programme

Choice Based Credit System (CBCS)

Subject : Honours in Education (HED)

Course : Sociological Foundation of Education

Course Code : CC-ED-03

ঃ বিষয়-সমিতি ঃ

সদস্যবৃন্দ

ড: অতীন্দ্রনাথ দে
Director, SoE, NSOU
Chairman (BoS)

শ্রী স্বপন কুমার সরকার
Associate Professor, SoE, NSOU

ড: দেবশ্রী ব্যানার্জী
Professor, Dept. of Education
University of Calcutta

ড: কুতুবউদ্দিন হালদার
Professor, Dept. of Education
University of Calcutta

ড: দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য
Professor, Dept. of Education
University of Kalyani

ড: সনৎ কুমার ঘোষ
Professor, SoE, NSOU

ড: সুমন্ত চট্টরাজ
Professor, SoE, NSOU

ড: পাপিয়া উপাধ্যায়
Asst. Professor, SoE, NSOU

ড: পরিমল সরকার
Asst. Professor, SoE, NSOU

ঃ কোর্স রচয়িতা ঃ

ড: পরিমল সরকার
Asst. Professor, SoE, NSOU

ঃ সম্পাদক ঃ

ড: সুমন্ত চট্টরাজ
Professor, SoE, NSOU

ঃ অনুবাদক ঃ

শুভশ্রী পাল
Research Scholar, SoE, NSOU

ঃ বিন্যাস সম্পাদনা ঃ

ড: পাপিয়া উপাধ্যায়
Asst. Professor, SoE, NSOU

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনোও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

কিশোর সেনগুপ্ত
নিবন্ধক

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

UG : Education (HED)

Course : Sociological Foundation of Education
Course Code : CC-ED-03

Module - 1
Educational Sociology
(সমাজতত্ত্ব শিক্ষাবিজ্ঞান)

একক 1 ❐ **Education and Sociology** 7 – 22
(শিক্ষা ও সমাজতত্ত্ব)

একক 2 ❐ **Sociology as the Foundation of Education** 22 – 37
(শিক্ষার ভিত্তি হিসাবে সমাজতত্ত্ব)

একক 3 ❐ **Education for Socialization** 38 – 61
(সামাজিকীকরণের জন্য শিক্ষা)

Module - 2
Social Thoughts and Indian Social Ethos
(সামাজিক চিন্তাধারা এবং ভারতীয় সামাজিক নীতি)

একক 4 ❐ **Social Thoughts** 62 – 97
(সামাজিক চিন্তা)

একক 5 ❐ **Social Change**
(সামাজিক পরিবর্তন 98 – 119

একক 6 ❐ **Indian Social Ethos**
(ভারতীয় সামাজিক নীতি) 120 – 135

একক 1 ❑ শিক্ষা ও সমাজতত্ত্ব

গঠন

1.1 উদ্দেশ্য

1.2 ভূমিকা

1.3 সমাজতত্ত্ব : সমাজতত্ত্বের অর্থ, প্রকৃতি এবং পরিধি

1.3.1 সমাজতত্ত্বের অর্থ এবং ধারণা

1.3.2 সমাজতত্ত্বের প্রকৃতি

1.3.3 সমজতত্ত্বের পরিধি

1.4 শিক্ষা ও সমাজ

1.5 শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্ব

1.6 সারসংক্ষেপ

1.7 স্ব-মূল্যায়ণ প্রশ্নপত্র

1.8 অভিসম্বন্ধ

1.1 উদ্দেশ্য

এই একক পড়ার পর, ছাত্রছাত্রীরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে অবগত হবেন—

- সমাজতত্ত্বের অর্থ, প্রকৃতি ও পরিধি বিষয়ে সম্যক জ্ঞান অর্জন করবেন।
- সমাজ এবং শিক্ষা কিভাবে পারস্পরিক সম্পর্কিত সে বিষয়ে অবগত হবেন।
- শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্ব বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা লাভ হবে।

1.2 ভূমিকা

এই এককে আমরা শিক্ষার ধারণা, প্রকৃতি এবং পরিধি সম্পর্কে বিশদে জ্ঞান লাভ করব। শিক্ষা এবং সমাজের মধ্যে কিভাবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পর্ক বিদ্যমান এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন পরিবার, ধর্ম, আর্থিক প্রতিষ্ঠান রাজনীতি এবং শিক্ষা কিভাবে পরস্পরের সাথে জড়িত, সেই সম্বন্ধে এই এককে আলোচনা হবে। সাথে শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্বের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হবে।

সুতারাং, এই এককে সমাজতত্ত্ব এবং শিক্ষার সাথে সমাজ ও সমাজের সাথে শিক্ষা কিভাবে জড়িত সেই বিষয়ে বিশদে আলোচনা করা হবে।

মানুষ সমাজিক জীব, বহুধারায় ও বিভিন্নতায় মানুষের সামাজিক জীবনধারা প্রবহমান। সমাজবিজ্ঞান সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনধারার বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছে। খাদ্য ও চাহিদা যে শিশুর জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে, পরিবার ও সমাজ তার মধ্যে সমাজবোধ জাগিয়ে তাকে সমাজিক ছন্দের সাথে মিশিয়ে কেন্দ্রিকতা থেকে সরিয়ে সমাজ সচেতন করে তুলছে এবং সামাজিক নিয়মনীতিতে তার জীবনবোধ জাগিয়ে তুলেছে। বাস্তবিক ক্ষেত্রে, সমাজতত্ত্বের আত্মপ্রকাশের নিরিখে আছে সমাজবিকাশ ও বিস্তারের বহুবিধ ধারা সম্বন্ধে সম্মুখীন সমস্যাদি ও ভবিষ্যত সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিত। শিক্ষার লক্ষ্যই হল সমাজের সাথে সহগতি বিধানের মাধ্যমে উন্নততর সামাজিক জীবনচর্চার নীতি উদ্ভাবন ও কৌশল বিধান। সুতরাং, একথা সহজেই, বলা যায়, সমাজ ও শিক্ষা পরস্পরের সাথে একাত্মভাবে সম্পর্কিত। শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক কৃষ্টি, ঐতিহ্য বংশ পরম্পরায় প্রবাহিত, সংরক্ষিত এবং সঞ্চালিত হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, শিশুদের সমাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার নাম হল শিক্ষা, নিজের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে মানুষ পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে জীবন ধারণ করতে বাধ্য হয় ও সামাজিক রীতিনীতি পালনে বাধ্য থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে উঠে আসে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। যা তাকে সামাজিক ও সমাজের অভিন্ন অঙ্গ হতে সাহায্য করে।

অগাস্ট কোঁৎ তাঁর 'Positive Philosophy' বইতে প্রথম ব্যবহার করেন, 'Sociology' শব্দটি 1837 সালে। ব্যক্তি-ব্যক্তি, গোষ্ঠী-গোষ্ঠী এবং ব্যক্তি গোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানিক সম্পর্ক নির্ধারণ করেন সমাজতত্ত্ব। কোঁৎ শব্দটি তৈরি করেছিলেন, গ্রীক শব্দ 'Societus' যার অর্থ সমাজ এবং ল্যাটিন শব্দ 'Logo' থেকে, যার অর্থ বিজ্ঞান। সমাজতত্ত্বের উৎপত্তি কথা প্রসঙ্গে ডঃ বেলা দত্তগুপ্ত তাঁর 'সমাজবিজ্ঞান' শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন, ''সমাজতত্ত্ব জন্মসূত্রে তিনিটি প্রধান বিষয়ের উপর নির্ভরশীল ছিল। ইতিহাসের সূত্রে আমরা এই তথ্য জানতে পারি। প্রথমত, সমাজবিজ্ঞানের বির্বতনের প্রসঙ্গে, দ্বিতীয়ত, লোকহিত বহুজন সুখ— এর প্রসঙ্গে সৎ চিন্তা এবং তৃতীয়ত, সমাজের অধ্যয়ণ ও গবেষণার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের উদ্যোগ ও সিদ্ধান্ত। জিনসবার্গের মতে সমাজতত্ত্ব হল — ''web or tissue of human interactions and interactions.''

সুতরাং, সমাজতত্ত্ব হল সমাজের বিজ্ঞান সম্মত পাঠ। কাল মার্কস, এমিল, ডুর্কহেইম এবং ম্যাক্স তায়বার সহ সমস্ত সমাজবিজ্ঞানীদের মতে 'পরিবার থেকে রাষ্ট্র' প্রভৃতি সকল প্রতিষ্ঠানগুলির বিচার বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান থেকে প্রাপ্ত তথ্যবলি হল সমাজবিজ্ঞান বা Sociology এর আলোচ্য বিষয়।

1.3 সমাজতত্ত্ব

1.3.1 সমাজতত্ত্বের ধারণা (Concept of Sociology)

প্রথম পর্যায়ে সমাজতত্ত্বকে 'সামাজিক দর্শন' বা 'ইতিহাসের দর্শন' হিসাবে চিহ্নিত করা হত। ঊনবিংশ

শতাব্দী থেকে সমাজতত্ত্ব স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সামাজিক বিজ্ঞান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ফরাসী মনীষী অগাস্ত কোঁৎ (Auguste Comte) ১৮৩৯ সালে 'সমাজতত্ত্ব' নামকরণটি করেন ইংরেজি 'sociology' শব্দটির সৃষ্টি হয়েছে লাতিন শব্দ 'societus' যার অর্থ হল সমাজ (society) এবং গ্রীকশব্দ 'Logos' যার অর্থ হল অধ্যয়ণ বা বিজ্ঞান (Study or Science) থেকে। সুতরাং সমাজতত্ত্বের বুৎপত্তিগত অর্থ হল সমাজের বিজ্ঞান (Science of Society) যা পরিবার থেকে রাষ্ট্র প্রভৃতি সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির বিচার বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান করে। সমাজ ও সামাজিক সম্পর্কের বিস্তারিত আলোচনাও সমাজতত্ত্বের অন্যতম লক্ষ্য। Ross বলেছেন 'Individuality is of no valve and personality a meaningless term apart from social enviroment in which they are developed and made manifest." ব্যক্তি তার সামাজিক পরিবেশ যেখানে সে বড় হয়েছে এবং তার কার্যকলাপের ক্ষেত্র তা থেকে বিছিন্ন হয়ে পড়ে। একক ব্যক্তিত্ব দিয়ে কখনও কোন সমাজ গঠিত হতে পারে না, এবং একক ব্যক্তিত্ব সমাজ সেই ব্যক্তির একক অস্তিত্বের কোন অর্থ হয় না।

বিভিন্ন দার্শনিক ও সমাজতত্ত্ববিদ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজতত্ত্বের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। সমাজতত্ত্বকে যেমন সমাজের বিজ্ঞান বলা হয়, সেই সাথে তাকে সমাজের বিভিন্ন সম্পর্কগুলির বা উপাদানগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের অধ্যয়ণও বলা হয়। তাই বিভিন্ন সমাজতত্ত্বাবিদ বিভিন্নভাবে সমাজতত্ত্বের সংজ্ঞা দিয়েছেন। সমাজতত্ত্বকে জানতে গেলে প্রথমে তার সংজ্ঞা জানা জরুরী হয়ে পড়ে।

সমাজতত্ত্বের সংজ্ঞা (Definition of Socilogy)

Auguste Comte : "Sociology is the science of social phenomena subject to natural and invariable laws, the discovery of which is the object of investigation." আবার ডুর্কহেইম (Emile Durkheim) সেই জায়গায় বলেছেন Sociology is the science of social institutions'. ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber) মনে করতেন সামাজিক কার্যাবলীর অধ্যয়ণ হল সমাজতত্ত্ব, "sociology is the study of human interactions and interrelations their conditions and consequences". কুলারের (J. F. Culler) মতে, "sociology may be defined as the body of scientific knowledge about human relationship.

Gillin and Gillin এর মতে, "Sociology in its broadest sense may be said to be the study of interactions arising from the association of living beings.

বিভিন্ন সমাজবিদ বিভিন্নভাবে সমাজতত্ত্বের সংজ্ঞা দিয়েছেন। এককভাবে কোন সংজ্ঞাই সমাজতত্ত্বের সামগ্রিক দিককে ফুটিয়ে তুলতে পারেনি। তবে সমস্ত সংজ্ঞা একত্রে সমাজতত্ত্বের সামগ্রিক রুপকে ফুটিয়ে তোলে। আসলে সমাজ জীবনের ছবিই হল সমাজতত্ত্ব। সমাজতত্ত্বের উপজীব্য, বিষয় হল সামাজিকতা (Socialness) এবং সামাজিক সম্পর্ক (social relationship), Maclver 'মানবিক সম্পর্কের আলোচনাকেই' সমাজতত্ত্ব বলে অভিহিত করেছেন। মানবিক সম্পর্কের ভিত্তিহল বিভিন্ন সামাজিক কার্যাবলীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ। এই সামাজিক সম্পর্ক ও কার্যাবলীর অভিন্ন অংশ মানুষ বলে, মানুষকে সামাজিক জীব বলা হয়। সুতরাং সমাজতত্ত্ব বলতে সমাজগত সম্পর্কের বিজ্ঞানকে বলা হয়।

1.3.2 সমাজতত্ত্বের প্রকৃতি (Nature of Sociology)

সমাজতত্ত্ব হল জ্ঞানচর্চার একটি স্বতন্ত্রধারা। স্বভাবতই সমাজতত্ত্বের কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। মানব সভ্যতা এবং সামাজিক জীবন সমাজ ছাড়া অচল। প্রত্যন্ত একাকী ব-দ্বীপে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে কোন মানুষের জীবনধারণ করা এককথাই অসম্ভব। জীবনের যে স্তরে বা সমাজে যে উচ্চতায় থাকি না কেন, যত বৈচিত্র্যময় আমাদের জীবন হোক না কেন, সব কিছুর উপরে আমরা মানুষ। পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সহায়তা দিয়ে আমাদের জীবনের কাঠামো তৈরি হয়। আমরা প্রত্যেকে একটা সুনির্দিষ্ট সামাজিক পরিবেশে এবং সুনির্দিষ্ট সংস্কৃতিও কৃষ্টির মধ্যে বড় হয়ে উঠেছে, সেই সমাজের সব বৈশিষ্ট্য ও কৃষ্টি আত্মঃকরণের মাধ্যমে আজ আমরা মানুষ এবং সমাজের অভেদ্য অচ্ছেদ্য অংশ।

শুধু সভ্যতা, পরিবেশ, সংস্কৃতি নয়, মানুষের বাঁচার জন্য পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এক বিশাল ভূমিকা পালন করে। কিন্তু মানুষ শুধু খাদ্যের উপর বেঁচে থাকে না, পারস্পরিক সম্পর্কও বেঁচে থাকার রসদ জোগায়। পশুর জীবন শুধুমাত্র দৈহিক চাহিদা ও ক্ষুধা নিবৃত্তির পূরণে পূর্ণ হলেও, মানুষের জীবনে ওটা সামগ্রিকতা নয়। সে তার চিন্তন, কার্যাবলী এবং জ্ঞানের মাধ্যমে নিজের ছাপ এই পৃথিবীতে ছেড়ে যায়। এই ছাপ ছেড়ে যাওয়ার বাসনার গুরুত্ব দৈহিক চাহিদার থেকে কোন অংশে কম কোন গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই বাসনায় তাঁকে উপলব্ধি করতে সাহায্যে করায় অনেকের মধ্যে সে ও তাদেরই একজন। আর এই উপলব্ধি সমাজ তৈরিতে বিশাল ভূমিকা পালন করছে। সেই সাথে তৈরি হয়েছে বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্ক সমূহ, সামাজিক কার্যকলাপ, বিভিন্ন ধরণের গোষ্ঠী, বিভিন্ন প্রকারের জন সম্প্রদায়, ব্যক্তিত্ব বংশগতি সংঘ সমিতি প্রভৃতি। এর সাথে জন্ম নিয়েছে, বিভিন্ন নিয়মাবলী, প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি সংঘর্ষ, গোষ্ঠী সংঘর্ষ, মতবিরোধ অনেক সময় সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম তৈরি করে যা সামাজিক অস্তিত্বকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দেয়। তবুও মানুষ একসাথে বাঁচে, একসাথে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া স্বপন দেখে সমাজতত্ত্ব সাধারণত মানুষের জীবন ও মানুষের মিথস্ক্রিয়ার কথা বলে। মানুষের সাধারণ কার্যকলাপের মাধ্যমেই সে সমাজে নিজেকে প্রকাশ করে। উদাহরণ হিসাবে ধরা যায়, নেকড়ের মা নেকড়ে সন্তানের জন্মের পরই তাকে চরম বিচ্ছিন্নতার তাকে বড় করে তোলে, তাই সে পশু। যদি কোন মা তার সদ্যোজাতকে ওই নেকড়ে শিশুর মত সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে মানুষ করে তেলে, সেও পশু হিসাবে তৈরি হয়। তার মধ্যে ঠিক-ভূল, ভালো মন্দ প্রভৃতি কোন মূল্যবোধ দেখা যায় না। তার মধ্যে সামাজিকতা, সাংস্কৃতিক মনস্কতা কোন কিছুই দেখা যায় না।

সমাজ বলতে বোঝায় সংঘবদ্ধ, একদল মানুষ যারা তাদের ধারণা, অনুভূতি ও কর্মের বিনিময়ে পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। সমাজ তাদের বিকশিত ও প্রকাশিত করে তোলে। শুধুমাত্র প্রাথমিক চাহিদার জন্য সে সমাজে বসবাস করে না, তার আত্মপ্রকাশের জন্য ও সমাজের অন্তভুক্ত হয়। ব্যক্তি তার অস্তিত্ব ও কল্যাণের জন্য সমাজের উপর নির্ভরশীল। সমাজের অগ্রগতির সাথে সাথে ব্যক্তিরও অগ্রগতি ঘটে। সহযোগিতার সম্পর্কের মধ্যেই সে বেঁচে থাকে। কেন মানুষ এইভাবে অভিব্যক্তি জ্ঞাপন করে? কেন মানুষ সামাজিক ব্যক্তি গোষ্ঠী তৈরি করে? কি কারণে বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি? কেন পূজা এবং প্রার্থনা একই সমাজে চলে? কেন বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব ও স্থানের মধ্যে বিভিন্নতা

আছে? কিভাবে সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্যের পরিবর্তন হয়? কেন কিছু মানুষ সমাজ বিরোধী কার্যে লিপ্ত হয়? আদিম অবস্থা থেকেই মানুষ কোন না কোন একধরনের সামাজিক কাঠামোর মধ্যে বসবাস করে আসছে। সমাজের বাইরে ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্ব অসম্ভব। আর সমাজতত্ত্ব আমাদের চারপাশে ঘটনা সমূহ কেন ঘটছে, কোন ক্রিয়ার জন্য এই ধরনের প্রতিক্রিয়া তৈরি হচ্ছে তার সামগ্রিক রূপ।

1.3.3 সমাজতত্ত্বের আলোচনা ক্ষেত্রের পরিধি (Scope of Sociology)

শুরুর সময় থেকেই, Comte, Marx, Spencer, Giddins, Durkheim, Weber প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানী সমাজতত্ত্বকে একটি আকার দেবার চেষ্টা করে এসেছেন। সমাজতত্ত্ব বলতে সমাজ সম্পর্কিত জ্ঞানকেই বলা হয়। এই কারণে হবহাউস বলেছেন, সমগ্র সমাজ জীবনই সমাজতত্ত্বের আলোচ্যবস্তু। সমাজতত্ত্বের আলোচনা ক্ষেত্রের পরিধি ও বিষয়বস্তু নিয়ে মতপার্থক্যের শেষ নেই। তাই এক্ষেত্রে কোন একটি মত সর্বজন গ্রাহ্য বলে বিবেচনা করা যায় না। এ প্রসঙ্গে বিদ্যাভূষণ ও সচদেব বলেছেন, "It is maintained by some that sociology studies everything and anything under the sun.

Giddens বলেছেন "Sociologyis very broad and diverse subject and any simple generalizations about it as a whole are questionable". বস্তুত সমাজতত্ত্বের সঠিক বিষয়বস্তু কী এবং এই শাস্ত্রটির আলোচনা ক্ষেত্রের সীমারেখা কতদূর পর্যন্ত প্রসারিত এই বিষয়ে সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের আলোচনার মধ্যে ঐক্যমত সুদূরপরাহত। তবে Gibldens এর দেওয়া সমাজতত্ত্বের সংজ্ঞা অনেকাংশে সর্বজন গ্রাহ্য। অর্থনীতি, ইতিহাস, মনোবিদ্যা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজ নৃতত্ত্ববিদ্যার সম্মিলিত শাখা সমাজ বিজ্ঞানের জন্ম দেয়। সমাজবিজ্ঞানে কি পড়ানো হয় এর থেকেও কিভাবে পড়ানো হয়, কোন কোন বিষয়বস্তু এর আলোচনা ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করে। সেটাই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ।

এবার সমাজবিজ্ঞানের পরিধি প্রসঙ্গে আসা থাক। V.F. Calberton লিখেছেন, "Since sociology is as elastic as a science, it is difficult to determine just where its boundaries begain and end, where sociology becomes social psychology and where social psychology becomes sociology, or where economic theory becomes sociological doctrine or biological theory becomes sociological theory, something, which is impossible to decide."

প্রকৃত বাস্তবে, সমাজতত্ত্বের আলোচনা ক্ষেত্রের পরিধি সম্পর্কিত এ রকম অভিমত নিতান্তই অস্পষ্ট ও বিভ্রান্তিকর সমাজতত্ত্বের নিজস্ব ও নির্দিষ্ট আলোচনাক্ষেত্র অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্রের থেকে আলাদা। সমাজতত্ত্ব নিজের পরিধির মধ্যে সেইসব বিষয় ও সমস্যাদি আলোচনা করে, যেগুলি অন্য সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত নয়।

সমাজজীবনের একটি সামগ্রিক ছবি হল সমাজতত্ত্ব, ব্যক্তি ও সমাজ একই মুদ্রার দুই পিঠ। সমাজ

সৃষ্টি হয় মানুষের সাথে মানুষের সংযোগ, সহাবস্থান ও সহযোগিতার ফলে। Fichte বলেছেন, "Man becomes man only among men." শুধুমাত্র সহজাত প্রবৃত্তির ফলশ্রুতির প্রভাবে নয়, প্রয়োজনের তাগিদেও মানুষ সমাজবদ্ধভাবে জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়। মানুষের সবপ্রকার কার্যকলাপ সংগঠিত হয় সমাজের মধ্যে। বেঁচে থাকার লড়াই থেকে শুরু করে সামাজিক অনুশাসনের প্রতি দায়বদ্ধতা, মূল্যবোধ, নিজের সংস্কৃতির প্রতি দায়িত্বশীলতা বা আশা আকাঙ্খার চরিতার্থ করার ক্ষেত্র এবং চরিত্র গঠন সবকিছুই সমাজতত্ত্বের অভিন্ন বিচরণক্ষেত্র।

কিন্তু এত বড় ক্ষেত্রকে আয়ত্তের মধ্যে আনা ও তাকে করায়ত্ত করা খুবই দূরহ কাজ। সেইজন্য সীমারেখা টানা খুব প্রয়োজন। এক্ষেত্রে দুই ধরণের মতামত পরিলক্ষত হয়।

একদল বলেন, সমাজতত্ত্বের মূল বিষয় হল মানবসমাজের বেশ কিছু বিষয় নিয়ে বিশ্লেষাত্মক আলোচনা। তাঁদের মতানুসারে, সমাজতত্ত্বের আলোচনাক্ষেত্র সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের বহুবিধ পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখা এবং সেই সম্পর্কের তাৎপর্য বিশ্লেষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। জার্মান সমাজতত্ত্ব বিজ্ঞানী সিমেলের (Simmel) এর মতে সামাজিক সম্পর্কের বিশেষ কয়েকটি দিক নিয়ে সুক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ সমাজতত্ত্বের বিষয়বস্তু হওয়া উচিত। তাঁর মতে সমাজতন্ত্র হল স্বতান্ত্রিক এবং বিশেষ ধরনের এক সামাজিক বিজ্ঞান। অন্য মতবাদে, সমাজতত্ত্বকে অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের সমন্বিত একটি রূপ হিসাবে প্রতিপন্নকরার কথা বলা হয়। কারণ সামাজিক কার্যকলাপ বহুমুখী, অর্থনীতি, রাজনীতি, নৃতত্ত্ব বা ইতিহাস বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞানের সাথে সমাজতত্ত্ব অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত। বিদ্যাভূষণ ও সচদেবের অভিমতানুসারে "The synthetic school wants to make socilogy a synthesis of the social sciences or a general science". এই মতবাদের প্রবক্তাদের মধ্যে ডুর্কহেইস হবহাইসের নাম উল্লেখযোগ্য।

1.4 সমাজ ও শিক্ষা (Education and Society)

সমাজ ও শিক্ষার মধ্যে পারস্পরিক অভেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির সামাজিকীকরণ ঘটে। আবার কেউ কেউ মনে করেন, সমাজতত্ত্ব সমাজ সংস্কৃতি সঞ্চালনের বাহনরূপে শিক্ষার চর্চা করে। তাই কেউ ভাবেন শিক্ষা ছাড়া সমাজের অস্তিত্ব নেই আবার কেউ প্রাধান্য দেন সমাজ, শিক্ষা প্রচলিত হবার বহু আগেথেকে সমাজের অস্তিত্ব ছিল। এই প্রসঙ্গে বলা ভালো, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল দেশের তথা সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী মানবসম্পদ সৃজন, সংরক্ষণ ও পরিবদ্ধন করা। সুতরাং, শিক্ষা হল সেই সময়কালের সমাজের প্রতিচ্ছবি এবং শিক্ষা সমাজের পরিবর্তন অনুযায়ী নিজেকে পরিবর্তন করে। সুতরাং, সবকিছুর আগে সমাজ এবং সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। তর্কের বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন, সমাজ ও শিক্ষা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত। সমাজপরিবর্তন ও সমাজ প্রগতির পথ প্রদর্শক হল শিক্ষা, শিক্ষার প্রভাবে মানুষ দেশের সম্পদে পরিণত হবে। বর্তমান সমাজজীবনে শিক্ষা জনসাধারণকে জাতীয় আদর্শের অনুগামী করে তুলছে। সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবে শিক্ষা, ব্যক্তিমানব একটি উৎকৃষ্ট জীবনযাপনের উপযোগী করে তোলে এবং ব্যক্তিমানস বানানোর মাধ্যমে সমাজকেও উপযুক্ত

মানবসম্পদ সরবরাহ করা হয়। শিক্ষার মাধ্যমে বংশ পরম্পরায় সামাজিক জীবন যাত্রার রীতি পদ্ধতি এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কৃষ্টি এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মে সঞ্চালিত হচ্ছে। সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার অন্যতম মাধ্যম হল শিক্ষা।

সমাজ সম্পর্কের জালের মাধ্যমে তৈরি। আর এই সম্পর্কগুলিই প্রাথমিক স্তম্ভ হিসাবে কাজ করে, মানুষের ব্যবহারের কারণ ও বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর উত্থানের নিরিখে। তোমরা তোমাদের বাড়িতে নানা ধরনের সম্পর্কের সাথে অবগত আছো, সেই সাথে গোষ্ঠীতে এবং সমাজে বিভিন্ন সম্পর্কের অস্তিত্ব তোমাদের জীবনে আছে। বাড়ির মধ্যে মা, বাবা, ছেলে, মেয়ে, কণ্যা, স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন প্রভৃতি প্রাথমিক সম্পর্কের সাথে যেমন তোমরা পরিচিত। সেই সাথে বিভিন্ন গৌণ সম্পর্ক যেমন কাকা, জ্যেঠা, কাকাতুতো, মাসতুতো — এইসব সম্পর্কের অস্তিত্ব আছে। এছাড়াও তোমাদের জীবনে তৃতীয় আপেক্ষিক সম্পর্ক যেমন বন্ধু, প্রতিবেশী এই ধরনের বহু সম্পর্কের অস্তিত্ব বোঝা যায় আমাদের জীবনে তাদের স্থান ও তাদের প্রভাবের উপর ভিত্তি করে। একজন শিক্ষক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করেন তিনি পড়ান, খাতা দেখেন, গোষ্ঠীবদ্ধভাবে শ্রেণিকক্ষে কাজ করেন আবার বিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজকর্মে সাহায্যে করেন। সেই সাথে সেই শিক্ষক পরিবারের বিভিন্ন কাজে পরিবারের প্রতি দায়বদ্ধশীল থাকেন এবং একইসাথে সমাজের প্রতিও। সুতরাং বলা যায়, প্রাত্যহিক জীবনে একজন ব্যক্তি বিভিন্ন ভূমিকা পালন করেন। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক — একজন ব্যক্তি তাঁরসন্তানের জন্য পিতার ভূমিকা পালন করেন, আবার একইসাথে তিনি তাঁর পিতামাতার সন্তান, তাঁর স্ত্রীর কাছে স্বামী আবার তাঁর ভাইবোনের কাছে দাদা অথবা ভাই, হয়ত শিক্ষক তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য, এইরকম না জানি কত ভূমিকায় একজন অবতীর্ণ হন। ব্যক্তিমানবের ক্ষেত্রে কমক্ষেত্র এবং সেখানে তার ভূমিকা, বিভিন্ন সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবর্তনশীল। প্রত্যেকটা ভূমিকা ((role) একটা সামাজিক অবস্থানের সাথে সম্পর্কিত থাকে, Social Status বলা হয়। এই সামাজিক পদমর্যাদা (Social Status) সামাজিক কিছু নিয়মাবলী ও নৈতিকতাবোধ দ্বারা পরিচালিত হয়। সামাজিক নিয়মাবলী ও নৈতিকতা এবং আর্দশ সমাজের অলিখিত সংবিধানিক কাঠামো। গোষ্ঠীজীবনে একদিকে সেইগুলি যেমন ঐক্য ও সংহতির সৃষ্টি করে, তেমনি অপরদিকে বিচ্ছিন্নতাবোধ ও স্বাতন্ত্র্যবোধের সঞ্চার করে। সুতরাং গোষ্ঠীর স্বরূপ, তার নিয়মনীতি, শৃঙ্খলা, আদর্শ হল সেই সমাজের ধারক ও বাহক।

সমাজ (Society) শব্দটি Latin শব্দ 'Societies' থেকে উদ্ভূত যার অর্থ বন্ধু এবং মিত্র। এই শব্দটি ব্যবহার হয় বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক বা কথোপোকথন বোঝাতে। বিভিন্ন সমাজ চিন্তক, সমাজ নৃতত্ত্ববিদ এবং অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন 'সমাজ কী' বোঝাতে। তার মধ্যে দুটি মতবাদ বহুল প্রচলিত, যা সমাজকে প্রবাহমান রাখে। প্রথম হল 'Social action' এবং অন্যটা হল 'social interaction'. আমেরিকান সমাজতত্ত্বাবিদ্ ম্যাকলিভার ও পেজের মতে "Society as a system of usage and procedures, of authority and mutual aid, of many grouping and divisions of controls of human behaviours and of liberities." তাই, সমাজকে আমরা দেখতে পারি পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে, যেখানে সবাই একই ঐতিহ্য কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং একই পদ্ধতিতে জীবনধারণ করে। কিন্তু এর ব্যবহার শুধুমাত্র গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং গোষ্ঠীভেদে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু গোষ্ঠী ও সমাজ এক নয়। সমাজ একটি বৃহৎ বিমূর্ত ধারণা যেখানে গোষ্ঠী তার একটি ক্ষুদ্র অংশ আমেরিকান

সমাজতত্ত্ববিদ Talcott Parsons, সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক ব্যবস্থার কথা বলছেন এবং সেখানে 'interaction' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 'Interaction' কে তিনি মানুষের ব্যবহারের কারণ হিসাবে দেখিয়েছেন। তাঁর মতে কোন কার্য সামাজিক হয় না যতক্ষণ না সেখানে বহু মানুষের অংশদারিত্ব থাকে। প্রত্যেকে সমাজের অংশ হওয়ায়, প্রত্যেক বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে সমাজেরঅস্তিত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্যে। সুতরাং সমাজকে জানতে গেলে, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বিশদে জ্ঞান থাকা উচিত। শুধু তাই নয়, সমন্বয়, সংহতি ও শৃঙ্খলা ছাড়া কোন সমাজ ব্যবস্থা টিকে থাকতে পারে না। সামাজিক ব্যবস্থা কিছু মূল্যবোধক কিছু রীতিনীতি, প্রথা, আচার বিধিকে প্রাধান্য দেয় যা মানব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত করে রেখেছে। সামাজিক সংস্থাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান গুলি হল-পরিবার, শিক্ষা, ধার্মিক প্রতিষ্ঠানগুলি হল— পরিবার, শিক্ষা, ধার্মিক প্রতিষ্ঠান, অর্থনীতি, রাজনীতি, সামাজিক ক্ষেত্রে এই সমস্ত সংস্থাগুলি বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে সমাজকে সুসংহত রাখতে ও অগ্রগতির পথে প্রসারিত করতে। এই অধ্যায়েই সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যাবলী নিয়ে বিশদে আলোচনা করব।

1. পরিবার (Family)

সামাজিকীকরণের প্রথম প্রতিষ্ঠান হলো পরিবার, পরিবারই শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠনের ভূমিকা পালন করে এবং পিতা-মাতা কারিগর হিসাবে কাজ করেন। শিশুর জীবনে শিক্ষকের ভূমিকায় উপনীত হন পিতা-মাতা এবং বিভিন্ন পারিবারিক সদস্য। এই শিক্ষা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমাদের মধ্যে যেসব গুণাবলী গড়ে ওঠে তার অধিকাংশের ভিত্তি আমাদের পিতা-মাতা, পরিবার থেকেই একটি শিশু আচার আচরণ, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ করে সমাজের বুকে একজন যোগ্য ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। সভ্যতার শুরু থেকে পরিবার সামাজিকরণ প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। পরিবার গোষ্ঠী ও সমাজের মধ্যে সম্বন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করে চলেছে যেটা ব্যক্তি ও সমাজরে মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করে। পরিবার বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে শিশুকে সমাজিকরনের পাশাপাশি, যেমন— বিবাহ নাম সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা ও অস্তিত্ব সংরক্ষণ, সন্তানের জন্ম দেওয়া, সন্তানের যত্ন নেওয়া, সুশীল নাগরিক হিসাবে সন্তানকে লালন পালন, অর্থনীতির ক্ষুদ্রতম অংশ হিসাবে অর্থনীতিকে সচল রাখা। সমাজ ভেদে পরিবারের আকারে ও কর্মসম্পাদনায় বিভিন্নতা দেখা গেলেও পরিবার সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। পরিবার বিবাহ ও আত্মীয়তা নামক প্রতিষ্ঠানগুলির পথে তার সম্পর্ক সম্পাদনা করে।

2. ধর্ম (Religion)

ধর্ম ও এমন একটি প্রতিষ্ঠান সভ্যতার আদিকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সমান গুরুত্বে ও মর্যাদায় নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে, Durkheim বলেছেন "If, religion has given birth to all that is essential in society, it is because the idea of is the soul or religion." তিনি বলেছেন ধর্ম একটি সমন্বিত ব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থায় যেখানে বিশ্বাস ও অভ্যাস একটা বড় ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম কাল মার্কস, তিনি ধর্মকে আফিম বলেছেন, যা হৃদয়হীন সমাজের নির্দশন বহন করে, সমাজ ব্যবস্থায়, ধর্মের সব থেকে শক্তিশালী ভূমিকা হল সামাজিক নিয়ন্ত্রণ।

3. অর্থনীতি (Economy)

অর্থনীতি সমাজ ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। প্রত্যেক সমাজের নির্দিষ্ট রূপরেখা থাকে। উৎপাদন, বিতরণ ও খরচের মধ্যে সেই রূপরেখাই সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোকে সুনির্দিষ্ট করে। যে কোন সমাজ উন্নয়ন কোন অবস্থায় আছে তা নিশ্চিত হয়, অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ও তার প্রয়োজনীয়তার মধ্য দিয়ে। কাল মার্ক্স মনে করতেন, অর্থনীতি সমাজ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি তৈরি করে যার উপর ভিত্তি করে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানগুলি দাঁড়িয়ে থাকে।

4. শিক্ষা (Education)

সমাজ ব্যবস্থাকে সচল রাখতে শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। যদিও সমাজভেদে এর বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। মূলত সব ধরনের সমাজ ব্যবস্থায়, শিক্ষা প্রধানত দুটি ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়, যা সমাজভেদে অভিন্ন। সমাজের প্রত্যেক সদস্যকে সামাজিক করে তোলা এবং সমাজে সংস্কৃতির সঞ্চালনের বাহনরূপে নিজের ভূমিকা সুনিশ্চিত করা। দ্বিতীয়তঃ মানুষকে মানবসম্পদ হিসাবে গড়ে তোলা। বিভিন্ন সামাজিকীকরণ সংস্থা যেমন পরিবার, গোষ্ঠী, সহপাঠীদলের সাথে সাথে প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও শিক্ষা সমাজের বিচলন (Social mobility) প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান প্রদানেরমাধ্যমে আন্তঃস্তর বিচলনে (intergenerational mobility) সাহায্য করে। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষার সমান অধিকারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, যা সমাজে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণিকে উল্লম্বী সামাজিক বিচলনে সাহায্য করে। সমাজ পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। শিশুর মধ্যে সৃজনশীলতা ও সমাজে বেঁচে থাকার গুরুত্বপূর্ণ রসদ শিক্ষার দ্বারা সঞ্চারিত হয়।

5. রাজনীতি / রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান (Polity)

প্রতিটি সমাজের সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়মনীতি, মূল্যবোধ বর্তমান থাকে। রাজনীতিক ব্যবস্থা ও কাঠামো আইন প্রয়োগ করে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে ও জীবনে সেইসব নিয়ম ও মূল্যবোধের সংরক্ষণ করে। বটোমারের (T. B. Bottomore) এর মতে রাজনীতির কাজ হল ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বিতরণ করা সমাজের প্রত্যেকস্তরে রাজনীতির উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। সামাজিক বির্বতনের সাথে সাথে রাজনীতি নিজেকেও অভিযোজিত করেছে, সমাজ ও সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। রাজনীতিক কাঠামো ও ব্যবস্থার উপর সামাজিক ও জীবনধারাগত বিভিন্ন বিষয়ের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

সমাজ চলে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে। বিদ্যালয় ও সমাজ সতত পরিবর্তনশীল, পারস্পরিক নির্ভরশীল সম্পর্কের মাধ্যমে শিক্ষার উপর সমাজতত্ত্বের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। Dewey বলেছেন, "We are apt to look at the school from an individualistic standpoint as domething between teacher and pupil or between teacher and parent".

যদি সমাজকে গঠনতন্ত্রের দিক থেকে ভাগ করা যায়, পরিবার, শিক্ষা, ধর্ম, অর্থনীতি এবং রাজনীতি তার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

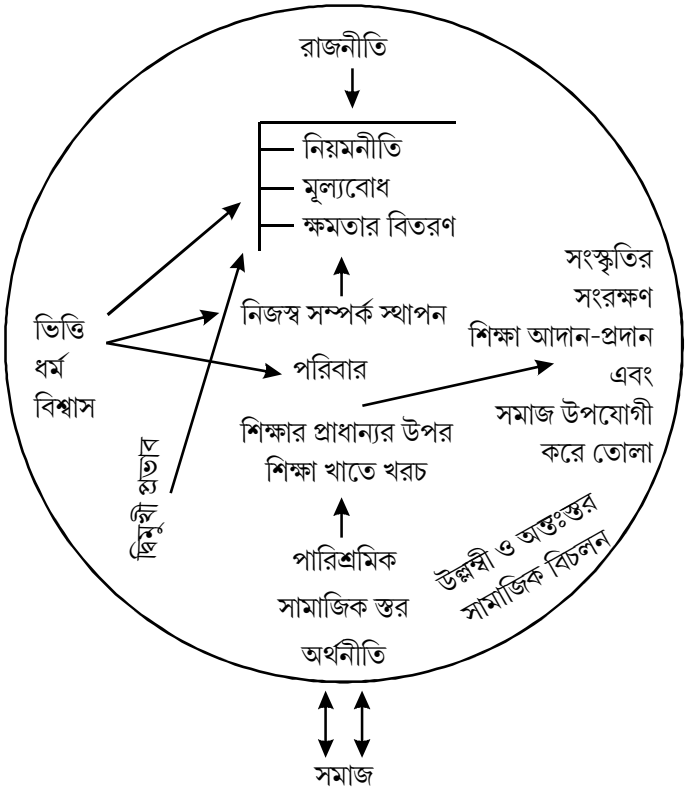

সমাজ ও তার বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক

সমাজ ও শিক্ষার মধ্যে সংযোগ (Society and Education Linkages)

শিক্ষার দ্বারা শিশুর সামাজিকীকরণ সম্ভব। সামাজিকীকরণ হল আত্মসক্রিয়তা এবং অভিযোজনের এক পদ্ধতি যারা দ্বারা শিশুর সামাজিক বিকাশ হয়। শিশুর সামাজিক ও পরিপূর্ণ বিকাশ দ্বারাই সমাজের অগ্রগতি ও বিকাশ সম্ভব। শিশুর সেই বিকাশের জন্য সমাজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। ডুর্কহেইন্সের মতে, একটি বিশেষ সমাজের উন্নত নাগরিক হয়ে ওঠাই ব্যক্তিজীনের প্রধান উদ্দেশ্য, যার সহায়ক প্রক্রিয়া হল শিক্ষা, শুধু তাই নয়, তিনি আরোও বলেছেন, যদি পরিবার শিশুর মধ্যে সামাজিক সংস্কৃতি, রীতিনীতি, মূল্যবোধের প্রাথমিক বীজ বপন করতেও অসমর্থ হয়। শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক দায়িত্ব এটাই শিশুর মধ্যে তা সঞ্চার করা, জন ডিউই বিদ্যালয় ও সমাজের নিবিড় যোগাযোগের কথা বলেন, তিনি বলেছেন, বিদ্যালয় সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ। জন ভিউই তাঁর বিখ্যাত দুটি বই 'School

and Society (1899)', 'Democracy and Education (1916) সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষার গুরুত্বের উপর নিবিড়ভাবে আলোকপাত করেছেন। তার মতে স্কুল ও শিক্ষণ প্রণালীর মূল লক্ষ্য হল সমাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করা। টলস্টয় থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গান্ধী সবাই এককথায় স্বীকার করেছেন, সামাজিক পরিকাঠামোয় শিক্ষার অপরিহার্যতা।

a) সংস্কৃতির সঞ্চালন (Transmission of Culture)

এই পৃথিবী মানুষই তৈরি করেছে। যেকোন সংস্কৃতির প্রাথমিক উপলক্ষ্য হল মানুষ সৃষ্ট এই সংস্কৃতি কৃষ্টি সংরক্ষণ করা এবং সাথে সাথে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে তা বয়ে নিয়ে চলা। অন্যান্য জীব থেকে মানুষের তফাৎ এই সভ্যতা সংস্কৃতিই নির্দেশ করে দেয়। প্রত্যেক সমাজের নিজস্ব কিছু সংস্কৃতি কৃষ্টি থাকে যা তারা সংরক্ষণ করে ও পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে বপন ও সঞ্চালনের মাধমে তার অস্তিত্ব বজায় রাখা হয়। সুতরাং, শিক্ষা ও সমাজের মধ্যে এই সংস্কৃতিই সংযোগ রক্ষা করে চলেছে ও তাদের সন্নিবন্ধ করে রাখে। মানব সমাজের সবকিছুই সংস্কৃতির পরিধির মধ্যে পড়ে। তোমার নিশ্চয় উৎসুকতা তৈরি হচ্ছে সংস্কৃতি কি এবং সমাজ ও শিক্ষার সাথে এর সম্পর্ক কি? টেলর (E.B. Tylor) একজন ব্রিটিশ নৃতত্ত্ববিদ, যিনি বলেছেন সংস্কৃতি হল "a complex whole which includes knowledge, belief, art, law, morals customs and any other capabilities and habits acquired by man as a membe of society". গোড়া থেকেই, প্রত্যেক সমাজের নিজেস্ব রীতিনীতি সংস্কৃতি, কৃষ্টি আছে, যা পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা যেমন পরিবার, গোষ্ঠী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানিক সংস্থার মাধ্যমে সঞ্চারিত হয়।

b) সমাজে অসমতা ও অসামঞ্জতা দূরীকরণ (Reduce Inequality and disparity)

শিক্ষা আমাদের মধ্যে জ্ঞানের সঞ্চার ঘটায় আর সেই অর্জিত জ্ঞান পৃথিবীর সবথেকে শক্তিশালী অস্ত্র। শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে সমাজে স্থিতিশীলতা ও স্থায়িত্ব তৈরিতে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "In finding the solution to our problem, we shall have helped to solve the world problem as well ..... If India can offer to the world her solution, it will be a contribution to humanity." যদিও শিক্ষা জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করে এবং আর্থিকভাবে সাবলম্বী করে তুলতে সাহায্য করে, কিন্তু প্রাচীন ভারতের শিক্ষার দ্বার সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল না, না সেখানে শিক্ষা ক্ষেত্রে সমসুযোগের কোন ছবি দেখা যেত। শিক্ষার সুযোগ উচ্চবিত্ত সম্প্রদায় ও সমাজ ব্যবস্থা উচ্চ শ্রেণীর হাতে সীমাবন্ধ ছিল। ফলে আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে চরম বৈষম্য দেখা যেত। ইংরোপীয় আদলে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরিই হয়েছিল একদল অভিজাত শ্রেণী তৈরি করা যারা ব্রিটিশ সরকারের রথে চাকা নিজেদের কাঁধে রেখে সমাজের অগ্রগতির পথে টেনে নিয়ে যেতে পারে। স্বাধীনতা পরবর্তীযুগে, সংবিধান (Article 21-A & 45) প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার দরজা সর্ব সাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয় এবং বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, সমাজের বঞ্চিত শ্রেণী, পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায় শিক্ষাকে অস্ত্র করে সামাজিক স্তরে এগিয়ে এসেছে। UN Millennium Development

Goal (2000) যে আটখানা লক্ষ্য দিয়েছে তার মধ্যে দুখানা হল — বিশ্বের সবাই যেন প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া এবং দ্বিতীয়তঃ লিঙ্গ সমতার পরিবেশ তৈরি করা। বিশ্বের 189টা দেশ এই লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে, তার মধ্যে ভারতও একজন। এই লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করতে সর্বশিক্ষা অভিযানের সূচনা করা হয়েছে। সেই সাথে নারী শিক্ষার প্রগতির জন্য মহিলা সংঘ (Mahila Sankhya), কস্তুরবাগান্ধী বালিকা বিদ্যালয় (Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya - KGBV) আঞ্চলিকক্ষেত্রে অসামঞ্জস্যতা, বৈষম্য একমাত্র শিক্ষা দ্বারাই দূর করা সম্ভব, তাই আঞ্চলিক অগ্রগতির শিকড় হচ্ছে শিক্ষা এবং এর সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে স্বাস্থ্য ও অর্থনীতি।

c) সমাজের বিচলন ও সমাজের পরিবর্তন (Social Mobility and Social Change)

শিক্ষা সামাজিক জীবনে সবথেকে প্রভাবশালী শক্তি হিসাবে কাজ, যা মানুষকে উন্নতর আর্থ সামাজিক স্তরে গমন করতে সাহায্য করে। শিক্ষা সামাজিক বিচলন ও সেই সাথে সামাজিক পরিবর্তনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। সামাজিক স্তর বিভাজন (Social Stratification) মানুষের সমাজ জীবনের শুরু থেকেই বিদ্যমান। ব্যক্তির বা ব্যক্তি সমষ্টির স্তরবিন্যাসের এক স্তর থেকে অন্য স্তরে স্থান পরিবর্তনকেই বলা হয় সামাজিক বিচলন (Social Mobility)। শিশু ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামো সামাজিক বিচলনের ক্ষেত্রে মোক্ষম ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন সেই পথের দিশারী। সুতরাং বলা যায়, সামাজিক বিচলন আরও একধরনের সমাজতত্ত্বের জন্ম দিয়েছে যা 'anticipartory socialization' নামে পরিচিত। সামাজিক বিচলনের ফলে যখন কোন ব্যক্তি উন্নতর সামাজিক স্তরে বিরাজ করে, তখন জন্মলগ্নে পাওয়া সেই সামাজিক স্তরের সভ্যতা, কৃষ্টি, সংস্কার ভুলে, সামাজিক বিচলেনর ফলে প্রাপ্ত স্তরের সংস্কৃতি পালন করে বা করার চেষ্টা করে।

d) নতুন জ্ঞানের বিকাশ (Development of New Knowledge)

জীবনে অগ্রগতি ও সাফল্যের একমাত্র চাবিকাঠি জ্ঞানার্জন যা কেবলমাত্র শিক্ষার দ্বারা সম্ভব। সমাজ সতত পরিবর্তনশীল সমাজ ও শিক্ষা পরস্পরের উপর নির্ভশীল হওয়ায় সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষার রূপের ও কাঠামোর পরিবর্তন ঘটে ঃ কখনও নতুন জ্ঞান সংযোজিত হয়, কখন বা বর্তমান জ্ঞানের সাথে নতুন উপাদান মিশিয়ে তাকে সময় উপযোগী করে তোলা হয়। আমরা জানি, প্রয়োজনীয়তা উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয় রসদ জোগায়। সভ্যতার আদিলগ্ন থেকে বর্তমান কালের আধুনিক সভ্যতার রূপরেখা নির্ধারিত হয়েছে বিভিন্ন নতুন আবিষ্কার আর নতুন সন্ধানের মধ্য দিয়ে। প্রথমলগ্নে পাওয়া ধাতুর ধারণা, আগুন আর চাকার আবিষ্কার সভ্যতার অগ্রগতির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলো। এই আবিষ্কারগুলিই খাদ্য সংগ্রহকারী মানুষ থেকে খাদ্য উৎপাদনকারী মানুষে পরিণত করেছিল। সভ্যতার পাতা জুড়ে এইরকম শত শত উদাহরণ ছড়িয়ে আছে। সাম্প্রতিকালে ইন্টারনেট সংযোজন, সংযোগ মাধ্যমের বিপ্লব সমগ্র পৃথিবীকে সার্বজনীন গ্রামে (global village) পরিণত করেছে।

সার্বিক উন্নতির চাবিকাঠি হল শিক্ষা। শিক্ষায় ছাত্রকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দক্ষ করে তোলে, সুস্থ

শরীর, মন এবং সামাজিক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিত্ব সারা পৃথিবীকে তার কর্মক্ষেত্র বানাতে পারে। দুর্বল শিক্ষাব্যবস্থা সমাজের অগ্রগতিকে বন্ধ করে দিতে পারে।

সুতরাং, বলা যায়, শিক্ষারব্যবস্থা সমাজের প্রতিটি দিক ও প্রতিটি কোণকে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রথাগত সংস্থা (Formal Education), বিধিমুক্ত সংস্থা (In-formal Education) এবং অপ্রথাগত শিক্ষা (Non-formal education) সবই শিক্ষার আধার, সময় ও কালের প্রকারভেদের জন্য যাদের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। সভ্যতার শুরু থেকে অপ্রথাগত শিক্ষার অস্তিত্ব। প্রথাগত ও বিধিমুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা পরবর্তীকালের সংযোজন, বিধিমুক্ত শিক্ষা হল প্রথাগত শিক্ষা প্রক্রিয়ার বাইরে কোন শিক্ষা, শিখন বা প্রশিক্ষণ— এর ফলে শিক্ষার্থীর শিখন সক্ষমতা বাড়ে এবং জীবনব্যাপী শিক্ষাকে সম্ভবপর করে তোলে।

1.5 সমাজতাত্ত্বিক শিক্ষা (Sociology of Education)

প্রতিটি সমাজের তার কাঠামো অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট কিছু সামাজিক সাংস্কৃতিক চাহিদা থাকে। শিক্ষার দ্বারাই তা একমাত্র পূরণ করা সম্ভব। বর্তমান পৃথিবীতে অকুলান প্রাকৃতিক সম্পদ। পরিবেশের অবক্ষয়, ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। শিক্ষার কাজ হল সেই সমস্ত চাহিদা, সমস্যাকে অতিক্রম করা ও মানবসভ্যতাকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাওয়া। শুধু তাই নয়, সময়ের সাথে সাথে সমাজেরও পরিবর্তন হয়, নতুন কিছু সংযোগত হয় এবং পুরোনো কিছু সভ্যতার আঙিনায় ঝড়ে পড়ে। শিক্ষা সতত এবং সর্বদা সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী নিজের কায়া পরিবর্তন করে। এক সার্থক সমাজব্যবস্থা সমাজতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। এই পর্বে সমাজতাত্ত্বিক শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে—

- শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দ একত্রে কাজ করে সমাজকে সমৃদ্ধ করতে, এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং সমাজের সার্বিক উন্নতির জন্য।
- সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার উপর ভিত্তিকরে শিক্ষার উদ্দেশ্য পাঠক্রম গড়ে ওঠে।
- সমাজের বিভিন্ন উপাদান বিদ্যালয় ও সমাজের উপর ক্রিয়া করে।
- সামাজিক উপাদানগুলি ব্যক্তিমানসকে দায়িত্বশীল মানুষ হিসাবে গড়ে তোলে।
- শিক্ষার উদ্দেশ্য দায়িত্বশীল মানুষ গড়ে তোলা। গণতান্ত্রিক ধ্যান ধারণা ও দায়িত্ব তাদের মধ্যে সঞ্চার করে শিক্ষা গণতান্ত্রিক কাঠামোকে সুনির্দিষ্ট করে এবং রক্ষা করে। দেশভেদে গণতান্ত্রিক কাঠামো ভিন্ন হওয়ায় দেশে ভেদে শিক্ষার পাঠক্রমেও বিভিন্নতা দেখা যায়।
- বিশ্বায়নের ফলে শিক্ষার গুরুত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্তজার্তিক সংস্কৃতি ও কৃষ্টির সাথে ব্যক্তির সুদৃঢ় সম্পর্ক তৈরি করার ক্ষেত্রে শিক্ষার জুড়ি মেলাভার।

- বিশৃঙ্খল সমাজে অগ্রগতি কখনও সম্ভব নয়। প্রতিটি সমাজে কিছু নিয়মনীতি, শৃঙ্খলা, রীতিনীতি থাকে। শিক্ষায় সে আগামী প্রজন্মের মনে ও মননে প্রোথিত করে এবং সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা করে।
- সবার সাথে মানিয়ে চলায় সামাজিক হবার দক্ষতা। শিক্ষা শিশুকে সর্বক্ষেত্রে সমাজের সাথে মানিয়ে চলার মন্ত্র শেখায়।
- বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর সম্মিলিত প্রভাব ব্যক্তিমানসের মধ্যে বর্তমান থাকে।

সমাজতাত্ত্বিক শিক্ষার লক্ষ্য (Scope of Sociology of Education)

সমাজতাত্ত্বিক শিক্ষার লক্ষ্য হল—

- এই শিক্ষা সাধারণতঃ সমাজ, সমাজের রীতিনীতি, গোষ্ঠী, শ্রেণী, পরিবেশ, সামাজিকরণ প্রক্রিয়া দুই বা ততোধিক ভিন্ন সমাজ ও সংস্কৃতির মিলন, সাংস্কৃতিক ব্যবধান ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করে।
- সমাজতত্ত্ব শিক্ষা অন্যান্য বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যস্থ সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে যেমন সামাজিক শ্রেণী, স্তর, বিভিন্ন সামাজিক প্রভাব, সাংস্কৃতিক পরিবর্তন অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম, শিক্ষা, শিক্ষার পাঠক্রম ইত্যাদি।
- সমাজ জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল ভৌগোলিক অবস্থান ও জাতিগত প্রেক্ষাপট। ভৌগোলিক অবস্থান ও জাতিগত প্রেক্ষাপট। ভৌগোলিক অবস্থান ও জাতিগত প্রেক্ষাপট দুটিই নির্দিষ্ট জনবসতির সমাজজীবন ও শিক্ষাকে প্রভাবিত করে, যেমন গ্রামাঞ্চল, শহরাঞ্চল বা উপজাতি প্রধান বসতি ইত্যাদি।
- একটি শ্রেণিকক্ষ কখনও সমস্বত্ত ছাত্র দ্বারা তৈরি হয় না। বিভিন্ন বুদ্ধিমত্তার ও বিভিন্ন সামাজিক স্তরের শিশু মস্তিষ্ক সেখান থাকে। সুতরাং বিভিন্ন শিক্ষাদান প্রণালী সেখানে প্রয়োগ করা হয়, তাদের সামগ্রিক উন্নতির জন্য।
- সারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রদানকারী সংস্থা আছে, যেমন— IBN, ICSE, SSC ইত্যাদি মধ্যে পাঠক্রম ও বিষয়বস্তুর পার্থক্য দেওয়া, সমাজতত্ত্বশ্রয়ী শিক্ষার অন্য একটি প্রধান কাজ হল, কোন সংস্থা সবথেকে উপযুক্ত মানবসম্পদ তৈরি করে তা দেখা।
- সমাজতাত্ত্বিক শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল মানব সমাজের বিভিন্ন সংস্থার যেমন, পরিবার, স্কুল কেমন প্রভাব শিশু জীবনে পড়ে তা বিচার করা।
- শুধু তাই বিদ্যালয় সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ, বিভিন্ন সম্প্রদায়, সভ্যতা, সংস্কৃতি থেকে শিশুরা সেখানে আসে মানবসম্পদে রূপান্তরিত হবার জন্য, স্কুলের গঠন, সহপাঠী গোষ্ঠীর বিশেষ প্রভাব ছাত্রজীবনে লক্ষ্য করা যায়, যা শিশু চরিত্র গঠনে সাহায্য করে।

- শিক্ষার শুরু হয় শিশুর বাড়ি থেকে তার তার পরিবেশ, তার পঠন পাঠনের উপর শিশুর অভিভাবকের পড়াশুনার প্রভাব, পরিবারের আর্থ-সামাজিক প্রভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমাজতত্ত্বশ্রয়ী শিক্ষা শিশু শিক্ষার সাথে উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলির প্রভাব আলোচনা করে।
- সমাজতত্ত্বশ্রয়ী শিক্ষা চিন্তা-চেতনা, মনোভঙ্গি, ন্যায়নীতি প্রভৃতি ব্যক্তির মধ্যে সঞ্চার করে সামাজিক নীতিবিগর্হিত আচার আচরণ যেমন বর্ণবিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতা, লিঙ্গ বৈষম্য ইত্যাদির বিরুদ্ধে লড়ার চেতনা তৈরি করে।

1.6 সারসংক্ষেপ

সমাজতত্ত্ব সমাজ সম্পর্ক আলোচনা করে। ব্যক্তি-ব্যক্তি, গোষ্ঠী-গোষ্ঠী, ব্যক্তি গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করে এবং এই সম্পর্ক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ব্যপ্তিলাভ করে। এই এককে সমাজতত্ত্বকি তার প্রকৃতি ও লক্ষ্য সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আমরা আলোচনা করেছি সমাজ, শিক্ষা ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ও পারস্পরিক সম্পর্ক। শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব শ্রয়ী শিক্ষা কি এবং এদের লক্ষ্য কি এ সম্বন্ধেও আমরা বিশদে জেনেছি।

1.7 স্বমূল্যায়ণ প্রশ্নাবলী (Self Assessment Questions)

1. সমাজতত্ত্ব কী?
2. তুমি কী মনে কর, সমাজতত্ত্বের যেকোন সংজ্ঞা স্বয়ং সম্পূর্ণ অনুধাবন করানোর জন্য সমাজতত্ত্ব কী, নাকি সমস্ত দৃষ্টিকোণ প্রয়োজনীয় সমাজতত্ত্ব কী বুঝতে? তোমার মতে সমাজতত্ত্ব কী?
3. E. George Payne কে ছিলেন?
4. সমাজতত্ত্বের জনক কে?
5. সমাজতত্ত্বের প্রকৃতি বলতে কি বোঝ?
6. Sociological Imagination বলতে কি বোঝ?
7. যেকোন দুটি দৃষ্টিভঙ্গীর উদাহরণ দাও যেটা সমাজবিজ্ঞান ব্যক্তির মধ্যে প্রোথিত করে?
8. সমাজতত্ত্বের তিনটে উদ্দেশ্য বল।
9. কেন সমাজতত্ত্বকে স্বয়ং সম্পূর্ণ বিষয় হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে?
10. কে বলেছিলেন সমাজতত্ত্ব সমাজের বিজ্ঞান?
11. সংস্কৃতি, রীতিনীতি কিভাবে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে?

12. সামাজিক বিচলন বলতে কি বোঝ?

13. সমাজের সাথে সংযোগ আছে এমন দুটি প্রতিষ্ঠানের নাম বল।

1.8 অভিসম্বন্ধ (Reference)

Agarwal, J. C (2002) Theory and Principales of Education (13th ed.) New Delhi : Vikash Publishing House.

Bhatia, K & Bhatia, B. D (1992) Theory and Principales of Education (20th Ed) Delhi : Doaba House.

Bhattacharya, D. C (1996). Sociology (6th ed.) Cacutta Vijoya Publishing House.

Pandey, R.S (2009) Principals of Education (13th Ed) Agra-2, Agrawal Publications.

Ravi, S. S (2015) A comprehensive study of Education (2nd Ed) Delhi : PHI Learning Sharma, Y. K. (2016) Foundation in Sociology of Education, Delhi : Kaniska Publishers.

Saxena, N.R.S (2009) Principles of Education Meerut : Vinay Rakhija

একক 2 ❑ শিক্ষার ভিত্তি হিসাবে সমাজতত্ত্ব

গঠন

2.1 উদ্দেশ্য

2.2 ভূমিকা

2.3 সমাজতত্ত্ব শিক্ষার ভিত্তি

2.4 সমাজতত্ত্বের অভিমুখ

2.4.1 সমাজতত্ত্বের কাঠামোগত কার্যকারিতা

2.5 সমাজতাত্ত্বিক অনুমান

2.5.1 সংহতি

2.5.2 সামাজিক বৈষম্য

2.5.3 পারস্পরিক নির্ভরতা

2.5.4 সমতা ও শিক্ষার ভূমিকা

2.6 সারসংক্ষেপ

2.7 স্ব-মূল্যায়ণ প্রশ্নপত্র

2.8 অভিসম্বন্ধ

2.1 উদ্দেশ্য

এই একক পড়ার পর, ছাত্রছাত্রীরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে ছাত্র-ছাত্রীরা অবগত হবেন—

- শিক্ষার ভিত্তি হিসাবে সমাজতত্ত্বের ভূমিকা
- সমাজতত্ত্বের বিভিন্ন পন্থা সম্পর্কে আলোচনা
- সমতা কি এবং শিক্ষার ভূমিকা সাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে
- সমাজতাত্ত্বিক অনুমান সম্বন্ধে আলোকপাত

2.2 ভূমিকা

এই এককে সমাজতত্ত্বের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে আলোচনা করা হবে। সমাজতত্ত্ব কিভাবে শিক্ষার ভিত তৈরি করে, তাই নিয়ে এই এককে বিশদে আলোচনা করা হবে। শিক্ষা ও সমাজতত্ত্বের মধ্যে সম্পর্কের উপর জোর দেওয়া ও সেই নিয়ে পুনরায় আলোকপাত করা হবে এই এককে। তার মধ্যে সমাজতত্ত্বের বিভিন্ন পন্থা আর ধারণা উল্লেখযোগ্য। এই এককের অন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল সমাজতাত্ত্বিক অনুমান এই পর্ব সমাজতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞান আরোও গভীর করতে সাহায্য করবে।

2.3 সমাজতত্ত্ব শিক্ষার ভিত্তি

শিক্ষা মানুষের সহজাত আচরণ ও প্রবৃত্তিকে সমাজ ও সংস্কৃতির প্রয়োজন অনুযায়ী রূপদান করে। মানুষকে সমাজ ও সংস্কৃতির অনুযায়ী গড়ে তোলাকে আমরা শিক্ষা বলে থাকি। শিক্ষার প্রভাবে প্রকৃতি সৃষ্ট মানুষ সমাজ উপযোগী মানুষে পরিণত হয়। তাই সহজেই বলা যায়—সমাজতত্ত্ব ও শিক্ষা এমন দুটি বিষয় যার মূল অংশে থাকে মানুষ ও তার সামাজিক জীবন। সমাজতত্ত্ব ও শিক্ষার মধ্যে সম্পর্ক তাই একটা তার্কিক বিষয়। সমাজতত্ত্ব ও শিক্ষা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল ও আন্তঃসম্পর্কিত। তাই এই দুটি বিষয়ের অধ্যয়নের বিষয়গুলি প্রায়শই একটি বড় পরিমাণে সমপাতিত হয়ে থাকে। সমাজভেদে চাহিদা রূপান্তরকরণের প্রক্রিয়া ও পথ আলাদা হয়ে থাকে। শিক্ষা একমাত্র সেই প্রক্রিয়া যা সমাজের চাহিদা মেটাতে সাহায্য করে। শিক্ষা শুধুমাত্র সেই সমাজের সংস্কৃতি, কৃষ্টি রীতিনীতি বহন করতে সাহায্য করে না, সেই সাথে সেই সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি, আদবকায়দার সাথে আগামী প্রজন্ম মানিয়ে নিতে সাহায্য করে ও তাকে সমাজ উপযোগী মানুষ হিসাবে গড়ে তোলে। শুধু তাই, সমাজ সতত পরিবর্তনশীল, এই পরিবর্তনশীল সমাজে উদ্ভুত নতুন চাহিদা ও প্রয়োজনীয় নতুন জীবনশৈলীর সাথেও অভিযোজিত হতে সাহায্য করে। সর্বোপরি, নিত্যনতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার শিল্পবিপ্লব, প্রযুক্তিগত উন্নতির জন্য সমাজে শিক্ষার গুরুত্ব সর্বতোভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সমাজের পোষণ, সংরক্ষণ ও সমাজের প্রগতির জন্য শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। একমাত্র শিক্ষাই পারে সমাজকে সামাজিক ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে ও তার অগ্রগতি ঘটাতে। শিক্ষা ও সমাজের সতত পরিবর্তনশীল ও পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে শিক্ষার উপর সমাজতত্ত্বের প্রভাব পরিস্ফুট হয়। আধুনিক বিদ্যালয় হল simplified, purified better balanced society.

- সমাজতত্ত্ব হল সমাজের বিজ্ঞান এবং শিক্ষা হল সেই সমাজতত্ত্বের অন্তর্নিহিত দৃষ্টিভঙ্গী।
- সমাজতন্ত্রে সমাজের গঠনতন্ত্র ও কার্যকারিতা নিয়ে আলোচনা করা হয়। শিক্ষা সমাজেরকেই কার্য সম্পাদনায় সাহায্য করে।
- সমাজতত্ত্বের মূল লক্ষ্য মানুষকে সামাজিক করে তোলা। শিক্ষা মানুষকে সমাজের উপযোগী বানিয়ে তাকে শিক্ষিত করে তোলে।

- সমাজের পরীক্ষাগার ও কর্মশালা হল শিক্ষা।
- সমাজতত্ত্ব শিক্ষার রূপরেখা তৈরি করে এবং সামাজিক চিন্তাধারার উপর ভিত্তি করেই শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার পাঠক্রম ও শিক্ষার পদ্ধতি গড়ে ওঠে যা সমাজের অগ্রগতি ও পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে চলে।
- সমাজতত্ত্বের, তথ্যশালার উপর ভিত্তি করেই শিক্ষার পরিলেখ নির্ধারিত হয় যার মূল লক্ষ্য সমাজের চাহিদা মত মানব সমাজের ও মানব জীবনের রচনা করা।
- সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সুষ্ঠ সামাজিক জীবন তৈরি করার কাজ সমাজতত্ত্ব শিক্ষাকে দিয়েছে।

শিক্ষাবিদ ডটন বলেছিলেন, "The school is a social institution, its aim is social and its management, discipline methods and instructions should be dominated by this idea". অধ্যাপক ডিউই ও গুরুত্ব দিয়েছেন বিদ্যালয়কে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে চিহ্নিত করেন।

এমলি ডুর্কাহইম প্রথম চিহ্নিত করেছিলেন শিক্ষার পাঠক্রমের নির্ধারণের ক্ষেত্রে সমাজতত্ত্বের ভূমিকা অপরিসীম। সৃজন, উন্নয়ন ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সমাজতত্ত্ব ও শিক্ষা পরস্পরের সাথে সুদৃঢ় সম্পর্কে আবদ্ধ, শিক্ষা বিজ্ঞান সমাজতত্ত্বের উপর যতটা নির্ভরশীল, অন্য কোন যে বিজ্ঞানের উপর ততটা নয়।

সমাজতত্ত্ব ও পাঠক্রম (Sociology and Curriculum)

সমাজতত্ত্ব ও পাঠক্রমকে সুনির্দিষ্ট আকার দিতে সাহায্য করে। শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্ব অনুযায়ী, পাঠক্রম তৈরির করার পিছনে প্রধান লক্ষ্য হল সামাজিক লক্ষ্য পূরণ, যাতে ব্যক্তি সমাজের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়। একুশ শতকের সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী মানবসম্পদের সৃজন, সংরক্ষণ ও পরিবর্ধন। শুধু তাই নয়, সমাজ পরিবর্তন ও সমাজ প্রগতির পথ নিদর্শক হল শিক্ষা, তাই বিদ্যালয়ের পাঠক্রমই একমাত্র সুনির্দিষ্ট করে সমাজের তথা দেশের উন্নতি ও অগ্রগতি। তাই সমাজতত্ত্ববিদরা মনে করে সুনির্দিষ্ট ও যথাযথ পাঠক্রম প্রণয়ণ একটি গুরুদায়িত্বের বিষয়। এইজন্য সুচিন্তিত মতামত ও সময় উপযোগী সিদ্ধান্তের প্রয়োজন।

কোন এক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বলেছেন, "Education is not to be confined to the study of a few subjects alone is to be present any epitomized study of the diversified social life".

নিম্নলিখিত সমাজতাত্ত্বিক নীতিকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া উচিত পাঠক্রম রূপায়নের সময়—

- পাঠক্রম তৈরি করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন, পাঠক্রম সামাজিক লক্ষ্যকে পূরণ করতে পারে। বর্তমান সমাজের সমস্যা ও চাহিদা যেন পাঠক্রম তৈরির বুনিয়াদ হিসাবে কাজ করে।
- কিন্তু পাঠক্রম যেন সমাজের বাস্তব সমস্যা ও ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে বানানো

হয়। পাঠক্রম ও শিক্ষণ পদ্ধতি মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে যাতে পাঠক্রম একটি কার্যকারী উপায় হয় সুস্থ সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে।

- পাঠক্রম যেন সেই সমাজের সংস্কৃতি, কৃষ্টির প্রতিচ্ছবি হয় আর এই পাঠক্রমই সামাজিক আদর্শকে আগামী প্রজন্মের মধ্যে বপনের মাধ্যমে বয়ে নিয়ে চলতে সাহয্য করবে।
- বিভিন্ন বৃত্তির মিথষ্ক্রিয়ার ফলে সমাজ চলমান ও গতিশীল থাকে। তাই কোন কাজই ছোট নয়। প্রতিটি কাজের প্রতি, তা সে যত, ছোট হোক বা যত বড় হোক, সম্মান ও কর্তব্য বোধ থাকা খুব প্রয়োজন। পাঠক্রম যেন সেই আদর্শকে আগামী প্রজন্মের মধ্যে বপনের মাধ্যমে বয়ে নিয়ে চলতে সাহায্য করবে।
- বিভিন্ন বৃত্তির মিথষ্ক্রিয়ার ফলে সমাজ চলমান ও গতিশীল থাকে। তাই কোন কাজই ছোট নয়। প্রতিটি কাজের প্রতি, তা সে যত, ছোট হোক বা যত বড় হোঁক, সম্মান ও কর্তব্য বোধ থাকা খুব প্রয়োজন। পাঠক্রম যেন সেই আদর্শকে আগামী প্রজন্মের মধ্যে বপনের মাধ্যমে তা সুনির্দিষ্ট করে।
- ব্যক্তির আচরণে অবিলম্বে পরিবর্তন আনার পরিবর্তে ভবিষ্যতের সামাজিক পরিবর্তনের উপর জোর দেওয়া উচিত এবং পাঠক্রমের ভিত্তি ও দিক নির্দেশ সেই দিকে হওয়া উচিত।
- সমাজের পরিবর্তনের সাথে যে পাঠক্রম সামঞ্জস্যতা রক্ষা করে চলে সেটাই উপযুক্ত পাঠক্রম। তাই পাঠক্রমকে সমাজের মত গতিশীল, সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে নিজেকে প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন করার ক্ষমতা ও নমনীয় হওয়া উচিত।
- পাঠক্রম যেন শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে সক্ষম করে তোলে বাস্তব সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে।
- পাঠ্যক্রম সঙ্গীত শিক্ষা, অঙ্কন, বৃত্তিমূলক, পদার্থবিদ্যা বিষয়, শারীর শিক্ষা, ভাষা শিক্ষা ইত্যাদির পাশাপাশি জৈবিক বিজ্ঞানেরও অন্তভুক্তি আব্যশক।

সমাজতত্ত্ব ও শিক্ষা পদ্ধতি (Sociology and Method of Teaching)

শিক্ষাক্ষেত্রে পঠন পাঠনের ক্ষেত্রে প্রজেক্ট পদ্ধতি, সামাজীকরনের কৌশল অবলম্বন করে গোষ্ঠী আলোচনা এবং গোষ্ঠী গতিবিদ্যার কৌশল পঠন কৌশল হিসাবে অন্তভুক্তি আবশ্যক। ছাত্র-ছাত্রীদের গোষ্ঠী বন্ধ কার্যকলাপ, একত্রে সমস্যা সমাধান পদ্ধতির প্রয়োগ, সাথে বিভিন্ন একত্রে কাজ করানো যায়, ছাত্র-ছাত্রীদের এইসব উপায়ের প্রয়োগ তাদেরকে প্রাকৃতিক জীব থেকে সামাজিক জীব হিসাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। শিক্ষা ছাত্রছাত্রীদের বাস্তব ক্ষেত্রে সামাজিক পরিবেশে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে, তাদের মধ্যে সেই অভিযোজন ও সমস্যা সমাধানের কৌশল বপনের মাধ্যমে তাদের সমাজ উপযোগী হিসাবে গড়ে তোলে। শুধু তাই নয়, সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের স্বার্থে মানুষের বিবেকবোধ ও বিচারবুদ্ধির দ্বারা তার আচার আচরণ নিয়ন্ত্রণ করলে সামাজিক প্রগতির সূত্রপাত ঘটে। তাই সমাজের সাথে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা ও সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা ব্যক্তি বিশেষের থাকা উচিত। সমাজতত্ত্ব তাই

গোষ্ঠীবদ্ধ শিক্ষা প্রণালীর উপর জোর দেন। যেসব শিক্ষণ পদ্ধতি শিশুর গণতান্ত্রিক চৈতন্য ও সামাজিক শৃঙ্খলাপরায়ণতার বিকাশ ঘটাই, সেই শিক্ষণ পদ্ধতিকে আর্দশ হিসাবে পরিগণিত করা যায়।

সমাজতত্ত্বের মতানুসারে, যে শিক্ষণ পদ্ধতি ক্লাসে উপস্থিত প্রতিটি শিশুকে এমনভাবে গড়ে তোলে যাতে তাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা গড়ে ওঠে যা সমস্ত ধরনের বাহ্যিক বাস্তব পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে সাহায্য করে, সেই শিক্ষণ পদ্ধতিই প্রকৃত শিক্ষণ পদ্ধতি। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। শৈশবে যা কিছু সে শেখে, তাই দিয়ে সে তার সামাজিক জীবন অতিবাহিত করে। সুতরাং প্রাপ্ত জ্ঞান ও দক্ষতা ব্যবহার করে একজন ব্যক্তি সমাজের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হওয়া উচিত। শিক্ষাদানের জন্য সামাজিক জীবনের সমস্ত সম্ভাব্য সামাজিক সম্পদ ও সম্মিলিত সামাজিক শক্তি ব্যবহার করা উচিত যাতে সামাজিক সমন্বয়ের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা ও গুণের বিকাশ হয়।

শিক্ষণ পদ্ধতির লক্ষ্য হওয়া উচিত যাতে সমাজ উপযোগী সঠিক সামাজিক ব্যবহার তাদের মধ্যে গড়ে তোলা বাস্তব সমাজে তা ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকৃত মানুষ হয়ে তোলা সম্ভব হয়। যাতে সবরকম পরিস্থিতিতে তারা সমাজের সাথে মানিয়ে নিতে পারে।

সামাজিক সহ-সম্পর্ক বাড়ানোর জন্য সমাজের সামাজিক ক্ষমতার স্রোতগুলিকে শিক্ষণ পদ্ধতিতে ব্যবহার করা উচিত। এখন যেমন অনলাইন কেনাকাটা, ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহার সমাজজীবনকে প্রভাবিত করেছে এগুলিকেই সামাজিক ক্ষমতার স্রোত বলা হয়।

শিক্ষণ পদ্ধতিতে যদি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক রীতিনীতি ও সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান অন্তভুক্তি করা যায়, তাহলে সামাজিক চৈতন্য লাভের পথটা আরোও সহজ হয় আগামী প্রজন্মের কাছে।

শিক্ষণ পদ্ধতিতে যদি সিমস্যা সমাধানে ও গঠনমূলক চিন্তাভাবনার মেলবন্ধন ঘটানো যায়, তা আদর্শ সামাজিক ছাত্র-ছাত্রী গড়ে তুলতে সাহায্যে করবে।

এই আদর্শগুলি লাভ করার জন্য প্রকল্প ও গোষ্ঠী পদ্ধতির, শিক্ষণ প্রণালীতে সংযোজন বেশির ভাগ শর্ত পূরণ করে।

শিক্ষার্থীরা সমবায় শিক্ষা পদ্ধতির প্রতি আরোও ভালো প্রতিক্রিয়া দেখার কারণ এচটা গোষ্ঠী মিথস্ক্রিয়ার সক্রিয় পরিবেশ তৈরি করে।

সমাজতত্ত্ব ও শিক্ষক (Sociology and Teacher)

একজন শিক্ষককে শেখানোর আগে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সমাজতাত্ত্বিক দিকে উপর গুরুত্ব দেওয়া হল সেগুলি হল—

- শিক্ষকের সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়া উচিত।
- সমাজের গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর শিক্ষকের সম্যক ধারণা থাকা উচিত। কারণ তার অর্জিত জ্ঞান ও ধ্যান ধারণা ছাত্র-ছাত্রীদের বহুলাংশে প্রভাবিত করবে।
- একজন শিক্ষকের জানা উচিত সমাজের অগ্রগতিকে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কার কি ভূমিকা এবং শিক্ষা ও শিক্ষণ পদ্ধতিকে সেইভাবেই সাজানো উচিত যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা সমাজের অগ্রগতির কান্ডারী হতে পারে।
- শিক্ষকের দক্ষতা থাকা উচিত যাতে তিনি তাঁর অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা সুচারুভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারেন এবং তাদেরকে সমাজের উপযোগী করে তুলতে পারেন।
- সামাজিকরণ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে শিক্ষকের সম্যক ধারণা থাকা উচিত। সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা উচিত যাতে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সেই জ্ঞান সঞ্চারিত হয় ও বিস্তারিত লাভ করে, তার মধ্য দিয়েই একমাত্র সমাজের অগ্রগতি সম্ভব।

শিক্ষা সমাজ ও সামাজিকরণের প্রক্রিয়া (Education as a Process of Social System and Socialization)

শিক্ষা একটি আন্তঃসংযুক্ত এবং সংগঠিত ক্রিয়াকলাপ যা এমন কতকগুলি অংশ নিয়ে গঠিত যা সাধারণত আন্তঃনির্ভরশীল ও পারস্পরিক আদান প্রদানের মাধ্যমে সংযুক্ত এমন কিছু সামাজিক ব্যবস্থা দ্বারা তৈরি হয়। এবং যা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী, উপলব্ধি, বিশ্বাস, অভ্যাস এবং প্রত্যাশা দ্বারা শক্তিশালী হয়। সামাজিক ব্যবস্থায় দুই বা ততোধিক মানুষের পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া ঘটে তাদের এরকম দৃষ্টিভঙ্গী, সমাজের প্রতি মনোভাব ও ব্যবহার এবং তাদের একই রকম সামাজিক মূল্যবোধের দ্বারাই এই মিথষ্ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সমাজ তার সভ্যতা কৃষ্টি, রীতিনীতি নৈতিকতাবোধ প্রভৃতি আগামী প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চার করে, ঐতিহ্যের সংরক্ষণ করে ও সমাজকে গতিশীল রাখে।

শিক্ষা সামাজিক প্রক্রিয়া (Education as a Social Process)

(i) শিক্ষা সামাজিক পটভূমিতেই সম্ভব হয় এবং সমাজের দ্বারাই প্রভাবিত হয়।

(ii) স্কুল একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান যা আগামী প্রজন্ম শিক্ষিত করে।

(iii) শিক্ষা আগামী প্রজন্মকে গঠনের মাধ্যমে সমাজকে গঠন করে ও সমাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করে।

শিক্ষা সামাজিকরণের প্রক্রিয়া (Education as a process of socialization)

- সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ার ফলে শিক্ষা সম্ভব।
- বিধিমুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের বাইরে সংগঠিত হয়।

- শুধুমাত্র নির্দেশনা ও জ্ঞান বিতরণের মধ্যে শিক্ষা সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষার পরিধি ব্যাপক ও সুগভীর।
- প্রথাগত শিক্ষার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও দিক থাকে।

শিক্ষা সামাজিক প্রণালী (Education as a Social System)

শিক্ষা ব্যবস্থা বিভিন্ন উপব্যবস্থা (sub-system) এর সম্বন্বয়ে গঠিত। মানুষের দেহ যেমন বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সম্বন্বয়ে গঠিত, এবং সুষ্ঠভাবে প্রতিটি অঙ্গ অঙ্গ কাজ করলে তবেই মানব শরীর সুস্থ থাকে। ঠিক তেমন যদি বিভিন্ন উপব্যবস্থা নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্ম সুষ্ঠভাবে পালন করে, তবেই শিক্ষা এবং শিক্ষা ব্যবস্থা ফলপ্রসু হয়। প্রতিটি উপব্যবস্থা শিক্ষা নামক প্রতিষ্ঠানের অধীনে একত্রে কাজ করে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের উপর নির্ভরশীল সুষ্ঠভাবে কর্মসম্পদানের জন্য।

Willard Waller পাঁচখানা কারণ দেখিয়েছেন শিক্ষাকে সামাজিক প্রণালী হিসাবে স্বীকৃতি দেবার পিছনে, সেই কারণগুলি হল—

- বহুবিধ মানুষ শিক্ষা ব্যবস্থায় কাজ করেন এবং তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্যকে অর্জন করতে সাহায্য করে। এটা কোন ব্যক্তিমানসদের একার প্রচেষ্টায় সম্ভব নয়।
- বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মিথষ্ক্রিয়ার ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামাজিক কাঠামো ও অবয়ব তৈরি হয়েছে।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি ইট বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক সম্পর্ক, সহযোগিতা ও নির্ভরশীলতার ফলাফল।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমাজের সাথে একাত্মতার আর ঘনিষ্ঠার ফসল।
- যেহেতু সমাজের রীতিনীতি, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি প্রভৃতি আগামী প্রজন্মের মধ্যে বপন হয় শিক্ষা দ্বারা, তাই সামাজিক আর্দশ ও তার প্রভাবে শিক্ষাক্ষেত্রের নিজস্ব সংস্কৃতি, রীতিনীতি ও নিজস্ব পদ্ধতি আছে বার দ্বারা আগামী প্রজন্মের সামাজিকরণ প্রক্রিয়া চলে।
- শিক্ষা সমাজের লোক সংস্কৃতি এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানিক লক্ষ্য ও সংকল্পকে সমাজে বয়ে নিয়ে চলতে সাহায্য করে।

শিক্ষার সাথে সামাজিক পরিবেশ নিবীড়ভাবে সম্পর্কিত। শিক্ষা ব্যক্তিকে সামাজিক অভিযোজনে সহায়তা করে, শিক্ষা তার মধ্যে বিভিন্ন জৈবিক দক্ষতা, জ্ঞান মনোভাব, মূল্যবোধ ইত্যাদির বিকাশ ঘটিয়ে তাকে সমাজের উপযোগী করে তোলে। সামাজিক সম্পদ ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তৎসহ বিভিন্ন সম্পর্ক যেমন পিতা-মাতা, বন্ধু-শিক্ষক, কর্মী ইত্যাদি বিভিন্ন উপাদান শিক্ষা ক্ষেত্র সুদৃঢ় ও মানুষকে সামাজিক ও সংস্কৃতিবান হিসাবে গড়ে তোলে। সমাজতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হওয়ায় শিক্ষার দুই প্রকার গঠনতন্ত্র আছে - প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ গঠনতন্ত্র। পরোক্ষ গঠনতন্ত্র সামাজিক কেই সব সম্পর্কগুলোকে বোঝায় যা সামাজিক

প্রতিষ্ঠানকে সচল রাখতে ও তার অগ্রগতিতে সাহায্য করে। যখন কোন স্কুলে ঢুকি, আমরা স্কুলের অফিস, স্কুলে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী, স্কুলের বিভিন্ন ঘর ইত্যাদি দেখি যা স্কুলের বাহ্যিক কাঠামো তৈরি করে। স্কুলের মূল ভিত্তি হল যা হৃদস্পদনের কাজ করে তা হল শ্রেণিকক্ষে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক। যাদিও বিভিন্ন শ্রেণিকক্ষের গঠন সজ্জা, বসবার ব্যবস্থা, আঞ্চলিক পারিকাঠামো, শিক্ষা প্রদান কৌশল, শ্রেণীকক্ষের আয়তন, ছাত্র-ছাত্রীর প্রকারভেদ বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বিভিন্ন রুম হয় যা সম্পর্কের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাব ফেলে। শ্রেণী কক্ষ ভেদে বিভিন্ন পরিবেশ ও সামাজিক গঠনতন্ত্র পরিলক্ষিত হয়। শুধু তাই নয়, সমাজের এক বিস্তৃত অংশ জুড়ে এর অস্তিত্ব ও এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, তার মধ্যে আঞ্চলিক গোষ্ঠী, রাজ্য, কেন্দ্র কর্তৃক দ্বারা আনয়িত নিয়ম ও নিয়মাবলীর প্রভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং বলা যায়, শিক্ষা ব্যবস্থা এমন একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেখানে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী, ছাত্র-ছাত্রী, বিদ্যালয়, পাঠ্যপুস্তক এবং বিভিন্ন সহযোগী উপকরণ একসাথে পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে সামাজিক পরিবেশ তৈরি করে। Gatzels এর মতানুসারে "Social system model is best suited for education system, because it emphasize on process of synthesizing the society with its culture, values, socio-economics, political system with the need of the individuals". বিদ্যালয়ের প্রতিটি সদস্য, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, বিদ্যালয় প্রধান এবং অন্যান্য সকলে নিজেদের অবদান ও যোগদান রাখেন যাতে শিক্ষা তার লক্ষ্য পরিপূর্ণ করতে পারে। বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকরা তাঁদের শ্রেণীকক্ষে নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রাখেন, ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করেন, এবং সমস্ত ধরনের দায়িত্ব পালন করেন যা তাঁর পক্ষে সম্ভব। বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের পাশাপশি বিভিন্ন ধরনের ক্রিয়াকলাপ হয় যা সেই সমাজের সংস্কৃতি, নিয়ম, রীতিনীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং এই সব কার্যকলাপ সামাজিক প্রক্রিয়াকে সচল রাখে। সুতরাং, ব্যক্তির নিজেস্ব ও সংস্থার সাফল্য অনেকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল যেমন, লক্ষ্য, চাহিদা, সন্তোষবোধ, ভূমিকা এবং প্রত্যাশার। শিক্ষা নামক প্রতিষ্ঠানে বিদ্যালয় তৈরির পিছনে কিছু লক্ষ্য ও চাহিদা থাকে এবং বিদ্যালয়ের গঠনতন্ত্র সেইসব চাহিদার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে যাতে লক্ষ্য পূরণ হয়। বিদ্যালয়ের পরিবেশ গঠিত স্বতন্ত্র ব্যক্তি বিশেষের নিজেস্ব চাহিদা ও পারস্পরিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে। যাকে সামাজিক ব্যবহার রূপে চিহ্নিত করা হয়। সমাজরে এক বিশাল চাপ বিদ্যালয়ের উপর পরিলক্ষিত হয় যাতে বিদ্যালয় আগামী প্রজন্মকে সময় উপযোগী ও সমাজ উপযোগী করে গড়ে তুলতে পারে। সমাজভেদে বিদ্যালয়ের উপর সামাজিক চাহিদার প্রকারভেদে পরিলক্ষিত হয়, আর সেই চাহিদার প্রকারভেদ অনুসারে, বিদ্যালয়ের শিক্ষার ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য ভিন্ন ভিন্ন সমাজে দেখা যায় এবং সেই অনুযায়ী বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের অভিমুখ ও কৌশল সুনির্দিষ্ট করা হয়। বিদ্যালয়ের লক্ষ্যই বিদ্যালয়ের কার্যকলাপের দিশারী। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি সদস্যের নির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব ও কর্ম সম্পাদনার দায়িত্ব থাকে, সেই সাথে তাঁদের ব্যক্তিগত প্রাক্ষেভিক ও তাঁদের সেই কাজকে আরোও সুদুরপ্রসারী ও ফলপ্রসু করতে সাহায্য করে। বন্ধুদের সাথে কথোপকথন ও কর্মসম্পাদন আগামী প্রজন্মকে সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। সুতরাং, বিভিন্ন ঐতিহ্য সাংস্কৃতির পাঠস্থান হয়ে ওঠে বিদ্যালয়। বিদ্যালয় শিশুকে সামাজিকীকরণের মাধ্যমে তাঁর মধ্যে সমাজবোধ এবং আভন্তরীণ বিভিন্ন দক্ষতা সৃষ্টিতে এক সদর্থক ভূমিকা পালন সাহায্য করে। বিদ্যালয় সমাজের ক্ষুদ্র অবয়ব, পরিকাঠামোগত দিক থেকে সমাজের যেমন উচ্চতর থেকে নিম্নস্তর পর্যন্ত প্রতিটি ব্যক্তির স্থান অনুযায়ী বিভিন্ন ভূমিকা ও দায়িত্ব থাকে, বিদ্যালয়ও

তা থেকে অভিন্ন নয়। বিদ্যালয় ব্যবস্থা এই সমস্ত অবস্থানগত দায়িত্বের পারস্পরিক সম্পর্ক ও মিথষ্ক্রিয়ার ফলে সুশৃঙ্খলভাবে চলে। আর এইজন্যই বিদ্যালয়কে সামাজিক ক্ষুদ্র সংকলন বলা হয়।

সুতরাং এ কথা বলা যায়, সামাজিকতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে যদি বিদ্যালয়ের অবস্থান বিচার করা না হয়, তাহলে সামাজিক ক্ষেত্রে বিদ্যালয় কি ও তার ভূমিকা কি তা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সভ্যতার শুরু থেকেই তাই শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করা হয়েছিল সমাজের প্রতিটি স্তরে। সেইজন্যই শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা প্রদান সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই সমাজতত্ত্ব শুধু সমাজ নিয়ে আলোচনা করে শুধু তাই নয়, শিক্ষা নিয়েও সমানভাবে আগ্রহী ও দায়িত্বশীল।

2.4 সমাজতন্ত্রের মতবাদ

সমাজের সাথে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক আলোচনায় সমাজতত্ত্বের উদ্দেশ্য। সমাজতত্ত্বের বিভিন্ন মতবাদ সুচারুভাবে ব্যক্তির ব্যবহার তার সাথে সম্পর্ক বোঝাতে সাহায্য করে, তাদের মধ্যে উল্লেখ্য মতবাদগুলি হল— Structural Functionalism, Social Conflict Symbolic Internationalism এবং Feminism এই অধ্যায়ে 'Structural Functionalism' এর উপর শুধু আলোকপাত করা হবে।

2.4.1 সাংগঠিক ক্রিয়াবাদ (Structural Functionalsim)

দুর্কেম মনে করতেন সমাজবিজ্ঞান, যার মূল লক্ষ্য হল সংগঠিত সামাজিক বাস্তবতাকে তুলে ধরা। তাঁর মতে সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার জন্য এবং তাদের পারস্পরিক ক্রিয়ার জন্য সমাজ নামে প্রতিষ্ঠানটি স্থায়িত্ব লাভ করে। মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও একসাথে কাজ করার জন্য মানবদেহে যেমন সুস্থ ও সুন্দর থাকে, ঠিক, তেমনই বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক সম্পর্ক ও ক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে সমাজ চলে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এই মতবাদে সমাজের অঙ্গ হিসাবে প্রতিপন্ন করা হয় এবং সমাজকে সুস্থ সবল রাখতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঠিকভাবে কর্ম সম্পাদন করা আবিশ্যিক। সমাজের প্রতিটি সদস্য যদি সামাজিক রীতিনীতি, নিয়মকানুন সঠিকভাবে মেনে চলে। সেটা সুস্থ স্বাভাবিক ও প্রগতিশীল সমাজের জন্ম দেয়। সাংগঠিক ক্রিয়াবাদ অনুসারে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য হল শিশু ও আগামী প্রজন্ম সমাজ উপযোগী করে তোলা। সামাজিকীকরণের মাধ্যমে সমাজের রীতিনীতি, সংস্কার-সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, জ্ঞান প্রভৃতি আগামী প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত হয় ও তাদের সমাজের সদস্য হিসাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

যদিও এই উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে সক্রিয় পাঠক্রম তৈরি হয়েছে, কিন্তু 'hidden' পাঠক্রম হিসাবে এর ভূমিকা অপরিহার্য এবং এই সাংগঠিক ক্রিয়াবাদের উপর ভিত্তি করেই, সমাজ ব্যবস্থার রীতিনীতি রক্ষিত ও সুরক্ষিত হয় যা সাংগঠিক ক্রিয়াবাদের পাঠক্রমের ভিত্তিতে শিশুমনে বপিত হয় ও তাকে আগামী দিনের উপযোগী করে তোলে। বিদ্যালয়ে শিশুর সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া চলে, যার মাধ্যমে

শিশু সমাজের উপযুক্ত হিসাবে তৈরি হয়। শুধু তাই, সামাজিক ক্ষেত্রে, কর্মক্ষেত্রে যেসব চাহিদা তৈরি হয়, শিক্ষা শিশুকে উপযুক্ত তৈরি করে সেই সব ক্ষেত্রের চাহিদা পূরণ করে। শিশুকে তার মান ও তার ক্ষমতা অনুসারে শিক্ষা তাকে তৈরি করে কর্মক্ষেত্রের উপযোগী বানায় ও তাদের কর্মক্ষমতা তৈরিতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। শিক্ষাক্ষেত্রে যারা কৃতী, সাধারণত তারা কর্মক্ষেত্রেও কৃতী এবং সেইভাবেই যারা শিক্ষাক্ষেত্রে নিজেদের ছাপ ছাড়াতে পারে না, তারা কর্মক্ষেত্রেও সেইভাবে কোন গুরুত্বপূর্ণ পদের অধিকারী হন না এবং সমাজের কোন দায়িত্বশীলপদের দায়িত্বভারও পান না।

এমিলি দুর্কেম (1858-1917) হলেন সেই ব্যক্তি যিনি প্রথম অনুভব করেছিলেন শিক্ষার গুরুত্ব এবং সামাজিক ক্ষেত্রে তার প্রয়োজনীয়তা। তিনি বলতেন সমাজের অস্তিত্ব তখনই সুরক্ষিত হবে যখন এর প্রত্যেক সদস্য একটা নির্দিষ্ট সীমা অনুযায়ী সমস্বত্ব অবস্থায় আসীন থাকবে। শিক্ষা সাধারণত সামাজিক ক্ষেত্রে, সেই কাজটিই করে থাকে। শিক্ষা সাধারণত সেই সমস্বত্বকে চিরস্থায়ী ও শক্তিশালী হিসাবে গড়ে তোলে। শিশু জীবনের প্রারম্ভিক সময় থেকে যাতে সামাজিক জীবনে সেই গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে গড়ে ওঠে।

দুর্কেম তাই শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিচার না করে, তার আদর্শ ও কাজগুলিকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

শুধু তাই নয়, বয়স্ক শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্যই হল যেসব বয়স্ক প্রবীণ সমাজের উপযোগী হিসাবে তৈরি হননি, তাঁদের সেই শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে সমাজ উপযোগী হিসাবে গড়ে তোলা। তার মধ্যে শারীরিক, বৌদ্ধিক ও নীতির সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ ঘটানো যার মাধ্যমে সে সমাজের উপযোগী তৈরি হয় ও তার ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়। দুর্কেম দেখিয়েছেন, কিভাবে সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন হয় এবং শিক্ষা নিজেকে সমাজের অবেচ্ছদ্য অংশ হিসাবে নিজেকে রূপান্তকরণের মাধ্যমে নিজেকে সমাজরূপী হিসাবে গড়ে তোলে। শুধু তাই নয়, নীতিগত এবং মূল্যবোধের দিক থেকে শিক্ষা ব্যবস্থা সামাজিক অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে ওতপ্রতোভাবে জড়িতে।

দুর্কেমের মতানুসারে, শিক্ষার বিভিন্ন কাজগুলি হল—

1. সামাজিক সংহতি বজায় রাখতে শিক্ষার ভূমিকা, যখন কোন ব্যক্তি নিজেকে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ মনে করে এবং শিক্ষা তাকে সেইভাবে গড়ে তোলে এবং তার মধ্যে সেই মূল্যবোধের প্রতিস্থাপন করে, তখন সেই ব্যক্তি সমাজ বিরোধী কার্যকলাপে সাধারণত ব্রতী হয় না।
2. সামাজিক রীতিনীতি বজায় রাখতে শিক্ষা সাহায্য করে। শিক্ষা সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ, সামাজিক রীতিনীতি, নিয়মকানুন, চাহিদা সমস্ত কিছুই শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রতিফলিত হয়। শিক্ষা শিশুকে সামাজিকীকরণের মাধমে শিশুকে সমাজের উপযোগী করে তোলে এবং শিশুর মধ্যে এই গুণাবলী গুলিই পরিলক্ষিত হয়।
3. সমাজে শ্রম বিভাজন অক্ষুন্ন রাখার জন্য বিদ্যালয় প্রথম পটভূমি যেখানে দক্ষতার ভিত্তিতে শিশুদের বিভাজন করা হয়, সেই দক্ষতাকে প্রাধান্য দিয়ে তার দক্ষতাভিত্তিক কর্মক্ষেত্রে তারা

যেন প্রবেশ করতে পারে। সেই হিসাবে তাদের তৈরি করা হয়।

দুর্কেমের মতে সামাজিক মূল্যবোধের গুরুত্ব সামাজিক প্রেক্ষাপটে অপরিসীম। শিক্ষা ব্যবস্থা মানবমনে শৈশবকালে সেই মূল্যবোধের সঞ্চার করে। সামাজিক ক্ষেত্রের পরিবর্তন যেমন শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তন ডেকে আনে, ঠিক তেমনই শিক্ষা ক্ষেত্রের পরিবর্তনও সামাজিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটায়। শিক্ষায় সামাজিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটায়।

দুর্কেম শিক্ষা ক্ষেত্রের সেই দিকগুলির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করেছেন যেগুলি ফ্রান্স সমাজব্যবস্থায় ভারসাম্য, ধর্মনেরপেক্ষতা তৈরি করে সমাজবিরোধী শক্তির উত্থানের পথে বাঁধার সৃষ্টি করে।

তাই তিনি শিক্ষা ব্যবস্থাকে ক্ষুদ্র সামাজিক ব্যবস্থা বলে অভিহিত করেছেন যা সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে।

বিদ্যালয় মধ্যস্থতা কারী সংস্থা হিসাবে কাজ করে যা পরিবারের সাথে শিশুকে আবেগপূর্ণ নৈতিকতা দ্বারা আবদ্ধ করে ও সমাজের সাথে কঠোর নৈতিকতা দ্বারা আবদ্ধ করে। তিনি সেইসব সামাজিক বিষয়ের উত্থাপন করেছেন যা শিক্ষার সাথে অতপ্রোতভাবে জড়িত এবং বর্তমানকালে সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। সেই বিষয়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বিভিন্ন সামাজিক, প্রতিষ্ঠানের সাথে শিক্ষার সম্পর্ক, স্কুলের নিয়মবর্তিতা, আগামী প্রজন্মকে সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা, সমাজ পরিবর্তনের সাথে শিক্ষার সম্পর্ক, স্কুলে ও শ্রেণীকক্ষের মিশ্র সংস্কৃতি।

সাংগঠিক ক্রিয়াবাদের অপূর্ণতা; ডুর্কেমত মতবাদ অনুযায়ী দুর্কেম নিজের তত্ত্বে শিক্ষার ভূমিকা সমন্ধে কিছু বিষয়ের উপর কোন আলোকপাত করেননি। তাদের মধ্যে উল্লেখ্য হল — বয়স্কদের ভূমিকা, স্কুলের চাহিদা এবং তার বাস্তবের মধ্যে পার্থক্য, শিশুর ভূমিকা ও তাঁর সাথে বাস্তবের মিল ইত্যাদি। অপূর্ণতা একটি চরম বাস্তবতা, চাওয়া পাওয়ার সাথে বাস্তবের অমিল থাকবেই।

সাংগঠিক ক্রিয়াবাদের অপূর্ণতা

Sennet এবং Cobb এর মতানুসারে, দক্ষাতা কখনই একমাত্র পরিমাপ হতে পারে না নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে কাকে পুরষ্কার দেওয়া হবে বা কাকে তিরষ্কার করা হবে।

Meighan এর মতানুসারে, শ্রমিকশ্রেণীর একটা বড় অংশের আগামী প্রজন্মরা বিদ্যালয়ে উপস্থিত একটা অংশের থেকে সাফল্য ও জ্ঞানের নিরিখে অনেক পিছিয়ে এবং সামাজিক পরিবেশেও তারা সেই সাফল্যের স্থানের অধিকারী হতে পারে না যার জন্য সমাজ তার উপর গর্বিত হয়।

Jacob মনে করেন স্কুলের সাংস্কৃতিক পরিবেশ এবং সেই গৃহ পরিবেশ যেখানে শ্রমিক শ্রেণীর সন্তানরা বড় হয় তার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান।

সেইজন্য, শ্রমিক শ্রেণীর সন্তানরা বিদ্যালয়ের পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে পারে না এবং একটা সময় পর বিদ্যালয় ছাড়তে বাধ্য হয়, তাদের শিক্ষা সমাপ্ত হবার বহু আগে। অসমাপ্ত শিক্ষা কখনোই ভালো সাম্মানিক কাজের দরজা তাদের সামনে খোলে না এবং ভবিতব্য হিসাবে শ্রমিক শ্রেণির সন্তানরাও তাদের পূর্বজদের মতো শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে থেকেই জীবন অতিবাহিত করে।

ক্রিয়াবাদের অসম্পূর্ণতা

সমাজে ব্যক্তিবিশেষে তারতাম্য, পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সার্বিক ক্ষেত্রে এই ইচ্ছার পার্থক্য, বিভিন্নমত এবং তাদের মধ্যে বিরোধ সমাজে বিভিন্ন গোষ্ঠী তৈরি করে। এই বিভিন্নতা বাদের মধ্যে প্রত্যেক সমাজ গোষ্ঠীর মধ্যে যে মতের মিল থাকে, তারা পারস্পরিক সাহায্যের বিনিময়ে নিজেদের মত সমাজব্যবস্থা পরিচালিত করতে চায়। শ্রেণীকক্ষে, সেই সমস্ত বিভিন্নতা যা শিক্ষক ছাত্রের মধ্যে দেখা যায় আবার ছাত্র-ছাত্রের মধ্যে দেখা যায়, তা ক্রিয়াবাদ ব্যাখা করতে অপরাগ থাকে।

ক্রিয়াবাদ শিক্ষা প্রক্রিয়ার বিষয়বস্তুর উপর গুরুত্ব আরোপ করে না— শিক্ষার বিষয়বস্তু কি এবং সেই বিষয়বস্তু কিভাবে সঞ্চারিত হয়। তার রূপরেখা নিয়ে সেইভাবে সজাগ নয়। সামাজিক ব্যক্তি শুধুমাত্র সামাজিক প্রেক্ষিতে তার ভূমিকা পালন করে না। তারা নতুন নতুন বিষয় উপস্থাপনের মাধ্যমে সমাজকে নতুন রূপদান ও করে থাকে।

2.5 সামাজিকতার ধারণা

সাংগঠিক ক্রিয়াবাদের মূল লক্ষ্য হল সমাজ কিভাবে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ও পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে আবদ্ধ থাকে যাতে সামাজিক প্রতিষ্ঠান গতিশীল ও সক্রিয়া থাকতে পারে।

এখানে সমাজব্যবস্থাকে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সম্বন্বয়ে দেখা হয়, যারা পারস্পরিকভাবে একে অপরের সাথে মিথষ্ক্রিয়ার ফলে সমাজকে গতিশীলতা ও স্থায়িত্ব প্রদান করে। সামাজিক গঠনতন্ত্র দ্বারাই আমাদের জীবনের রূপরেখা নির্ধারিত হয় যা সামাজিক ব্যবহার নামে চিহ্নিত। উদাহরণ হিসাবে ধরা যায় সামাজিক গঠণতন্ত্র কিভাবে আমাদের জীবনকে একটি সুনির্দষ্ট চেহারা প্রদান করে, যেমন পরিবার, গোষ্ঠী, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমাদের সামাজিক জীবনের রূপরেখা নির্ধারিত হয়। প্রতিটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সুনির্দিষ্ট গঠনতন্ত্র ও দায়িত্ব থাকে যার দ্বারা সমাজ চলতে পারে। যেমন সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে শিক্ষার বিভিন্ন কার্যকারিতা আছে যেমন— সামাজিকীকরণ, শিক্ষাপ্রদান ইত্যাদি। ক্রিয়াবাদ অনুসারে, আমাদের শরীর যেমন বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সম্বন্ধয়ে তৈরি, শিক্ষা ব্যবস্থাও সেইরকম বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়ায় তৈরি। কোন উপাদান বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঠিকভাবে কাজ না করলে যেমন, শরীরের স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়, শিক্ষা তা থেকে পৃথক কিছু নয়।

ধারণা (Assumption)

সাংগঠিক ক্রিয়াবাদ কিছু ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। সেইসব ক্রিয়াগুলি ভিন্ন ভিন্ন আচরণের সমষ্টিবাদই হল সাংগঠিক ক্রিয়াবাদ। এইপাঠে সেইসব ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াবাদের উপর আলোকপাত করা হবে। ধারণা করা হয় সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি একে অপরের থেকে আলাদাভাবে কাজ করে ও নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখে— যে ধারণাগুলি সম্পূর্ণ ভুল।

2.5.1 সামাজিক সুসঙ্গতি

একে অপরের সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতেই সমাজ গড়ে ওঠে। সামাজিক সুসঙ্গতি বলতে বোঝায় যে বন্ধনের জন্য সামাজিক পরিবেশে দুটি মানুষ পরস্পরের সাথে আবদ্ধ থাকে। সামাজিক সুসঙ্গতির দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল—

- সমাজের সাথে একাত্ম হওয়ার অনুভূতি।
- সমাজের প্রত্যেক সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক।

সামাজিক সুসঙ্গতি সমাজে তৈরি করার জন্য, প্রাথমিক শর্ত হিসাবে, ধণাত্মক ব্যবহার ও সুস্থ মানসিকতার খুব প্রয়োজন। শুধুমাত্র ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, গোষ্ঠীর প্রত্যেক সদস্যদের ব্যবহার ও মানসসিকতা অনুরূপ হতে হবে। গোষ্ঠীর সদস্যদের প্রত্যেকের ব্যবহার ও মানসিকতার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত সমাজের সঙ্গতি নির্ধারিত হয়। পৃথক মানসিকতা ও ঋণাত্মক ব্যবহার, একজন পৃথক ব্যক্তিরও, সমাজ জীবনে ও গোষ্ঠী পরিবেশে তৈরি করতে চাইলে গোষ্ঠীর প্রত্যেক সদস্যের ঋণাত্মক মনোভাব ও ভালো মানসিকতার খুব প্রয়োজন।

2.5.2 সামাজিক অসমতা (Social Inequality)

সামাজিক অসমতা বলতে বোঝায় যখন কোন সামাজিক সদস্য অন্য সদস্যদের তুলনায় একই ধরনের সামাজিক সুযোগ সুবিধা, পায় না ও একই সামাজিক পদমর্যাদায় সমাজে বিরাজ করে না। সমাজের এই অর্থনৈতিক স্তরের অসম বিভাজনের কারণে গোষ্ঠীতে অবস্থিত ব্যক্তিরা একই ধরনের সামাজিক পদমর্যদা ও একই সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন না। সাধারণত সমসুযোগ বলতে ভোটাধিকার, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা সম্পত্তির উপর সামাজিক অধিকার, পড়াশুনা করার সুযোগ সুবিধা, স্বাস্থ্যের অধিকার, বাসস্থানের অধিকার সহ অন্যান্য সামাজিক অধিকারকে বোঝানো হয়। সামাজিক অসাম্যতা সাংগঠিক ক্রিয়াবাদের চাকায় গতি জোগায়। অসাম্যতাকে সাম্যতায় উন্নীত করার জন্যই সমাজ গতিশীল থাকে এবং অনবরত ক্রিয়াশীল থাকে। উচ্চতর অবস্থায় নিজেকে পৌছানোর জন্য ব্যক্তিবিশেষ উদ্বুদ থাকে এবং সেটাই কর্মে উদ্দীপনা জোড়ায় পুরষ্কার পাবার পথে আটকে থাকার জন্য। পুরষ্কারগুলি হতে পারে— উন্নত আয়, সামাজিক স্বীকৃতি, সম্মান অথবা ক্ষমতা।

লিঙ্গ বৈষম্য ও এক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য আলোচিত বিষয়। সাংগঠিক ক্রিয়াবাদ অনুসারে, স্ত্রীর স্থান পুরুষের নীচে, বেতন ভোগী, বা মজুরী উপার্জনকারীরাও সক্রিয় ভূমিকা পালন করে সাংগঠিক

ক্রিয়াবাদকে গতিশীল রাখার উদ্দেশ্য, সামাজিক গঠনতন্ত্রে এইভাবেই যে যার ভূমিকা সুনির্দিষ্টভাবে পালনের জন্য Structural Functionalism ও সামাজিক স্তরবিন্যাস অক্ষত থাকে ও সমাজ ক্রিয়াশীল থাকে। তাই সাংগঠিক ক্রিয়াবাদ মনে করে সমাজকে গতিশীল রাখার জন্য এই স্তরবিন্যাস ও শ্রেণীবিভাজনের অস্তিত্ব অত্যন্ত জরুরী।

2.5.3 পারস্পরিক নির্ভরশীলতা (Interdependence)

পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সাংগঠিক ক্রিয়াবাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সমাজ একটা নিজস্ব রীতিনীতি ও নিয়মশৃঙ্খলা আরোপ করে সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর। ফলে সেই নির্দিষ্ট রীতিনীতি সমাজের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবিশেষকে এক সূত্রে গেঁথে রাখে ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতার পরিবেশ তৈরি হয়।

2.5.4 সামাজিক সমতা ও শিক্ষার ভূমিকা (Equilibrium and Role of Education)

সাংগঠিক ক্রিয়াবাদের আরেকটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল— সমাজ সতত এই চেষ্টায় ব্রতী থাকে যাতে সামাজিক সমতা সুরক্ষিত হয় ও সমাজের সকল স্তরের অবমান ঘটে সামাজিক সাম্যের প্রতিষ্ঠা হয়। এটি সামাজিক সম্বন্বয় সাধন হিসাবে পরিচিত (Social Cohension)। সমাজ সবসময় সমাজের সবক্ষেত্রে সাম্যতা প্রতিষ্ঠা করতে চায়, নেতৃাত্বর স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে নয়, কারণ এই ধরনের কিছু ঘটনা যা উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, যা মোটেই ফলপ্রসু হয়নি, যেমন — Jim Crow Law.

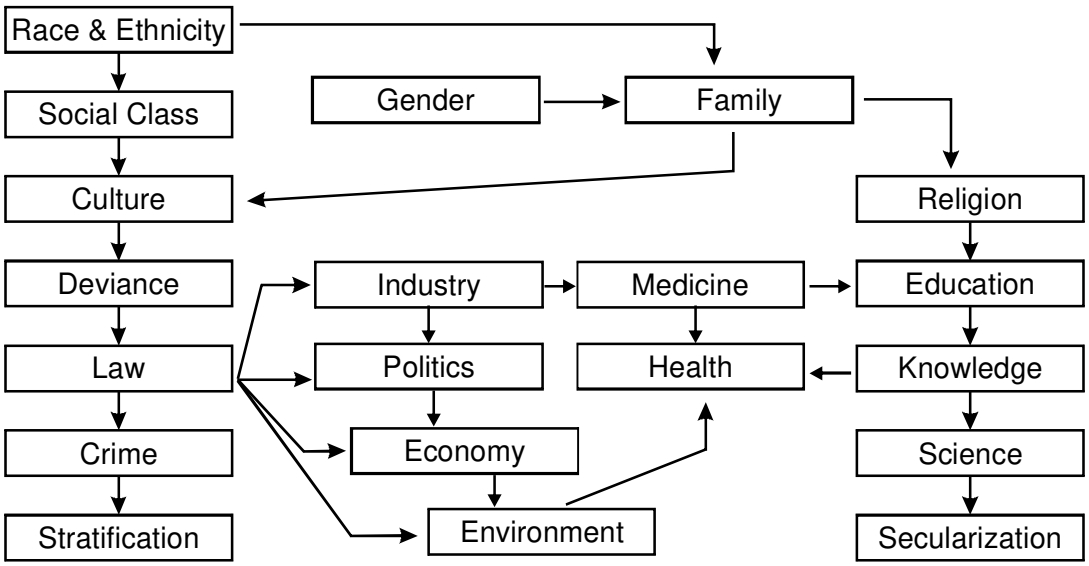

Fig. : General Diagram of Structural Functionalism

2.6 সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায় আমরা আলোচনা করেছি, সমাজবিজ্ঞান কিভাবে শিক্ষা বিজ্ঞানকে পাঠক্রম তৈরি করতে ও পাঠদানের পদ্ধতি নিবারণে সাহায্য করে। আমার এটাও জেনেছি, শিক্ষা কিভাবে সামাজীকিকরণের ক্ষেত্রে সাহায্য করে তাও জেনেছি। সাংগঠিক ক্রিয়াবাদ কী, সামাজিক সম্বন্বয় সাধন কী, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বলতে কি বোঝায় সে সম্বন্ধেও আমাদের সম্যক ধারণা হয়েছে।

2.7 স্বমূল্যায়ণ প্রশ্নাবলী

1. সমাজ পরিবর্তনে শিক্ষা কি কোন ভূমিকা পালন করে?
2. সমাজবিজ্ঞান ও শিক্ষা বিজ্ঞানের মধ্যে কি ধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান তা নিয়ে আলোচনা করো?
3. তুমি কি মনে কর, যদি আমরা শিক্ষিত না হয়, সমাজে কোন পরিবর্তন হবে না?
4. গঠনতন্ত্র ও ক্রিয়াবাদের মধ্যে কি পার্থক্য বিদ্যমান?
5. সামাজীকীকরণের দুটি উপাদান সম্বন্ধে বিস্তারিত লেখো।
6. দুর্কেমের মতে শিক্ষার যেকোন একটি কাজ সম্বন্ধে লেখো।
7. সামাজিক সম্বন্বয় বলতে তোমরা কি বোঝায়?
8. সামাজিক অসাম্যতা বলতে কি বোঝায়?
9. পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বলতে কি বোঝ?
10. কিভাবে তুমি ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যবহারিক পার্থক্য নির্ধারণ করবে, সামাজিক পরিবেশের মধ্যে?
11. সমাজ ও শিক্ষার মধ্যে সম্বন্বয় সাধনের উপায়গুলি সম্বন্ধে বল।

2.8 অভিসম্বন্ধ (Reference)

Aggarwal, J. C (2002) Theory and Principles of Education (13th ed) New Delhi: Vikash Publishing House

Bhatia, K & Bhatia, B. D (1992) Theory and Principales of Education (20th Ed)

Bhattacharya, D. C (1996). Sociology (6th ed.) Cacutta Vijoya Publishing House.

Ravi, S. S (2015) A comprehensive study of Education (2nd Ed) Delhi : PHI Learning
Sharma, Y. K. (2016) Foundation in Sociology of Education, Delhi : Kaniska Publishers.

একক 3 ❑ সামাজিকীকরণের জন্য শিক্ষা

গঠন

3.1 উদ্দেশ্য

3.2 ভূমিকা

3.3 সামাজিক গোষ্ঠী

3.3.1 সামাজিক গোষ্ঠীর ধারণা

3.3.2 চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

3.4 সামাজিক গোষ্ঠীর প্রকারভেদ

3.4.1 প্রাথমিক গোষ্ঠী

3.4.2 গৌণ গোষ্ঠী

3.4.3 এলাকা ভিত্তিক গোষ্ঠী

3.5 সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া

3.5.1 সামাজিকীকরণে পরিবারের ভূমিকা

3.5.2 সামাজিকীকরণে বিদ্যালয়ের ভূমিকা

3.6 সারসংক্ষেপ

3.7 স্ব-মূল্যায়ণ প্রশ্নপত্র

3.8 অভিসম্বন্ধ

3.1 উদ্দেশ্য

এই একক পড়ার পর, ছাত্রছাত্রীরা সক্ষম হবেন—

- তাদের মধ্যে সামাজিক গোষ্ঠীর ধারণা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সম্যক ধারণা গড়ে উঠবে।
- বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী সম্বন্ধে আলোচনা করতে সক্ষম হবে
- সামাজিকরণ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণার সৃষ্টি হবে।

3.2 ভূমিকা

প্রথম ও দ্বিতীয় এককে সমাজতত্ত্ব কি, এর সংজ্ঞা কি, সমাজতত্ত্বের পরিধি, পন্থা এইসব সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে পরিষ্কার ধারণা গড়ে উঠেছে। এই অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব সামাজিক গোষ্ঠী কি, এর সাধারণ বৈশিষ্ট্য কি, সামাজিক গোষ্ঠীর প্রকারভেদ সম্বন্ধে। এই অধ্যায়ে সামাজিকরণ প্রক্রিয়া এবং সামাজিকরণে বিদ্যালয় ও পরিবারের ভূমিকা সম্বন্ধেও বিশদে আলোকপাত করা হবে।

যখন কোন শিশু এই সুন্দর পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়, জন্মমাত্র সে কোন না কোন পরিবারের অবেচ্ছদ্য অংশ হয় এবং সেই পারিবারিক পরিচয়ে বড় হয়ে ওঠে। কিন্তু তার জীবন পারিবারিক চৌহিদ্দির মধ্যেই শুধু সীমাবদ্ধ থাকে না। বসুবৈধ কুটুম্বকম্-ক্রমে কেই শিশুর পরিধি বাড়ে ও সারা বিশ্ব তার পরিবার হয়ে ওঠে, সারা বিশ্বের সাথে সে তার জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও সংস্কৃতির আদান প্রদান করে। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিষ্টল বলেছিলেন, মানুষ সামাজিক জীব, সমাজে সে না পশুর মত, না দেবদূতের মত বসবাস করে। মানুষ সমাজে বাস করে সমাজের রীতিনীতি মেনে এবং অন্যান্য মানুষের সাথে সামাজিক সম্পর্ক পালনের মাধ্যমে। সামাজিক গোষ্ঠী বলতে এক বিশেষ ব্যক্তি সমষ্টিকে বোঝায়। সমাজ সেই বিশেষ ব্যক্তি সমষ্টির জন্য তৈরি হয় ও তাদের দ্বারা চলতে থাকে। জিসবার্ট বলেছেন, "A social group is collection of individuals interacting on each other under a recognizable structure." পরস্পরের সাথে আদান প্রদানের মাধ্যমে ব্যক্তি সমষ্টি পরস্পরের সাথে সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং সামাজিক পরিকাঠামোকে অক্ষুন্ন রেখে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে চলে। বিভিন্ন প্রকারে ও রূপে এই সামাজিক সম্পর্ককেই গোষ্ঠী বলা হয়। প্রতিটি ব্যক্তি কোন না কোন গোষ্ঠীর সাথে আদান প্রদান ও সম্পর্ক এবং ব্যবহার গোষ্ঠীকে গুরুত্ব অপরিসীম।

শিক্ষা সমাজতত্ত্বে শিশুর সামাজিক হয়ে ওঠার বিষয়টিও শিক্ষাক্ষেত্রের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। সামাজিক প্রক্রিয়া রূপে শিক্ষা আগামী প্রজন্মকে সমাজ উপযোগী করে গোড়ে তোলে। সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুকে সেই সমাজের উপযুক্ত, সক্রিয় সদস্য হিসাবে গড়ে তোলা হয় যাতে সেই শিশু, সেই সমাজের সামাজিক পরিবেশে সমাজের প্রতি তার অবদান রাখতে পারে এবং সমাজের প্রগতি তার অবদান রাখতে পারে এবং সমাজের প্রগতি ও উন্নতিতে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। গ্রীক দার্শনিক Aristottle বলেছেন মানুষ সামাজিক জীব। মানুষ পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন ও আদান প্রদানের মাধ্যমে সমাজ ও সামাজিক ব্যবস্থাকে জীবিত রাখে। এই আদান প্রদান সুনির্দিষ্ট কিছু রূপের (Form) মাধ্যমে হয়। সামাজিক গোষ্ঠীই হল সেইরূপ যা বিশেষ কিছু ধরনের ব্যক্তি সমষ্টির মাধ্যমে ঘটে। সমাজের প্রত্যেক সদস্যই কোন না কোন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। গোষ্ঠীর প্রত্যেক সদস্যের ব্যবহার দ্বারা সমাজ কোন না কোন ভাবে প্রভাবিত হয়। সেইজন্য শিক্ষাবিজ্ঞানে ও সমাজ বিজ্ঞানে গোষ্ঠী ও তার প্রভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে।

এই অধ্যায়ে সামাজিককরণের উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সামাজিকরণে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মধ্য দিয়ে শিশু সমাজের যোগ্য ও সক্রিয় সদস্যরূপে গড়ে ওঠে। সামাজিকীকরণের মাধ্যমে ব্যক্তি সমাজের বিধিবদ্ধ আচরণ, রীতিনীতি, ধ্যান ধারণা ইত্যাদির সাথে পরিচিত হয় ও তা

আরও করে সমাজ উপযোগী সদস্য হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। এর মাধ্যমে নবীন প্রজন্ম সমাজ সংক্রান্ত বিষয়ে পরিচিত হয় ও অভিযোজনে সক্ষম হয়ে ওঠে।

3.3 সামাজিক গোষ্ঠী

3.3.1 সামাজিক গোষ্ঠী সম্বন্ধে ধারণা (Concept of Social Group)

জটিল সামাজিক কাঠামোর একক হল গোষ্ঠী, আমরা জানি, ব্যক্তি দ্বারাই সমাজ গড়ে ওঠে। যখন ব্যক্তি সমষ্টি পরস্পরের সাথে সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ থাকে ও পারস্পরিক সম্পর্ক যুক্ত হয়, তখন সামাজিক গোষ্ঠী গঠিত হয়। এই ব্যক্তি সমষ্টি একটি স্বীকৃত সংগঠনের মধ্যে পরস্পর ক্রিয়াশীল থাকে ও সমাজকে গতিশীল রাখে। ব্যক্তি সমষ্টি সর্বত্রই কোন না কোন সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্য। সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিক গোষ্ঠী একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ব্যক্তি সমষ্টি সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে প্রত্যেকে পরস্পরের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত থাকে। মানুষের বিপুল সমাবেশ বা সমবেত হওয়া কিন্তু মানুষকে সামাজিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করে না যদি না তাদের মধ্যে পারস্পরিক আদান প্রদান ও সামাজিক সম্পর্ক বিরাজ করে, সামাজিক সম্পর্ক বলতে সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক মামতের আদান প্রদান ও মতামত বিনিময় বোঝায়। সমাজের বিশেষ সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষ একটি সমাজতাত্ত্বিক এবং মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি থাকে।

এই পর্বে সমাজ গোষ্ঠীর সংজ্ঞার উপর বিশেষ আলোকপাত করা হবে।

সামাজিক গোষ্ঠীর সংজ্ঞা (Definition of Social Group)

এখানে বিভিন্ন সমাজতত্ত্ববিদ্ বিভিন্ন সংজ্ঞার দ্বারা সামাজিক গোষ্ঠী বলতে কি বোঝায় সেই সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন।

Ogburn এবং Numkoff বলেছেন যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি পরস্পরের সংস্পর্শে এসে পরস্পরকে প্রভাবিত করে, তারা তখন সামাজিক গোষ্ঠী বানায়। "When ever two or more individuals come together and influence one another, they may be said to constitute a social group".

Sheriff এবং Sheriff বলেছেন, গোষ্ঠী একটি সামাজিক একক যা ব্যক্তি সমষ্টিকে নিয়ে তৈরি হয় এবং যারা নির্দিষ্ট সামাজিক অবস্থা থাকে। যদি গোষ্ঠীর একজন দ্বারাও মূল্যবোধ, নিয়মনীতির ব্যাঘাত হয়— সেটা সমগ্র সামাজিক গোষ্ঠীকে প্রভাবিত করবে।

"A social group is social unit which consists of number of individuals who stand in (more or less) definite status and role relationship to one another which

posses a set of values or norms of its own regulating the behaviour of individual members at least in matlers of consequence to the group."

William বলেছেন, সামাজিক গোষ্ঠী হল এমন কতকগুলি ব্যক্তি সমষ্টি যারা পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ থেকে একটি স্বীকৃত সংগঠনের মধ্যে পরস্পর ক্রিয়াশীল থাকে। "A social group is a given aggregate of people playing inter-related roles and recognized by themselves or others as a unit of interaction."

R. M. Maclever ও Page গোষ্ঠী পদটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাঁদের মতে, পরস্পরের সাথে সামাজিক সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ যেকোন মানব সমষ্টিকেই গোষ্ঠী বলা যায়। "Social group is any collection of human being who are brought into human relationship with one another.

সুতরাং, গোষ্ঠী বলতে কি বোঝায় সেই সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা এই পর্বে তৈরি হয়েছে।

3.3.2 গোষ্ঠী জীবনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Social Group)

নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য হল গোষ্ঠী জীবনের ভিত্তি, এগুলো ছাড়া গোষ্ঠীজীবন তার তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে।

- **ব্যক্তি সমষ্টি (Collection of Individuals)**

  মানুষের সমাজজীবনের ভিত্তি হল গোষ্ঠী জীবন, ব্যক্তি সমষ্টি ছাড়া গোষ্ঠী জীবনের কোন অস্তিত্ব নেই। সুতরাং ব্যক্তি সমষ্টি হল গোষ্ঠীজীবনের মূল ভিত্তি।

- **গোষ্ঠীর সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক :**

  গোষ্ঠী মাত্রই গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে মিথক্রিয়া ও মতামতের আদান প্রদান থাকবে। সেই সাথে থাকবে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, শুধুমাত্র সংখ্যা কোন গোষ্ঠী বানাতে পারে না। গোষ্ঠী পারস্পরিক আদান প্রদান ছাড়া কখনই তৈরি হয় না।

- **একাত্ববোধ (Feeling of Unity)**

  গোষ্ঠীজীবনের আরেকটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল গোষ্ঠীর সদস্যদের সাথে ও গোষ্ঠীর সাথে একাত্মবোধ। এই একাত্মবোধের জন্যই গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে পারস্পরিক আদান প্রদান সম্ভব হয়।

- **পারস্পরিক সচেতনতা (Mutual awarencess)**

  গোষ্ঠী জীবনে, প্রত্যেক সদস্যই অন্য সদস্যদের ইচ্ছা, প্রয়োজন, প্রত্যাশা সম্পর্কে অবগত থাকেন।

- **গোষ্ঠী চেতনা (Group Spirit)**

  গোষ্ঠী জীবনের অন্যতম মূল লক্ষ্য গোষ্ঠী চেতনা, সাধারণত প্রতিটি গোষ্ঠী একটি নির্দিষ্ট আদর্শ ও রীতিনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ও তাকে মেনে চলা গোষ্ঠী জীবনের লক্ষ্য। এই গোষ্ঠী মনোভাবের জন্য সভ্যগণ সংকীর্ণ ব্যক্তি স্বার্থের পরিবর্তে বৃহত্তর গোষ্ঠীস্বার্থকে প্রাধান্য দেয়।

- **গোষ্ঠীর সাধারণ ব্যবহার (Common Behaviour)**

  গোষ্ঠীর প্রতিটি সদস্যই কম বেশি একইরকম সামাজিক ব্যবহার করে। এই একই ধরনের সামাজিক ব্যবহার গোষ্ঠী বানাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

- **সংগঠন (Organization)**

  সমাজজীবনে গোষ্ঠী একটি সংগঠিত অংশ বিশেষ। এটা কখনও কোন পরিস্থিতিতে অসংগঠিত নয়।

- **গোষ্ঠী নিয়ম (Group Norms / Stanard)**

  প্রতিটি সামাজিক গোষ্ঠী কিছু নিয়ম ও নীতি দ্বারা পরিচালিত ও প্রতিষ্ঠিত, প্রতিটি গোষ্ঠী সদস্য সেই নিয়মের প্রতি দায়বদ্ধ ও গোষ্ঠী স্বার্থরক্ষায় সচেষ্ট হয়, সেই নিয়ম পালন করে।

- **সদস্যদের উপর নিয়ন্ত্রণ (Control Over Members)**

  গোষ্ঠী সদস্যদের সামাজিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে যাতে সামাজিক ব্যবহারের জন্য গোষ্ঠীর নিয়মশৃঙ্খলা, রীতিনীতি ব্যাহত না হয়। অসামাজিক ব্যবহারের জন্য গোষ্ঠীজীবনে বিচ্ছিন্নতা ও স্বাতন্ত্র্যবোধের সৃষ্টি হয় যা সমাজ জীবনে ঐক্যের পথে বাঁধা তৈরি করে।

- **গোষ্ঠীর আয়তন (Size of the Group)**

  সমাজে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক গোষ্ঠী থাকে — যেমন, রাজনৈতিক দল, খেলাধুলার ক্লাব ইত্যাদি। গোষ্ঠী ভেদে তার আয়তনের ও তারতাম্য হয়। কোন গোষ্ঠী খুব ছোট হয়, দুই জন সদস্যও হতে পারে আবার কোন গোষ্ঠী এত বড় সে তার সদস্য সংখ্যা লাখের অধিক।

- **স্থায়িত্বকাল (Duration)**

  আয়তনের মত গোষ্ঠীর স্থায়িত্বে ও তারতাম্য দেখা যায়। কোন কোন গোষ্ঠীজীবনের স্থায়িত্ব সাময়িক হয় আবার কোন কোন গোষ্ঠীজীবনের স্থায়িত্ব চিরকালীন হয়, যেমন পরিবার।

- **পরিবর্তনশীলতা (Changeability)**

  পরিবর্তনশীলতা সামাজিক গোষ্ঠীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য গোষ্ঠীর সাংগাঠনিক কাঠামো ও কর্মক্ষেত্রের পরিধি চিরকাল একরকম থাকে না। সমাজের অগ্রগতির সাথে তা পরিবর্তিত হয়।

3.3.3 গোষ্ঠী জীবন ও শিক্ষার ভূমিকা (Social Group & Role of Education)

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। তাই তারা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। সমাজ কোন স্থির বস্তু নয়, সমাজ গতিশীল, একটি সামাজিক, গতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজস্থ পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়। সময় ও স্থানগত পরিবর্তন পারস্পরিক সর্ম্পকের প্রকৃতি ও গভীরতার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। আবার প্রত্যেক সামাজিক গোষ্ঠী তার সদস্যদের মধ্যে গোষ্ঠীর সংহতি ও অখণ্ড সমগ্রতার সম্পর্কে একটি সামগ্রিক চেতনার উন্মেষ ঘটায়। সেই সার্থে গোষ্ঠী ভেদে, গোষ্ঠীর প্রয়োজনীয়তা অনুসারে, বিভিন্ন ছবি ফুটে ওঠে। কিন্তু বিভিন্ন গোষ্ঠী প্রত্যেকে একে ওপরের সাথে পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে। গোষ্ঠীকে পরিচালনা করতে এর প্রত্যেকটি সদস্যর ভূমিকা ও উপযোগিতা অপরিহার্য।

শিক্ষা ও গোষ্ঠীজীবনের সম্পর্ক খুব নিকট। শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমেই গোষ্ঠীগুলি তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় ব্যপ্ত হয়। শিক্ষা আগামী প্রজন্মের মধ্যে শৃঙ্খলা, রীতিনীতির সঞ্চার ঘটিয়ে গোষ্ঠী চেতনার বিকাশ ঘটায়। শিক্ষা একদিকে যেমন ঐক্য ও সংহতির সৃষ্টি করে, অন্যদিকে তেমন শিশুমনকে সামাজিক ও গোষ্ঠী জীবনের আদর্শগুলিকে বহন করবার উপযোগী রূপে গড়ে তোলে, যাতে ভবিষ্যতে তারা সমাজ ও গোষ্ঠীজীবনের সদস্য হিসাবে গড়ে উঠে সমাজ ও গোষ্ঠীজীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষমতা অর্জন করে।

3.4 সামাজিক গোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, তাই সে একসাথে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর অংশ। সামাজিক গোষ্ঠী বলতে ব্যক্তি সমষ্টিকে বোঝায়। পরিবার, গ্রাম, জাতি রাজনৈতিক দল, শ্রমিক সংঘ প্রভৃতি বিভিন্ন গোষ্ঠীর উদাহরণ, গোষ্ঠীর প্রতিটি সদস্য পরস্পরের সাথে সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, এমনকি দুইজন ব্যক্তি সম্মলিত হয়েও সামাজিক গোষ্ঠী তৈরি করতে পারে। প্রতিটি সামাজিক গোষ্ঠীর নির্দিষ্ট একটি সামাজিক উদ্দেশ্য থাকে। শুধু তাই নয়, প্রতিটি গোষ্ঠীর একটি সুনির্দিষ্ট সামাজিক চেতনা থাকে। গোষ্ঠী মনোভাবের জন্য সদস্যগণ ব্যক্তিস্বার্থের পরিবর্তে গোষ্ঠীস্বার্থকে প্রাধান্য দেয়। গোষ্ঠীর সদস্যগণ গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার তাগিদে এবং অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ থাকেন ফলে তাদের মধ্যে ভাতৃত্ববোধ ও একাত্মবোধের সৃষ্টি হয়, যা গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে কল্যাণকর ও মঙ্গলকর।

মানুষের মিলিত ও এক হবার মূল লক্ষ্য হল সংঘবদ্ধ হওয়া। গোষ্ঠীর অস্তিত্ব তৈরি হওয়ার মূল কারণ হল, গোষ্ঠীর প্রতিটি সদস্য এক লক্ষ্য ও এক ইচ্ছা প্রতিপালন করে নিজেদের গোষ্ঠীজীবনে। প্রতিটি গোষ্ঠী সদস্যের ব্যবহার ও ক্ষমতাকেই গোষ্ঠীর কায়া ও আকার তৈরি করে, যে গোষ্ঠীর তারা সদস্য। শুধু তাই নয়, শৈশব থেকেই গোষ্ঠীজীবনের মাধ্যমে মানব শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকশিত ও প্রকাশিত হয়ে ওঠে। যে কোন ব্যক্তি তার জীবনকালে বিভিন্ন গোষ্ঠীর অংশ হয়ে ওঠে — সেই গোষ্ঠীগুলিকে সে হয় পছন্দ করেছে বা হয়ত জন্মসূত্রে অর্জন করেছে।

জটিল সামাজিক কাঠামোর সরলতম একক হল সামাজিক গোষ্ঠী। সামাজের অবেচ্ছদ্য অংশ হল গোষ্ঠী। দুই বা ততোধিক মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও আদান প্রদানের মাধ্যমে গোষ্ঠী তৈরি হতে পারে। প্রতিটি গোষ্ঠীর একটি নির্দিষ্ট সামাজিক লক্ষ্য থাকে। গোষ্ঠীর প্রত্যেক সদস্যদের মধ্যে সাধারণভাবে আলাপ পরিচয় ও ভাবের আদান প্রদান ঘটে এবং পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয় ও তার ফলে গোষ্ঠীস্বার্থ সুরক্ষিত হয়। এইভাবে সামাজিক গোষ্ঠী সদস্যদের মধ্যে আমরা বোধ গড়ে ওঠে।

গোষ্ঠী তৈরি হয় ব্যক্তি সমষ্টি দিয়ে, কিন্তু ব্যক্তি সমষ্টি মানেই গোষ্ঠী নয়, যদি ব্যক্তি সমষ্টির মধ্যে পারস্পরিক ভাবের আদান প্রদান না থাকে। তাহলে তারা গোষ্ঠী নয়। আমরা রেলস্টেশনে, বাসস্ট্যান্ডে মানুষের সমাবেশ দেখি, কিন্তু তারা গোষ্ঠী তৈরি করে না, কারণ তাদের মধ্যে ভাবের পারস্পরিক আদান প্রদান নেই। প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে গোষ্ঠী শুধু পারিবারিক নৈকট্য বা যোগাযোগ ঘটায় না, গোষ্ঠী তার সদস্যদের মধ্যে গোষ্ঠীর সংহতি ও অখন্ডতা সম্পর্কে সামগ্রিক চেতনার উন্মেষ ঘটায়, সদস্যগণ সংকীর্ণ ব্যক্তি স্বার্থের পরিবর্তে বৃহত্তর গোষ্ঠী স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়।

এই একাত্মবোধ, পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে বিদ্যমান থাকে যদিও তারা একই পরিবারের সদস্যও না হন। যেমন ধর, আমরা নিজেদের পরিয়ে দিই ভারতবাসী বলে, কিন্তু তুমি কি খেয়াল করে দেখেছো, ভারতবর্ষের কতজন মানুষকে আমরা চিনি। William বলেছেন "A social group is a given aggregate of people playing inrerrelated roles and recognized by them selves or others as a unit of interaction".

সমাজতত্ত্বের দিক থেকে Mckee গোষ্ঠীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "A plurality of people as actors involved in a pattern of social interaction, concious of sharing common understanding and of accepting some rights and obligations that accrue only to members."

আবার Green বলেছেন, "A group is an aggregate of indivduals which persist in time, which has one or more interests and activities in common and which is organized."

Macver এবং Page গোষ্ঠী শব্দটিকে ব্যপক অর্থে ব্যবহার করেছেন, "Any Collection of human beings who are brought into social relationship with one another". সদস্যদের চেতনার মধ্যে সামাজিক গোষ্ঠীর মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি থাকে যা সামাজিক একাত্মবোধের উন্মেষ ঘটায়। সেই হিসাবে, সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ ব্যক্তি সমষ্টিকে সামাজিক গোষ্ঠী বলা হয়। এরা পরস্পরের সাথে সামাজিক বন্ধনের সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে। তাদের লক্ষ্য ও লক্ষ্য পূরণের রাস্তা হিসাবে সামাজিক ব্যবহার এক রকম হয়। এইভাবে দেখতে গেলে, পরিবার, গ্রাস, দেশ, রাজনৈতিক, দল, বা একটি শ্রমিক কল্যাণ সমিতি প্রত্যেকেই এক একটি সামাজিক গোষ্ঠী।

সুতরাং, সামাজিক গোষ্ঠী বলতে বোঝায়, যখন ব্যক্তি সমষ্টি সামাজিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত হয়ে পারস্পরিক

আদান প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে। মানবসমাজে এইরকম আরেক ধরনের গোষ্ঠী বর্তমান আছে, যাদের ঠিক সামাজিক গোষ্ঠী বলা যায় না। সাধারণত এই ধরনের ব্যক্তিরা সম ব্যবসায়, বা বৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিসমূহ অথবা সম আয়ের ব্যক্তিসমূহকে নিয়ে এই ধরনের গোষ্ঠী গড়ে উঠতে পারে, এদের সাধারণ আপাত গোষ্ঠী বলা হয় (Aggregates / Quasi Groups) এই ধরণের গোষ্ঠী সামাজিক গোষ্ঠী হিসাবে গড়ে উঠতে পারে, যদি তারা পারস্পরিক আদান প্রদানের মাধ্যমে সম্পর্কযুক্ত হন ও একই লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে ধাবিত হন।

মানবসমাজে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক গোষ্ঠীর রকমভেদ দেখা যায়। সেগুলি হল, প্রাথমিক গোষ্ঠী (Primary Group), Secondary (গৌণ গোষ্ঠী) (Voluntary and involuntary group) ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক গোষ্ঠী এবং এইরকম আরও অনেক। সমাজতত্ত্ববিদ্‌রা সমাজকে ভাগ করেছেন তার আকার অনুযায়ী, কখনও বা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী, কখনও বা তার স্থায়িত্ব, নৈকট্য, সাংগঠনিক প্রকারভেদ বা পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে।

3.4.1 প্রাথমিক গোষ্ঠী (Primary)

দুটি গোষ্ঠী কখনই এক হয় না, প্রতিটির নির্দিষ্ট লক্ষ্য, নিজেস্ব কৃষ্টি সংস্কৃতি ও নিয়মকানুন প্রভৃতি থাকে। সমাজতত্ত্ববিদরা গোষ্ঠীকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেছেন। তার মধ্যে প্রাথমিক গোষ্ঠী হল অন্তরঙ্গ সংগঠন।

প্রাথমিক গোষ্ঠীর উদাহরণ হিসাবে অনু পরিবার (Nuclear Family) কে দেখানো হয়, কিন্তু এটাই একমাত্র প্রাথমিক গোষ্ঠীর উদাহরণ নয়। প্রাথমিক গোষ্ঠী হল অল্প সংখ্যক মানুষের সংগঠন। সদস্যদের মধ্যে গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। তাদের সম্পর্কের মূলে আছে প্রত্যক্ষ পারস্পরিক সম্পর্ক এবং এই সম্পর্ক হয় দীর্ঘমেয়াদী। গোষ্ঠীর প্রত্যেক সদস্য প্রত্যেকের সাথে আত্মিক সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে। প্রাথমিক (Primary) শব্দটি তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহারের মূল কারণ হচ্ছে এই গোষ্ঠী সার্বিক ও সামাজিকরণের সমস্ত স্তরে এই গোষ্ঠীর অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। মানব প্রকৃতির ভালোবাস, নিরাপত্তা এবং বন্ধুত্ব দ্বারা প্রাথমিক গোষ্ঠীর ভিত্তি তৈরি হয়। প্রাথমিক গোষ্ঠীর কাছ থেকেই তার নবীনতর সদস্যরা গোষ্ঠীর আচার-আচারণ, নিয়ম-কানুন শেখে, শেখে নিয়মবর্তিতা পালন করে কিভাবে পরিবারের ও বন্ধুদের সাথে একাত্ম হয়ে উঠতে হয়।

মার্কিন সমাতত্ত্ববিদ্ Charles Horfon Cooley তাঁর বই "Social Organization" সর্বপ্রথম প্রাথমিক গোষ্ঠী সম্বন্ধে আলোকপাত করেন 1909 সালে। যদিও 'গৌণ গোষ্ঠী' শব্দটি কুলি তাঁর বইতে উল্লেখ করেননি। কিন্তু যখন প্রাথমিক গোষ্ঠীবাদে সমাজে অবস্থিত অন্যান্য গোষ্ঠী নিয়ে কিছু সমাজবিদ্ আলোচনা শুরু করেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য হল— K. Davis, Ogburn এবং Mclver তাঁরাই গৌণ গোষ্ঠী শব্দটি ব্যবহার করে তার প্রাধান্য নিয়ে আলোচনা করেন। সুতরাং সহজেই বলা যায়, প্রাথমিক ও গৌণ গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য করা হয় তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নৈকট্যের পরিমাণ ও সংগঠনের প্রকৃতির ও সদস্য সংখ্যার উপর ভিত্তি করে।

প্রাথমিক গোষ্ঠী সবথেকে সরল ও সর্ববিদিত সামাজিক সংগঠন। সমস্ত ধরনের সামাজিক সম্পর্কের অনুরূপ এই সংগঠনের অস্তিত্ব সর্ববিদিত। প্রাথমিক গোষ্ঠী অল্পসংখ্যাক মানুষের সংগঠন এবং প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের মাধ্যমে এই গোষ্ঠীর ভিত তৈরি হয়। তাদের এই সম্পর্কের মুলে আছে মুখোমুখি বা প্রত্যক্ষ পরিচয়, যা গভীর ও নিবিড়। প্রত্যক্ষ ও মুখোমুখি সম্পর্কের মুলে আছে পারস্পরিক সহযোগিতা, নির্ভরশীলতা বন্ধুত্ব এবং পারস্পরিক আদান প্রদান, তারা নিজেরা পরস্পরের চিন্তার মধ্যে থাকে। গোষ্ঠীটা খুব অল্প সংখ্যক সদস্য দ্বারা তৈরি হলেও তারা পরস্পরের সাথে বসবাস করে।

প্রাথমিক গোষ্ঠী বিষয়ে কুলি বলেছেন : "By primary groups I mean those characterized by intimate face to face association and cooperation. they are primary; in several senses, but chiefly in that they are fundamental in framing the social nature and ideal, of the individual". এই ধরনের গোষ্ঠীগুলির ক্ষেত্রে কুলি একধরনের প্রবাদ ব্যবহার করতেন 'the nursery of human nature' যেখানে পারস্পরিক সহযোগিতা, অনুভূতি, বিশ্বস্ততা, পরস্পরের জন্য উদ্বেগ ইত্যাদি শেখা যায়। প্রাথমিক গোষ্ঠীর উদাহরণ হিসাবে কুলি যাদের তুলে ধরছেন তারা হল পরিবার, উপজাতি, বংশ, খেলার গোষ্ঠী, কথাচালাচালি গোষ্ঠী, আত্মীয় ইত্যাদি। সকল সংগঠন ও সামাজিক কাঠামোর কেন্দ্রীয় অংশ হল মানবসমাজের এই প্রাথমিক গোষ্ঠী সর্বদাই 'প্রথম'। "It is the first and generally remains the chief focus of our social satisfactions".

প্রাথমিক গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য (Characteristics of a Primary Group)

প্রাথমিক গোষ্ঠীর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

1. দৈহিক নৈকট্য (Physical Proximity / Closeness)

ব্যক্তিগত সান্নিধ্য সদস্যদের ভাব-ভাবনা, মতামত ইত্যাদির পারস্পরিক আদান প্রদানকে সহজতর করে তোলে। এর ফলে গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে এক আত্মীয়তার মনোভাব গড়ে ওঠে।

পারস্পরিক সাক্ষাৎ ও কথোপোকথন সম্পর্ক সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। দৈহিক নৈকট্য বা ব্যক্তিগত সান্নিধ্য, চিন্তা-চেতনা, ভাব-ভাবনা ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ককে আরোও সহজতর করে তোলে। এতদসত্ত্বেও দৈহিক নৈকট্যকে একেবারে অপরিহার্য উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা হয় না। প্রফেসর K. Davis বলেছেন ব্যক্তিগত সান্নিধ্য ব্যাতিরেকেও মুখোমুখি সম্পর্ক সৃষ্টি হতে পারে।

উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, নাপিত বা ধোপার সঙ্গে আমাদের মুখোমুখি সম্পর্ক হয় কিন্তু অন্তরঙ্গতা তৈরি হয় না। আবার অপরদিকে যোগাযোগ যেমন ফোন, চিঠি ইত্যাদির মাধ্যমে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক তৈরি হয়, যদিও তাদের সাথে বছরের পর বছর কোন সাক্ষাৎ হয় না।

2. গোষ্ঠীর সীমিত আয়তন (Smallness)

সাধারণত প্রাথমিক গোষ্ঠী আয়তনে ক্ষুদ্র হয়। ক্ষুদ্র আয়তনের জন্য গোষ্ঠী সচেতনা ও অন্তরঙ্গতা

তৈরি হয়। গোষ্ঠীর আয়তন ক্ষুদ্র হলে সম্পর্ক গভীর হয়। গোষ্ঠীর আয়তন বিশাল হলে সম্পর্ক ক্ষীণ হয়। গোষ্ঠীর আকার ক্ষুদ্র হবার জন্য, সমস্ত গোষ্ঠীর সদস্যরা সম্মিলিতভাবে কাজ করার চেষ্টা করে এবং তাদের দ্রুত গোষ্ঠী চেতনা ও গভীর আন্তরিকভাবে সৃষ্টি হয়।

3. গোষ্ঠীবন্ধনের স্থায়িত্ব (Durability)

সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের আন্তরিকতা ও গভীরতা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সাক্ষাৎ-এর পৌণঃপুণিকতা ও স্থায়িত্বের উপর নির্ভরশীল, সদস্যদের সাক্ষাৎ, মেলামেশা যত বেশি ঘন ঘন হয়, সম্পর্ক ও ততবেশি স্থায়ী হয়। আবার, গোষ্ঠীগত ঐক্যের স্থিতিকালও দীর্ঘতর হয়ে তাকে সদস্যগণের মধ্যে আবেগ, অনুভূতি, ভাবপ্রবণতা প্রভৃতি কারণে।

4. উদ্দেশ্যের অভিন্নতা (Identity of Ends)

প্রাথমিক গোষ্ঠীর সদস্যগণ উদ্দেশ্য ও মনোভাবের দিক থেকে অভিন্ন প্রকৃতির হয়। তাদের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ও মনোভাবের ক্ষেত্রে সমতা পরিলক্ষিত হয়। গোষ্ঠীর সকলেই সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উদ্যোগী হয়ে থাকেন। প্রতিটি গোষ্ঠী সদস্যের শুভ-অশুভ কল্যাণ-অকল্যাণ হল অন্য সকলের চিন্তনীয় বিষয়। সদস্যদের উদ্দেশ্যের সমতা গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যক্তিত্বের এক মনস্তাত্ত্বিক সমাহার সৃষ্টি করে। Davis এর মতে "the child's needs becomes the mother's end".

5. সম্পর্ক নিজেই শেষ হয়ে যায় (Relationship is an end in itself)

প্রাথমিক গোষ্ঠীর সম্পর্ক সাধারণ শেষ হবার জন্য তৈরি হয় না। কিন্তু প্রাথমিক সম্পর্ক তৈরি করার ভিত্তি যদি উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়। তাহলে সেই সম্পর্ককে সঠিক বলে গ্রহণ করা হয় না। সত্যিকারের সম্পর্ক, কখনই উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে গড়ে ওঠে না। এই সম্পর্ক উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে তৈরি হয়। এই সম্পর্কের মধ্যে কোন স্বার্থপরতা থাকে না। বন্ধুত্ব, সম্পর্ক আনন্দের উৎস যা অন্তর থেকে অনুভব করতে হয়।

6. সম্পর্কগুলি ব্যক্তিগত (Relationship is Personal)

প্রাথমিক গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক বর্তমান থাকে তা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। এই সম্পর্ক কেই সদস্যদের মধ্যেই তৈরি হয় ও তাদের সম্পর্কের সাথে টিকে থাকে। দুই সদস্যের যে কোন একজনের অনুপস্থিতিতে সেই সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। এই ব্যক্তিগত সম্পর্ক শুধু মাত্র কেই দুইজন ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে ও তাদের সাথেই শেষ হয়।

সেই সম্পর্ক যাদের দ্বারা তৈরি, কারো একজনের অনুপস্থিতি অন্যজন দ্বারা পূরণ হয় না। ধরা যাক দুই বন্ধুর মধ্যে সম্পর্ক, এক বন্ধু মারা গেল। সেই বন্ধুর মারা যাওয়ার সাথে সাথে সেই সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। কেউ তার জায়গা নিতে পারে না বা তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে না।

7. ব্যাপক সম্পর্ক (Relationship is Inclusive)

প্রাথমিক গোষ্ঠর সদস্যদের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, সেই সম্পর্ক হ সার্বিক ও বিশেষভাবে ব্যাপ্ত। গোষ্ঠীভুক্ত সকল সদস্যকে পুরোপুরি আবদ্ধ করে প্রাথমিক সম্পর্কের ব্যাপ্তি। বাস্তবে এই ধরনের সম্পর্ক সৃষ্টির মূলে আছে নিবিড় ও দীর্ঘস্থায়ী যোগাযোগ।

সুতরাং প্রাথমিক গোষ্ঠীর সম্পর্কগুলো হয় স্বতঃস্ফূর্ত, যেখানে ব্যক্তিগত স্বার্থের থেকে সম্মিলিত স্বার্থের প্রাধান্য বেশি হয়। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই সম্পর্ক তৈরি হয় না।

মানবসমাজে প্রাথমিক গোষ্ঠীর গুরুত্ব (Importance of Primary Group)

প্রাথমিক গোষ্ঠী মানবসমাজে ও ব্যক্তির জীবনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনের ক্ষেত্রে প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সমাজে অবস্থিত সমস্ত মানুষের সামাজিক সত্তা এই গোষ্ঠীগুলিই গঠন করে। প্রাথমিক গোষ্ঠী মানুষের সত্তাকে প্রতিপালন করে। ব্যক্তিসত্তার 'আমি' (self) গড়ে ওঠে গোষ্ঠীর সাথে নিবীড়, ঘনিষ্ঠ ও আদর্শ মূল্যবোধ আয়ত্তকরণের মাধ্যমে।

শিশু তার জ্ঞানোন্মেষের সাথে সাথে নিজের পরিবারের সদস্যদের আচরণ আয়ত্ত করতে থাকে। সমাজ স্বীকৃত আচার - আচারণ, আদব-কায়দা, আদর্শ মূল্যবোধ, ন্যায়-অন্যায়, ঔচিত্য অনৌচিত্যের ধারণা আয়ত্ত করতে থাকে।

শিশু এই সমস্ত বিষয় সম্পর্কিত ধারণা আয়ত্তে আনে তার পরিবার, খেলাধূলার সঙ্গী-সাথী, সমবয়সীদের গোষ্ঠী প্রভৃতি প্রাথমিক গোষ্ঠীদের মাধ্যমে। খেলার সঙ্গী সাথীরা তাকে শেখার কিভাবে সে তার সমবয়সীদের সাথে মিশবে। একসাথে কাজ করবে, প্রতিযোগিতা করবে কখনও কখনও সংগ্রামও করবে। পরিবার সামাজিকীকরণের কাজ করে। সেই কারণে পরিবারকে সমাজের স্তম্ভ বলা হয়। এবং খেলার গোষ্ঠীকে ভবিষ্যত্যের নাগরিক তৈরির মাধ্যম বলা হয়।

প্রাথমিক গোষ্ঠী শুধু মানুষের চাহিদাকে পরিতৃপ্ত করে না, প্রতিটি সদস্যকে উদ্বুদ্ধ করে তাদের ইচ্ছাকে ছুতে। মুখোমুখি ও ঘনিষ্ঠ পরিমণ্ডল প্রাথমিক গোষ্ঠীর থাকায়। প্রাথমিক গোষ্ঠী বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার সদস্যদের উৎসাহিত ও উদ্দীপিত করে এবং নিয়মানুবর্তীতাও নিপুণ করে তোলে। জীবনের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে ও উদ্দেশ্য সাধানের ক্ষেত্রে, প্রাথমিক গোষ্ঠী সদস্যদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার করে। ব্যক্তি বর্গের মধ্যে এই বোধ সঞ্চারিত হয় যে, কোন উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে সে একেবারে একা নয়, তার পাশে আরোও অনেকে আছে। ম্যাকাইভার ও পেজ 'Society' নামক গ্রন্থে বলেছেন, "Through participation the interest gains a new objectivity. We see it though the eyes of others, and thus it is in some measure freed from irrelevant personal implications.

সামাজিক দৃষ্কিকোণ থেকে (Social point of view)

প্রাথমিক গোষ্ঠী শুধুমাত্র সামাজিকীকরণ ও ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধনের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ নয়, তারা

সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক গোষ্ঠী সামাজিক বিধি আরোপণের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করে। এটা শুধু গোষ্ঠী সদস্যদের নিরাপত্তা দেয় না তার সাথে সাথে তাদের সামাজিক ব্যবহার ও নির্দিষ্ট করে ও সম্পর্কের মধ্যে সুনির্দিষ্ট নিয়মের ব্যবস্থা করে।

প্রাথমিক গোষ্ঠী যেমন পরিবার, খেলাধূলার সঙ্গী সাথী, সামাজিকীকরণের ভূমিকা পালন করে। এই গোষ্ঠীগুলির মাধ্যমেই সামাজিক রীতিনীতি, সভ্যতা সঞ্চালিত হয়। তারাই শিশু বা গোষ্ঠী সদস্যকে সমাজের সুনির্দিষ্ট আচরণ বিধি শেখায়।

প্রাথমিক গোষ্ঠীতেই গোষ্ঠীসদস্য স্নেহ মায়া মমতা, প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা প্রভৃতির সন্ধান পায়। ফলে শিশু ক্রমশ সমাজের দায়িত্ববান সদস্য হয়ে ওঠে।

প্রাথমিক গোষ্ঠী তার সদস্যদের সফলভাবে সামাজিক প্রেক্ষাপটে কাজকরার প্রয়োজনীয় উৎসাহ প্রদান করে। এইভাবে প্রাথমিক গোষ্ঠী সমাজকে সঠিকভাবে চলতে সাহায্য করে ও তার গতিশীলতা বজায় রাখে। "It is the first and generally remains the chief focus of our social satisfaction."

3.4.2 গৌণ গোষ্ঠী (Secondary Group)

আধুনিক সমাজে গৌণ গোষ্ঠীর প্রভাব মারাত্মক। বর্তমানকালে এই গোষ্ঠী সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সমাজের কলেবর ও জটিলতা বৃদিধ সাথে সাথে মানুষ বৃহত্তর কতকগুলি গোষ্ঠীর প্রয়োজন অনুভব করে ও গড়ে তোলে নানান বৃহত্তর গোষ্ঠী, আকারে বড় ও বিশেষ উদ্দেশ্য বিশিষ্ট। এই গোষ্ঠীতে সদস্যদের মধ্যে সান্নিধ্য ও সাহচর্য থাকে না। এ জাতীয় গোষ্ঠীকে গৌণ গোষ্ঠী বলা হয়। গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যগণ অপ্রত্যক্ষাভাবে নানা দূরতর সম্বন্ধে যুক্ত থাকে। K. Davis বলেছেন "The secondary groups can be roughly defined as the opposite of everything already said about primary group".

গৌণ গোষ্ঠীদের বলা হয় 'Special Interest Groups' বা 'Self interest group" উদাহরণ হিসাবে, রাজনীতিক দল, পৌরসভা, শ্রমিক সংঘ প্রভৃতির কথা বলা যায়। গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে মানবিক সংযোগ অনির্দিষ্ট এবং ভাসা ভাসা। এই সম্পর্কগুলি বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ। গোষ্ঠীর মোট সদস্যদের মধ্যে অতি অল্প কয়েক জনের সাথে ব্যক্তিগত ভাবে পরিচয় থাকে। গৌণ গোষ্ঠীতে কোন একজন সদস্য কেবল পরোক্ষভাবে অন্যান্য সদস্যদের প্রভাবিত করতে পারে। এখানে সহকর্মীদের সহযোগিতার সম্পর্ক নিতান্তই পরোক্ষ।

বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক গৌণগোষ্ঠীর বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন—

C. H. Cooley এর মতে "Secondary groups are wholly lacking in intimacy of association and usually in most of the other primary and quasi primary characteristic".

Ogbourm এবং Nimkoft এর মতে, "The groups which provide experience lacking in intimacy are called secondary groups".

Kingsley Davis বলেছেন "Secondary groups can be roughly defined as the opposite of everything said about primary group".

Robert Bierstedt বলেছেন, "Secondary are all those that they are not primary".

গৌণ গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Secondary Group)

1. বৃহৎ আকৃতি (Large in Size)

গৌণ গোষ্ঠীর আয়তন তুলনামূলকভাবে বৃহৎ হয়। স্বভাবতই এই সমস্ত গোষ্ঠীর সদস্য সংখ্যাও অধিক হয়। কোন একটি গৌণ গোষ্ঠীর পরিধি বিশ্বজুড়েও হতে পারে। যেমন— রেড ক্রস সোসাইটি, রোটারি ক্লাব, লাইন্স ক্লাব ইত্যাদি। এরূপ গোষ্ঠী আকৃতিতে বড় কিন্তু প্রকৃতিতে কৃত্রিম হয়।

2. পরোক্ষ সম্পর্ক (Formality)

গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আন্তরিক নয়, পরোক্ষ। এরা প্রাথমিক গোষ্ঠীর সদস্যদের মত প্রাথমিক প্রভাব বিস্তার করে না। এরা আনুষ্ঠানিক নিয়ম ও সাংবিধানিক রীতিনীতি অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হয়। সমষ্টিগত চেতনার পরিবর্তে স্বাতন্ত্র্যবোধের প্রাধান্য বেশি দেখা যায়। আনুষ্ঠানিক সামাজিক নিয়ম যেমন আইন, আদালত, পুলিশ ইত্যাদি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের জন্য। নৈতিক নিয়ন্ত্রণ শুধুমাত্র গৌণ। এই গোষ্ঠীতে মানুষ নিয়মনীতিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, মানব সত্তার ভূমিকা নেই বললেই চলে।

3. নৈর্ব্যক্তিক সম্পর্ক (Impersonality)

গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যরা মুখোমুখি বা প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ভিত্তিতে তৈরি হয় না। এবং এই কারণে গোষ্ঠীর সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক বা অন্তরঙ্গ হতে পারে না। গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক হল পরোক্ষ ও বাহ্যিক। K. Davis বলেছেন— "the touch and go variety" তাই এই সম্পর্ক নৈর্ব্যক্তিকও বটে।

গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যদের মুখ্য উদ্দেশ্য হল নির্দিষ্ট বা বাঞ্ছিত লক্ষ্যে উপনীত হওয়া। ব্যক্তিগত পরিচয়ের জন্য বা সান্নিধ্যলাভের জন্য সদস্যরা গৌণ, গৌষ্ঠীতে সমবেত হয় না। তাই এই ধরণের গোষ্ঠীতে সম্পর্কের ব্যাপ্তি থাকে না। এবং এখানে স্বাতন্ত্র্যবোধের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। সমষ্টিগত চেতনার বিষয়টি উপেক্ষিত।

4. সহযোগিতার পরোক্ষ প্রকৃতি (Indirect Cooperation)

গৌণগোষ্ঠীগুলির অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল সহযোগিতার পরোক্ষ প্রকৃতি। বৃহৎ সংগঠন

গুলিতে মানুষ স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন কার্য সম্পাদন করে।

5. সদস্যপদ স্বেচ্ছাধীন (Voluntary Membership)

গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যপদ সাধারণ বাধ্যতামূলক নয়। এই সদস্যপদ ঐচ্ছিক। অধিকাংশ গৌণ গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য। যেমন রেডক্রস-এর সদস্য কেউ হতে বাধ্য নন।

6. ব্যক্তির মর্যদা ভূমিকা নির্ভর (Status Depends upon Role)

গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যদের মর্যাদা তাদের ব্যক্তিগত বা জন্মগত গুণাবলীর উপর নির্ভরশীল নয়। এই মর্যদা নির্ভর করে তাদের ভূমিকার উপর। উদাহরণ হিসাবে, কোন শ্রমিক সংঘের সভাপতির মর্যাদার কথা বলা যায়। তিনি সংঘে কি ভূমিকা পালন করেন তাঁর উপর নির্ভর করে তার মর্যাদা।

গৌণ গোষ্ঠীর প্রয়োজনীয়তা (Importance of Secondary Group)

গৌণ গোষ্ঠীগুলি বর্তমান আধুনিক সভ্য সমাজে ও শিল্পে এক প্রভাবশালী জায়গা দখল করে রেখেছে। যে সমাজে জীবন তুলনামূলকভাবে সহজ বা যেখানে মানুষের সংখ্যা কম, সেখানে প্রাথমিক গোষ্ঠীর যথেষ্ট গুরুত্ব বিদ্যমান। কিন্তু সমাজে চাহিদা বাড়ার সাথে সাথে শ্রমের বিভাজনের ফলে গৌণ গোষ্ঠীর প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। ছোট ছোট সম্প্রদায়ের জায়.গায় বড় সম্প্রদায়গুলি কেই স্থান দখল করেছে। কুটির শিল্পের পরিবর্তে হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হচ্ছে। জনসংখ্যা গ্রাম থেকে শহরে চলে আসছে। আধুনিকতার পরিবর্তনশীল ধারা সমাজের প্রাথমিক দলগুলিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। মানুষ এখন গৌণ গোষ্ঠীগুলির উপর বেশি নির্ভরশীল তার প্রয়োজন মেটানোর জন্য। যে শিশুরা আগে পরিবারের উষ্ণ পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেছিল, তারা এখন সমাজে হাসপাতালের ঠান্ডা পরিবেশে জন্ম নেয়।

নিম্নোক্ত হল গৌণগোষ্ঠীর সুবিধা (Advantages of Secondary Group)

1. দক্ষতা (Efficiency)

মানবসমাজে কার্যধারার উন্নতিসাধনের ক্ষেত্রে গৌণ গোষ্ঠীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এবং এইসব গোষ্ঠীর মাধ্যমে কর্মনিপুণতা বৃদ্ধি পায়। এই সমস্ত গোষ্ঠীর ব্যবস্থাপনা, তদারকি ও পরিচালনার দায়িত্বে থাকে একটি কর্তৃপক্ষ, এই সমস্ত গোষ্ঠীতে কার্য সম্পাদনার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এখানে কর্ম পদ্ধতির উন্নতি ও নিপুণতা বৃদ্ধির ব্যাপারে চেষ্টা করা হয়। গৌণ সম্পর্ক হয় নির্দিষ্ট কার্যসম্পাদনে সহায়ক। এই অর্থে গণ্য করা যেতে পারে, তারা চরিত্রে কার্যকরী।

2. সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গিকে উদার করে (Wider Outlook)

গৌণ গোষ্ঠী আকার আয়তনে অধিকতর বৃহৎ ও ব্যাপক হয়ে থাকে। দুনিয়া জুড়ে এদের পরিধি পরিব্যাপ্ত, এই সমস্ত গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে থাকে বিশ্বের বিভিন্ন মানুষ, এবং এই

সমস্ত কিছুর সামগ্রিক ফলশ্রুতি হিসাবে আঞ্চলিকতা, প্রাদেশিকতা, জাতপাতের বিচার প্রভৃতি সঙ্কীর্ণতার অশুভ প্রভাব থেকে গোষ্ঠী জীবন মুক্ত থাকে। স্বভাবতই গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গীতে তাকে উদারতা।

3. বিস্তৃত সুযোগ (Wider Oppertunity)

সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের সম্মুখে বিভিধ প্রকারের সুযোগ সুবিধার দ্বার মুক্ত করে দিয়েছে এই সমস্ত গৌণ গোষ্ঠী, পূর্বে বৃত্তির ক্ষেত্রে মানুষের সুযোগ-সুবিধা ছিল একেবারেই সীমিত। অতীতে সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গ প্রধানত কৃষিকার্য, ও ছোটো খাটো ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত। এই সমস কাজকর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল মানুষের বৈষয়িক কাজকর্ম। বর্তমানে কিন্তু ব্যক্তির সম্মুখে বহু ও বিভিন্ন বিচিত্র সুযোগ উপস্থিত হতে দেখা যায়। এই সমস্ত সুযোগ সুবিধা ছড়িয়ে থাকে শিল্প বাণিজ্য, কারিগরি ও অপরাপর নানা ক্ষেত্রে এবং এই সমস্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করে একজন মানুষ অখ্যাত অবস্থা থেকে খ্যাতিমান অবস্থায় উপনীত হতে পারে। মানুষ দিন দিন এই দলের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। আধুনিক বিশ্বে বস্তুগত স্বাচ্ছাদ্য এবং আয়ুর ক্ষেত্রে অসাধারণ অগ্রগতি উত্থান বা লক্ষ্য নির্দেশিত গৌণ গোষ্ঠী ছাড়া অসম্ভব হবে।

প্রাথমিক গোষ্ঠী ও গৌণ গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য :

প্রাথমিক গোষ্ঠী ও গৌণ গোষ্ঠীর এই দুই ধরনের সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বর্তমান। এই দ্বিধাবিভক্তি কুলির দ্বারা অনুভূত হয়েছিল। কিন্তু এটি তাঁর দ্বারা বিশদে করা সম্ভব হয়নি। যাইহোক, প্রাথমিক ও গৌণ গোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন পার্থক্য বিদ্যমান।

1. আকৃতিগত পার্থক্য : (Size)

আকার - আয়তনগত বিচারে প্রাথমিক গোষ্ঠী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতির হয়। এই ধরনের গোষ্ঠী গঠিত হয় বিশেষ একটি এলাকার স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তির সম্বন্বয়ে। অপরদিকে গৌণ গোষ্ঠীসমূহ আকারে আয়তনে অপেক্ষাকৃত বৃহদকারবিশিষ্ট হয়। এই সমস্ত গৌণ গঠিত হয় বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বহুসংখ্যক মানুষের সম্বন্বয়ে।

2. শারীরিক নৈকট্য (Physical Proxinity)

প্রাথমিক গোষ্ঠী গড়ে ওঠে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের উপর ভিত্তি করে। এই গোষ্ঠীর লোকেরা কেবল একে অপরকে মানে না, তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে। এই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগই শক্তিশালী মানসিক বন্ধনে তাদের আবদ্ধ রাখে। গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ নৈকট্যের সম্পর্ক বিরাজ করে না। গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে পরোক্ষ যোগাযোগ ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক সদস্য নিজ নিজ নির্দিষ্ট কাজ করে ও নির্দিশ পালন করে। এর অর্থ হল, গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার তাগিদে প্রত্যেকে স্ব স্ব ভূমিকা স্বতন্ত্র্যভাবে সম্পাদান করে।

3. সময়কাল (Duration)

প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলি দীর্ঘসময়ের জন্য বিদ্যমান। প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলি সম্পর্কগুলি স্থায়ী হয় প্রকৃতিতে। অন্যদিকে গৌণ গোষ্ঠীর সম্পর্কগুলি অস্থায়ী সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ, একটি ক্লাবের সদস্যরা ঘন ঘন আসে এবং কয়েক ঘন্টার জন্য থাকে।

4. সহযোগিতার প্রকার (Kinds of Cooperation)

প্রাথমিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সদস্যরা পরস্পরের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করে থাকে। প্রাথমিক গোষ্ঠীর সদস্যদের ওঠাবসা, আলাপ-আলোচনা, খেলাধূলা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ সবই একসাথে সম্পাদিত হতে দেখা যায়। পক্ষান্তরে গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা হল পরোক্ষ প্রকৃতির। অভিন্ন স্বার্থের উপর ভিত্তি করে স্বীকৃত কোন সাধারণ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার উদ্দেশ্য পরিকল্পিত পথে ব্যক্তিবর্গ গৌণ গোষ্ঠী গঠন করে।

5. কাঠামোর ধরণ (Types of Structure)

সাংগঠনিক কাঠামোগত বিচারে প্রাথমিক গোষ্ঠী হল বিশেষভাবে সরল, এই ধরনের গোষ্ঠীতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হায় সদস্যগণ গোষ্ঠীবদ্ধ হন এবং তাঁরা গোষ্ঠী বদ্ধ থাকেন। বিপরীত ক্রমে গৌণ গোষ্ঠী হল বিশেষভাবে বিধিশাসিত গোষ্ঠী। প্রতিটি গৌণ গোষ্ঠী কতকগুলি বিধিবদ্ধ ও নির্দিষ্ট নিয়মকানুনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। আনুষ্ঠানিকভাবে নির্দিষ্ট কোন কর্তৃপক্ষ গৌণ গোষ্ঠীর পরিচালনার দায়িত্বে থাকে।

6. নিজেই শেষ বনাম শেষের মানে (Ends in itself versus Means to an End)

প্রাথমিক গোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। ব্যক্তি প্রাথমিক সম্পর্কে প্রবেশ করে কারণ, এই ধরনের সম্পর্ক ব্যক্তিগত অবদান, উন্নয়ন, নিরাপত্তা ও কল্যাণে অবদান রাখে। অন্যদিকে গৌণগোষ্ঠী লক্ষ্যভিত্তিক। সদস্যপদ সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যর জন্য তৈরি হয়।

7. অবস্থান (Position)

প্রাথমিক গোষ্ঠীতে, একজন ব্যক্তির অবস্থান বা মর্যাদা তার জন্ম, বয়স অনুসারে নির্ধারিত হয়। কিন্তু গৌণ গোষ্ঠীতে, একজন ব্যক্তির অবস্থান তার ভূমিকা দ্বারা নির্ধারিত হয়। উদাহরণস্বরূপ পিতার অবস্থান জন্মের উপর ভিত্তি করে হয়, সেখানে একটি ট্রেড ইউনিয়নে সভাপতির অবস্থান নির্ভর করে তিনি ইউনিয়নে কী ভূমিকা পালন করবেন তার উপর।

8. ব্যক্তির বিকাশের মধ্যে পার্থক্য (Difference in Development of Personality)

প্রাথমিক গোষ্ঠী একজন ব্যক্তি ও তার ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটায়। অন্যদিকে, গৌণ গোষ্ঠী, একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিশেষ দিকের বিকাশ ঘটায়। তাই যেখানে প্রাথমিক গোষ্ঠীর মাধ্যমে দয়া, সহানুভূতি, ভালোবাসা, সহনশীলতা, পারস্পরিক সাহায্য, ত্যাগের মনোভাব ইত্যাদির মনোভাব গড়ে ওঠে, ঠিক তেমনই গৌণ গোষ্ঠী আত্মস্বার্থ ও আত্মপ্রকাশ ঘটাতে সাহায্য করে।

9. সম্পর্ক (Relationship)

প্রাথমিক গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে বর্তমান থাকে মুখোমুখি পরিচয় ও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক। এই সম্পর্ক হল প্রত্যক্ষ, অন্তরঙ্গ ও ব্যক্তিগত। প্রতিটি সদস্যের ব্যক্তিত্বের সাথে প্রাথমিক গোষ্ঠী সম্পর্কযুক্ত, পক্ষান্তরে, গৌণ গোষ্ঠীর অন্তর্গত সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক পৃথক প্রকৃতির। এই সম্পর্ক হল আনুষ্ঠানিক ও গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যদের উপর প্রাথমিক গোষ্ঠীর কোন ধরনের কোনরকম প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। তার কারণ হল এই ধরনের গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের মধ্যে সাধারণত কোন মুখোমুখি ও প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকে না। তাছাড়া, এই সমস্ত সদস্যদের চিন্তাভাবনা ও মানসিকতায়ও সাদৃশ্য থাকে না। গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে পরোক্ষ যোগাযোগ ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক সদস্য নিজ নিজ নির্দিষ্ট কাজ করে চলে ও নির্দেশ পালন করে থাকে। এর অর্থ হল, গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার তাগিদে প্রত্যেক স্ব স্ব ভূমিকা স্বতন্ত্রভাবে সম্পাদন করে। উদাহরণ হিসাবে, যে কোন দেশের জাতীয় স্তরের একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দল এবং তার সদস্যদের কথা উল্লেখ করা যায়। গৌণ গোষ্ঠীগুলিত গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য ও স্বার্থই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। বিপরীতক্রমে, প্রাথমিক গোষ্ঠীতে প্রাধান্য পায় গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক।

10. সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Social Control)

প্রাথমিক গোষ্ঠীর নিয়োগ পদ্ধতিটি হল আনুষ্ঠানিক (formal) সুতরাং, আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ আরোও কার্যকরী হয়। যেহেতু প্রাথমিক গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে নৈকট্য ও অন্তরঙ্গতা খুব বেশি থাকে, তাই সদস্যদের উপর বিশেষ আকারে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। প্রতিবেশী ও পরিবারের ব্যক্তি বিশেষের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এত বেশি থাকে যে তারা মাঝে মাঝে সেই পরিবেশ থাকে পালাতে চায়।

অন্যদিকে, গৌণ গোষ্ঠীগুলিতে লঙ্ঘনের বিচ্যুতি পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন উপায় ব্যবহার করা হয়। সম্পর্কের মধ্যে আনুষ্ঠানিক আর্দশ বিদ্যমান থাকায় সামাজিক নিয়ন্ত্রণগুলি আরাও কার্যকরী হয়।

3.4.3 নির্দেশক গোষ্ঠী (Reference Group / Tertiary Group)

অনুকরণ করার প্রবণতা মানুষের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। এই প্রবণতা মানব প্রকৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিবেচিত হয়। সমাজস্থ ব্যক্তি বর্গের মধ্যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অন্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে অনুকরণ করার ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। উন্নতির সোপান বেয়ে যখন কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে ক্রমে উপরে উঠতে থাকে, তখন অপরাপর ব্যক্তি বা গোষ্ঠীতে একই পথ ধরে যাত্রা করে উন্নতি লাভের উদ্দেশ্য আগ্রহী ও উদ্যোগী হয়ে থাকে। এই যে অপর গোষ্ঠীর রীতি-পদ্ধতি প্রভৃতি অনুকরণ তথা আয়ত্ত করার উদ্যোগ আয়োজন তার পিছনে থাকে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর সম্মান প্রতিপত্তি প্রাপ্ত হওয়ার বাসনা। অন্যানদের সঙ্গে তুলনা করে এই ধরনের যে আচরণ তাকে বলা হয়, 'নির্দেশক আচরণ'।

নির্দেশক গোষ্ঠী ও নির্দেশক আচরণের কিছু বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

- বিশেষ কোন ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠী আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতির ব্যাপারে অপর কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে আদর্শরূপে গণ্য করে ও তাদের অনুসরণে আগ্রহী ও উদ্যোগী হয়।
- সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অপর ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর পরিপ্রেক্ষিতে নিজেকে বিচার করে দেখে।
- সমাজে যে স্তরবিন্যাস বর্তমান, তার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠী, নির্দেশক গোষ্ঠী ব্যবহারের মধ্য দিয়ে উপরে ওঠার চেষ্টা করে। এই ধরনের ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর সাধারণ নিজের দুর্বলতা, ন্যূনতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে সচেতনা থাকতে দেখা যায়।

3.5 সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া

জন্মের পর শিশু তার শারীরিক চাহিদা পূরণে ব্যস্ত থাকে। যখন সে বড় হতে থাকে, তার চাহিদা, আশা-আকাঙ্খা স্বীকৃতি ও আদর্শ বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যায়। সমাজে বড়রা সামাজিক আর্দশে অনুপ্রাণিত হয়। কিন্তু ব্যক্তিত্ব বিকাশ কোন স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া নয়। নবজাতকে ব্যক্তিত্ববিকাশের সামাজিক প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রত্যেক সমাজে তার নিজস্ব উপায় পদ্ধতি নির্দেশ করে। এই সামাজিক প্রশিক্ষণই সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া হিসাবে পরিচিত, এটি একটি জীবন ব্যাপী প্রক্রিয়া, মানুষ নিজের সমাজে থেকেই তার সামাজিক মূল্যবোধ শেখে। Drever এর মতে "Socialization is a process by which the individual is adapted to his social environment (by attaining social conformity) and becomes a recognized, co-operating and efficient member of it".

সংজ্ঞা (Definition)

মার্গারেট মিড ও লিন্টনের মত নৃত্তত্ত্ববিজ্ঞানীদের মতে, সমামাজিকরণ হল কোন গোষ্ঠীর সংস্কৃতি গ্রহণের প্রক্রিয়া। সংস্কৃতি নাম ছাতার নীচে আমরা সাধারণ, ঐতিহ্য, কার্যাবলী, জ্ঞান, কৃষ্টি ইত্যাদিকে অন্তভুর্ক্ত করি।

বসের মতে, সামাজিকীকরণ হল একটি অনুভূতি এবং সাহর্য্যে ও একসাথে কাজ করার ইচ্ছার মাধ্যমে বিকাশিত হয়।

Cook বলেছেন, সামাজিকীকরণের ফলস্বরূপ, একজন শিশু ক্রমে সমাজের অংশ হয়ে ওঠে এবং সামাজিক দায়িত্ব নিয়ে সমাজের উন্নতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে।

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া (Proccss of Socialization)

বিভিন্ন সামাজিক উপাদান যা সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

1. শিশু পালন (Child Rearing)

সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা বিশেষভাবে কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃত প্রস্তাবে পরিবারের মধ্যেই সামাজিকীকরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে থাকে শিশুর জন্মের আগে থেকে। পারিবারিক জীবনের ক্রোড়ে শিশুর শৈশব কাটে, শিশু পালিত হয়। স্বভাবতই পরিবার জীবনের সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট যাবতীয় পরিবারের মধ্যেই সামাজিক নীতিবোধ ও নাগরিক চেতনার সূত্রপাত ঘটে। সহযোগিতা, সহিষ্ণুতা, সম্প্রীতি, আত্মত্যাগ, রীতিনীতি, সামাজিক নিয়মাবলী প্রভৃতি শিক্ষা শিশু পরিবারের মধ্য থেকেই অর্জন করে।

2. সহমর্মিতা (Sympathy)

লালন-পালনের মতো, সহানুভূতিও একটি শিশুর সামাজিকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শৈশবে, শিশু তার সমস্ত প্রয়োজনীয়তা মেটানোর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে পরিবারের উপর নির্ভরশীল। পরিবার শুধু শিশুর চাহিদা পূরণ করে না, তার সাথে প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ সহযোগিতা ও সহমর্মিতা দেখায়। এই সহমর্মিতায় শিশুর মধ্যে 'আমরা বোধ' জাগায় এবং তাকে তার প্রকৃত শুভাকাঙ্খী থেকে অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে বৈষম্য করতে শেখায়। শিশু সেই সমস্ত মানুষদেরকে আরোও বেশি ভালোবাসতে শুরু করে যারা শিশুর সাথে সহানুভূতি দেখায়।

3. সহযোগিতা (Co-operation)

সমাজ শিশুকে সামাজিক করে তোলে। অন্যকথায় বলতে গেলে, সহযোগিতা শিশুর সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিশু যাদের কাছ থেকে সহযোগিতা পায়। পরবর্তীক্ষেত্রে, তাদের প্রতিও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়।

4. পরামর্শ (Suggestion)

সামাজিক পরামর্শ শিশুর সামাজিকীকরণকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। শিশু তার শুভাকাঙ্খীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করে। সুতরাং, পরামর্শ সামাজিক আচরনের দিক নির্ধারণ করে।

5. সনাক্তকরণ (Identification)

বাবা-মা, শুভাকাঙ্খী ও আত্মীয়স্বজনের ভালোবাসা শিশুর মধ্যে তাদের সাথে পরিচয়ের অনুভূতি গড়ে তোলে। যারা শিশুর সাথে সহানুভূতিশীল আচরণ করে, শিশু তাদেরকে শুভাকাঙ্খী হিসাবে বিবেচনা করে সেই অনুযায়ী কাজ করতে থাকে।

6. অনুকরণ (Imitation)

সামাজিকীকরণের মূল বিষয় হল অনুকরণ, শিশুকে সামাজিক করে তোলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল অনুকরণ, শিশু তার পরিবারের সদস্যদের আচরণ, আবেগ, অনুভূতি অনুকরণ করে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে। অনুকরণ শিশুকে সামাজিক করে তোলার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

7. সামাজিক শিক্ষা (Social Teaching)

অনুকরণ ছাড়াও, সামাজিক শিক্ষা শিশুর সামাজিকীকরণকে প্রভাবিত করে। সামাজিক শিক্ষা পরিবারের দ্বারা শিশুর মধ্যে সঞ্চালিত হয়।

8. পুরস্কার এবং শাস্তি (Reward & Punishment)

পুরস্কার ও শাস্তি একটি শিশুর সামাজিকীকরণের উপর বড় প্রভাব ফেলে। যখন একটা শিশু সমাজের আদর্শ ও বিশ্বাস অনুযায়ী আচরণ করে, লোকেরা তার প্রশংসা করে ও তার আচরণকে অনুমোদন করে। উল্টে কিছু অসামাজিক কাজ করলে তার সমালোচনা হয় এবং সমাজ দ্বারা নিন্দিত হয়। এই ধরনের শাস্তি শিশুকে অসামাজিক অবস্থা থেকে দূরে সরিয়ে দেয় ও সঠিক সামাজিকীকরণের দিকে পরিচালিত করে।

3.5.1 সামাজিকীকরণে পরিবারের ভূমিকা (Role of Family in Socialization)

পরিবার সমাজের সবচেয়ে প্রাচীন ও দীর্ঘস্থায়ী সংগঠন। পরিবারেরই শিশুর সামাজিকীকরণ শুরু। পরিবার সাধারণ পিতা, মাতা, এবং তাদের সন্তান-সন্ততি সহ আরোও দু-চারজন লোকের সম্বন্বয়ে গড়ে ওঠে যারা একই বাড়িতে থাকে এবং একই আদর্শ ও সামাজিক রীতিনীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত। সমাজব্যবস্থায় প্রতি পরিবারের যে সাধারণ মনোভাব থাকে তা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত শিশু মনের উপর গভীরভাবে রেখাপাত করে। পরিবারের যৌথ সিন্ধান্ত সমূহ শিশুর কাছে কর্তৃত্ববাহক প্রতিপন্ন হয়। ঐতিহ্যগত ভাবে, প্রতিটি সমাজে পরিবারকে একটি একক হিসাবে দেখা হয়েছে, সামাজিক প্রতিষ্ঠানে যা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে।

প্রতিটি শিশু কোন না কোন পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। এবং তার দায়িত্ব পরিবার নেয়। পারিবারিক কাঠামোর মধ্যে লালন-পালন, আর্দশ বা গৃহীত আচরণ শেখানো হয়। মূলত এটি বলা যেতে পারে, সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়, প্রত্যেকের জন্য পরিবার থেকে। এখানে পিতৃ-মাতা, বিশেষত্ব শিশুর উপর মাতৃত্বের খুব বেশি প্রভাব দেখা যায়। মা ও সন্তানের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক শিশুর ক্ষমতা গঠনের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। ফলে বলা যায়, এভাবেই শিশু তার সামাজিক যোগ্যতা অর্জন করে এবং কালক্রমে সেই যোগ্যতাকে পরিবর্ধিত করে। শিশু কথা ও ভাষা শেখে পরিবারের মাধ্যমেই। জীবনের শুরু থেকেই পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে শিশুর জৈবিক, মানসিক আশা আকাঙ্খাসমূহ পরিতৃপ্ত হয়ে থাকে। পরিবারের আবেগময় পরিবেশে শিশুর সামাজিকীকরণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে।

3.5.2 সামাজিকীকরণে বিদ্যালয়ের ভূমিকা (Role of Family in Socialization)

সমাজজীবনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিদ্যালয়ে হল প্রথাভিত্তিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ মাধ্যম। প্রাথমিক স্তরে, শিশুর মনে সমাজচেতনা জাগিয়ে তোলা এবং প্রচলিত আচার - অনুষ্ঠান, লোকসংস্কৃতির সাথে পরিবারের পরিয়ে করিয়ে দেওয়া। এই সামাজিকীকরণ শিশুর সামাজিক পরিচয়ের জন্য অতীব প্রয়োজন।

পরবর্তী পর্যায়ে প্রাক কৈশোর, কৈশোর এবং যৌবণে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হল প্রতিটি ক্রমবর্ধমান ব্যক্তিকে মানবসম্পদে পরিণত করে তোলা। আদর্শ মূল্যবোধ ও সামাজিক দায়দায়িত্ব সম্পন্ন সুনাগরিক গড়ে তুলতে বিদ্যার্থীকে সহায়তা করে শিক্ষালয়। গণতান্ত্রিক দেশে নাগরিকদের সুস্থ মনোভাব গড়ে তোলার দায়িত্ব শিক্ষার।

বিদ্যালয়ের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল— প্রতিটি সমাজের নিজেস্ব প্রথা, রীতি, ঐতিহ্য, শিল্প, ধর্ম যা প্রাচীনকাল থেকে সেই সমাজে উত্তরাধিকার সূত্রে বহমান তা বিদ্যালয় সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া মাধ্যমে উত্তরাধিকারী হিসাবে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সরবরাহ করে ও সেই সমাজে মূল্যবোধ ও আচরণের নিদর্শন তৈরি করে। শিক্ষার সাহায্যে ছাত্ররা 3R (পড়া, লেখা ও পাটিগণিত) সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জন করে এবং দৈনন্দিন জীবনে পূর্ণাঙ্গ প্রয়োগের মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনে তার প্রয়োগ করে ও সমাজে সুখে বসবাস করে। একমাত্র বিদ্যালয় যা এই 3R কে 7R কে রূপান্তরিত করে অর্থাৎ পড়া, লেখা, গণিত এর সাথে সম্পর্ক, দায়িত্ব, বিনোদন ও পূনর্গঠন যুক্ত হয়। বিদ্যালয়ই একটি শিশুকে সামাজিক দায়িত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান দান করে তাকে সামাজিক ক্ষেত্রে দায়িত্ববান করে তোলে। বিদ্যালয় শিশুকে গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে বড় করে তাকে সেই পরিবেশের উপযুক্ত হিসাবে গড়ে তোলে। ছাত্ররা গণতান্ত্রিক পরিবেশে কিভাবে নিয়মকানুন শিখবে, কিভাবে অন্যদের সাথে ব্যবহার করবে — এগুলির মধ্যদিয়েই শিশুর সামাজিকীকরণ সাধিত হয়। স্কুল শিক্ষা এমন একটি পরিবেশ যার মাধ্যমে শিশুর প্রতিনিয়ত চরিত্র ও গুণাবলী গঠনের মাধ্যমে শিশু তার পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ ও সম্ভাবনা পূরণে সক্ষম হয়ে ওঠে, বিদ্যালয় শিক্ষার্থীর বিভিন্ন ধরনের সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করে তোলে এবং এইসব ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে তাদের মধ্যে নেতৃত্ব বিকশিত হয়। স্কুল শিশুকে সামাজিক পরিবেশ প্রদান করে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কাজে উৎসাহ দানের মাধ্যমে, সমাজ সেবামূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদানের মাধ্যমে, সামাজিক অনুষ্ঠান, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা প্রভৃতি অনুষ্ঠান সম্পাদানের মাধ্যমে। এর ফলে শিশুর মধ্যে বিভিন্ন নিয়ম ও সামাজিক মূল্যবোধ যেমন— সহানুভূতি, সহযোগিতা, সহনশীলতা, সামাজিক চেতনা ইত্যাদির বিকাশ হয়। সামাজিক আচরণ গড়ে ওঠে।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলতে পারি যে, শিশুর সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় বিদ্যালয়ের বিশেষ তাৎপর্য আছে। শিক্ষা একটি গতিশীলও ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, যা শিশুর মধ্যে চিন্তাভাবনা, যুক্তি, সমস্যা সমাধানের দক্ষাতা, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ইত্যাদির ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সঠিক সঞ্চার ঘটিয়ে সমাজে সঠিক আচরনের বীজের বপন করে ও সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে। Emaile Durkheim, ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ্ শিশুর সামাজিকীকরণে শিক্ষার ভূমিকা প্রসঙ্গে বলেছেন— "Education is the influence exercised by adult generation on those that are not yet ready for social life. Its object is to arouse and to develop in the child a certain number of physical, intellectual and moral traits that are demanded of him by the society". সংক্ষিপ্তভাবে বলতে গেলে, শিক্ষা আগামী প্রজন্মের সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়া।

বিদ্যালয় বিভিন্নভাবে শিশুকে সামাজিক করে গড়ে তোলে।

প্রথমত, শিক্ষার্থীরা তাদের বয়স অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট পাঠক্রমের মাধ্যমে 3R : লেখা, পড়া ও পাটিগণিত শেখার মাধ্যমে সমাজের উপযুক্ত হয়ে ওঠে। তাদের এই পর্বে তাদেরকে সমাজের উৎপাদনশীল সদস্য হিসাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হয়।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষার্থীরা তাদের সহপাঠীদের সাথে বিদ্যালয়ে মেলামেশা করে, এর ফলে পারস্পরিক ক্ষেত্রে সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ার পরিবেশ সংগঠিত হয়।

তৃতীয়তঃ, বিদ্যালয় গৃহ পরিবেশের সম্পূরক ভূমিকা পালন করে। পরিবারে যে অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব নয় তা বিদ্যালয় পরিবেশে লাভ করা যায়।

যেখানে কার্যকরী তাত্ত্বিকরা বিদ্যালয়ের সামাজিকীকরণের এই সমস্ত দিকগুলি উদ্বৃত করেন, সেখানে দ্বন্ধ তাত্ত্বিকরা পরিবর্তে জোর দেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত লুকানো পাঠক্রমের উপর। স্কুলটি যে সমাজে আছে, সেই সমাজের কৃষ্টি ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক ও মূল্যবোধ শিশুর মধ্যে সঞ্চার করা হয়। শিশু প্রাথমিকভাবে দেশের ভালো জিনিসগুলির সম্বন্ধেই অবগত হয় তা সে পুরনো হোক বা নতুন। তারা শেখে সামাজিক জীবনে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ধৈর্য্য, বাধ্য থাকার প্রয়োজনীয়তা। তাদেরকে শেখানো হয় কিভাবে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে হয় ভালো নম্বর, গ্রেড ও অন্যান্য পুরষ্কার জিততে। এইভাবে তারা দেশকে ভালোবাসতে শেখে এবং দেশের ঘামতি বা দোষ ধরতে শেখে না, তারা এমন বৈশিষ্ট্যগুলি শেখে যা তাদেরকে কাজের জন্য প্রস্তুত করে ও ভবিষ্যতে দেশের একজন উৎপাদনশীল নাগরিক হতে সাহায্য করে। সামাজিক প্রভাব প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রভাব শুরু হবার অনেক আগে থেকে শুরু হয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ হবার পরও চলে।

3.6 সারাংশ

একটি গোষ্ঠী সামাজিক হয়ে ওঠে, তখন তার অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার সম্পর্ক থাকে, সামাজিক মিথস্ক্রিয়া সামাজিক গোষ্ঠীর মৌলিক শর্ত। বাজারে, মেলায় শত শত মানুষ হাঁটছে, ট্রেনে বহুলোক ভ্রমণ করছে, তারা সামাজিক দল নয়, এর প্রধান তাদের মধ্যে পারস্পরিকভাবে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া ঘটছে না। দুই ব্যক্তি, একজন থাকে আহমেদবাদে আর অন্যজন থাকে নিউ ইয়র্কে, টেলিফোনে কথপোকথনের মধ্য দিয়েই তাদের সামাজিক মিথস্ক্রিয়া সাধিত হয়। যদিও তারা একে অপরের থেকে অনেকদূরে অবস্থান করে। সামাজিক গোষ্ঠী তৈরি হয় সেই সমাজ ও তার সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে। মানুষ সামাজিক গোষ্ঠীরই ফসল। বেশিরভাগ নৃতত্ত্ববিদ্‌রা বিশ্বাস করেন যে, মানুষ এই পৃথিবীর বুকে সবথেকে সফলতমজীব, তার একমাত্র কারণ, মানুষ পরস্পরের একত্রে এই পৃথিবীর বুকে বসবাস করতে পারে। মানুষ সবসময় অন্য মানুষের উপর প্রতিরক্ষা, খাদ্য ও আশ্রয়ের জন্য নির্ভরশীল। তারা পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন চাহিদা পূরণ করে। এই পারস্পরিক সহযোগিতাই সামাজিক গোষ্ঠীগুলি গড়ে ওঠার মূল ভিত্তি। এটি মানব সমাজের ভিত্তি, শিক্ষা ও গোষ্ঠীজীবনের সম্পর্ক খুব নিকট। শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমেই গোষ্ঠীগুলি তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ব্যাপ্ত হয়। প্রাথমিক ও গৌণ গোষ্ঠীগুলি

শিশুকে নানান ধরনের মিথষ্ক্রিয়ায় সাহায্য করে থাকে। অন্তগোষ্ঠী বর্হিগোষ্ঠীগুলি শিশুকে নানান ধরনের মিথষ্ক্রিয়ার সাহায্য করে থাকে, অর্ন্তগোষ্ঠী, বর্হিগোষ্ঠী ও নির্দেশক গোষ্ঠী ইত্যাদি গোষ্ঠীগুলি শিক্ষা প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এজন্য সঠিক নির্দেশনা ও পরামর্শদানের প্রয়োজন।

3.7 স্বমূল্যায়ণ প্রশ্নাবলী

1. সামাজিক গোষ্ঠী কি?
2. সামাজিক গোষ্ঠীর যেকোন দুটি বৈশিষ্ট্য লেখ।
3. সামাজিক গোষ্ঠীতে শিক্ষার ভূমিকা কি?
4. প্রাথমিক গোষ্ঠী কি?
5. প্রাথমিক গোষ্ঠীর একটি উদাহরণ দাও।
6. প্রাথমিক গোষ্ঠীর একটি বৈশিষ্ট্য লেখ।
7. গৌণ গোষ্ঠীর একটি বৈশিষ্ট্য লেখ।
8. গৌণ গোষ্ঠী বলতে তুমি কি বোঝ?
9. গৌণ গোষ্ঠীর সুবিধা লেখ।
11. প্রাথমিক ও গৌণ গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য লেখ।
12. আঞ্চলিক গোষ্ঠী বলতে কি বোঝ?
13. গৌণ গোষ্ঠীর উদাহরণ দাও।
14. সামাজিকীকরণ কি?
15. সামাজিকীকরণের যে কোন দুটি মাধ্যম সম্বন্ধে লেখ।
16. সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা কি?
17. সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের ভূমিকা কি?

3.8 অভিসম্বন্ধ (Reference)

Aggarwal, J. C (2002) Theory and Principles of Education (13th ed) New Delhi: Vikash Publishing House

Bhatia, K & Bhatia, B. D (1992) Theory and Principales of Education (20th Ed)

Bhattacharya, D. C (1996). Sociology (6th ed.) Cacutta Vijoya Publishing House.

Ravi, S. S (2015) A comprehensive study of Education (2nd Ed) Delhi : PHI Learning Sharma, Y. K. (2016) Foundation in Sociology of Education, Delhi : Kaniska Publishers.

Francois E. J (2019) Education and Society In : Building Global Education with a Local Perspective. Palgrave Macmillan, New York.
Retrieved from : https://link.springer.com/chapter/10.1057/9781137386779_/

Kuppuswamy, B (2000) Social Change in India (5th Ed) Delhi : Konam Publishers

Pandey, R. S (2009) Principles of Education (13th Ed) Agra 2 : Agrawal Publications

Ravi, S. S (2015) A Comprehensive Study of Education (2nd Ed) Delhi : PHI Learning.

Sharma, Y. K. (2016) Foundation in Sociology of Education, Delhi : Kauishka Publishers.

Society and Education – NIOS (2019)
Retrieved from : https : //nios.ac.in/media/documents/dled/Block I-507.pdf

একক 4 ❑ সামাজিক চিন্তা

গঠন

4.1 উদ্দেশ্য

4.2 ভূমিকা

4.3 ভারতীয় সামাজিক চিন্তাবিদ

4.3.1 **G. S. Ghurye** একজন ভারতীয় সামাজিক চিন্তাবিদ হিসাবে

4.3.2 একজন ভারতীয় সামাজিক চিন্তাবিদ হিসেবে রাধাকমল মুখোপাধ্যায়

4.4 পশ্চিমের সামাজিক চিন্তাবিদ

4.4.1 পশ্চিম সামাজিক চিন্তাবিদ হিসাবে ডুরখেইম

4.4.2 পশ্চিম সামাজিক চিন্তাবিদ হিসাবে কুলি

4.5 সমাজবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক দৃষ্টান্ত

4.5.1 প্রতীকী মিথষ্ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিকোণ

4.5.2 কার্যকারী দৃষ্টিকোণ

4.5.3 দ্বন্দ্বের দৃষ্টিকোণ

4.6 সারাংশ

4.7 স্ব-মূল্যায়ণ প্রশ্নপত্র

4.8 অভিসম্বন্ধ

4.1 উদ্দেশ্য

এই এককের মধ্য দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা সক্ষম হবেন—

- Ghurye এবং রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের অবদান সম্বন্ধে জানবে ও তাঁদের ভূমিকা সমাজতত্ত্ববিদ্ হিসাবে।
- Durkheim এবং Cooley এর অবদান পশ্চিমী সমাজতত্ত্ববিদ্ হিসাবে
- সমাজবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক দৃষ্টান্ত

4.2 ভূমিকা

পুরানে একটি গল্প আছে যেখানে সাতজন অন্ধ ব্যক্তিত্ব হাতির বর্ণনা করছে। যারা কোনদিন হাতি দেখেনি। হাতির শুঁড় ছুয়ে অন্ধ ব্যক্তিদের একজন বলল এটা একটা সাপ, অন্যজন হাতির দেহ স্পর্শ করে বলল এটা একটা প্রাচীর। ঠিক এইভাবে, হাতির বিশাল দেহের মতো সমাজবিজ্ঞানকে ভিন্নভাবে ব্যাখা করা হয় বিভিন্ন মতাদর্শে।

Ghurye কে বর্ণনা করতে গেলে দুটি পন্থা প্রয়োজন। প্রথম পন্থা হল Ghurye এর সমস্ত কাজকে বিষয়বস্তু হিসাবে ভাগ করা হয় ও পরে প্রতিটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়। বিষয়গুলি দেখায় প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়াগুলির উপর Ghurye এর মতামত। তাঁর লেখার বিচার করার জন্য তাঁর লেখা বিষয়ভিত্তিক হিসাবে সাজানো হয়েছে এভাবে জাতি, উপজাতি, পরিবার এবং আত্মীয়তা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সামাজিক টানা পোড়েন ইত্যাদি আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ব্যাখা করারও চেষ্টা করা হয়েছে Ghurye এর লেখার চিন্তাভাবনাগুলি সাম্প্রতিক কালের পরিপ্রেক্ষিতে। বর্তমান সমাজতত্ত্ববিদরা বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিতে সমসাময়িক সমাজতাত্ত্বিকরা Ghurye এর অবদানকে বিশ্লেষণ করেছেন।

দ্বিতীয়ত, Ghurye এর লেখাকে বিভিন্ন পর্বে ভাগ করা যায় কিনা সেই প্রশ্ন এখানেও প্রাসঙ্গিক। প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ Ghurye একজন প্রখ্যাত লেখক ছিলেন ষাট বছরের ও বেশি সময় ধরে লিখেছেন। আমরা জানি যে, কিছু এমন লেখক আছেন যারা পরিবর্তন করেছেন তাদের মতামত এবং এমনকি তাদের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের পন্থা। হার্ডেল লাস্কি, জন্য উদাহরণস্বরূপ একটি তীব্র, একটি বিশ্লেষণাত্মক এবং গ্রহণযোগ্য মনের অধিকারী এবং এটি গ্রহণ করা হয় তার চিন্তা বিশ্লেষণ করার জন্য জীবনের বিভিন্ন পর্যায় বিবেচনা করা হয়।

4.3 ভারতীয় সামাজিক চিন্তাবিদ

4.3.1 G. S. Ghurye

জীবনী : Ghurye কে ভারতীয় সমাজ বিজ্ঞানেরজনক বলে অভিহিত করা হয়। তাঁকে ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানের সেনাপতি বলা হয়। Ghurye নিজে পন্ডিত ছিলেন, যিনি স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানীদের সমগ্র প্রথম প্রজন্ম গড়ে তুলেছেন, প্রায় এক হাতে। সমাজ ও সমাজতাত্ত্বিক বুলেটিনও তাঁর সৃষ্টি যা ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হওয়ার কৃতিত্বকে সমর্থন করে। Ghurye তাঁর বিখ্যাত বই 'Caste and Race in India' তে প্রথাগত বিধিবদ্ধ ছকের বাইরে গিয়ে ভারতের বর্ণ প্রথাকে অন্য আলোক বিচার করলেন। এই বিখ্যাত বিশিষ্ট বইতে তিনি তার সমসাময়িকদের মত জাতকে মহিমান্বত বা নিন্দা করলেন না। বরং তিনি বর্ণকে ভারতীয় সংস্কৃতির অবেচ্ছদ্য অংশ হিসাবে বিবেচনা করলেন, যা সময় ও সামাজিক উত্তরণের সাথে সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে এবং যা সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের কাছে

আগ্রহের বিষয়। Ghurye এর মতে ভারতীয় সমাজ কোন দিনই স্থিতিশীল ছিল না। ভারতীয় সমাজের প্রবাহ শুরু হয়েছিল প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা থেকে। মধ্যযুগীয় সমাজের পথ অতিক্রম করার পর এখন আধুনিক সমাজের উপস্থিত। Ghurye মনে করতেন যদি, কেউ তিনটি পথে, সমাজকে উপলব্ধি না করে, তাহলে ভারতীয় সমাজ ও সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ন উপলব্ধি হবে না। আংশিক উপলব্ধি অনেক সময় ব্যক্তি বিশেষকে বিভ্রান্ত ও ভুলবার্তা দিতে পারে। Ghurye মনে করতেন কোন সামাজিক সংগঠনকে জানতে হলে তার বিষয়ে তিনটি জিনিস জানা দরকার — স্থানান্তর, প্রতিস্থাপন ও রূপান্তর।

কাজ ও লেখনী (Works & Writings) :

Ghurye এর লেখনীতে যে বিভিন্ন বিষয়ের স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায় সেগুলি হল—

1. বর্ণ (Caste)
2. উপজাতি (Tribe)
3. জ্ঞাতিত্ব (Kinship)
4. সংস্কৃতি ও সভ্যতা (Culture & Civilization)
5. ধর্ম (Religion)
6. সামাজিক সংঘর্ষ ও একতা (Soceology of Conflict and Integration)
7. পরিবার ও বিবাহ (Family and Marriage)

Ghurye এর অসামান্য অবদান দেখা যায় ভারতীয় সংস্কৃতি, আচার আচরণের উপর। তাঁর ছয়টা বই ভারতীয় সমাজের উপর ধর্মের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছে। বইগুলি হল— Indian Sadhus (1953), Gods and Men (1962), Religions Conciousness (1965), Indian Accumulation (1977), Vedic India (1979) এবং The Legacy of Ramayana (1979).

Ghurye এর মতে বর্ণ হল তুলনামূলক, ঐতিহাসিক ও তত্ত্ববিদ্। Ghurye তার সমসাময়িকদের মত বর্ণকে না গোরাবান্বিত করেছেন, না নিন্দা করেছেন। বরং বর্ণকে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির পণ্য হিসাবে বিবেচনা করেছেন, যা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়। Ghurye বলেছেন এটাই সমাজতত্ত্বে আগ্রহের সৃষ্টি করে। তাঁর বই 'Caste and Race in India' তিনি স্যার হারর্বাট রিসলের সাথে সহমত সে বর্ণ হল একটি জাতি যা ভারতে আসে আর্যদের সাথে। Ghurye এটাকে দুভার্গ্যজনক বলেছেন যে, বর্ণপ্রথা বেশিরভাগই উপলব্ধি করা যায় ব্রাহ্মণ্যের আধিপত্যের পরিপ্রেক্ষিতে। ভারতীয় ইতিহাসে বর্ণাশ্রম প্রথা বিভিন্ন সংমিশ্রণ ও বিভাজনের মধ্যে দিয়ে গেছে। বৈদিকযুগে বর্ণভেদ প্রথা আর্যদের থেকে অনার্যদের নিজেদের আলাদা করেছে শুধু রঙের দিক থেকে কিন্তু পরবর্তীকালে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী একে অপরের সাথে মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং হিন্দু সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ আর্য সম্প্রদায় থেকে অনার্য সম্প্রদায়

থেকে অনার্য সম্প্রদায়ে স্থানান্তরিত হয়েছে। আর্যরা কখনই নিজেদেরকে ব্রাহ্মণ বা অ-ব্রাহ্মণদের বিপরীতে উচ্চতর জাতি হিসাবে পরিচয় করিয়ে দেয়নি। আর্য সমাজ নিজেই বিভিন্ন ধরনের পেশার অনুশীলন করত যা বরাদ্দ ছিল বিভিন্ন ব্যক্তি ও পরিবারের কাছে। তাদের পেশার ভিত্তিতে বর্ণাশ্রম প্রথা তৈরি হয়। তাই আর্য সমাজের স্থাপতি, কৃষক যোদ্ধা, কারিগর ইত্যাদি শ্রেণি ছিল এবং তাদের সমাজ ছিল অত্যন্ত সুশঙ্খল, সংগঠিত ও প্রগতিশীল। Ghurye বলেছেন, এটা সত্য যে আর্যদের আর্বিভাবের সাথে ভারতে বর্ণের বিকাশ ঘটেছে এবং তারা জাতিগত চরিত্র ছিল ভারতীয়দের থেকে আলাদা। কিন্তু আর্যদের আবির্ভাবের অনেক আগে থেকেই ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে বর্ণের অস্তিত্ব ছিল। ভারতবর্ষ সসময় বহু বর্ণের মিলন ক্ষেত্র। আর্যদের ভারতবর্ষে আসার পর তার সাথে আরোও দুই তিনটে বর্ণ যোগ হয়েছে। বর্ণ কখনই বংশতান্ত্রিক বিস্ফোরক নয়। শ্রেণীবদ্ধ শোষণমূলক ব্যবস্থাও না। আর্যরা যে বর্ণাশ্রণ প্রথা বহন করত তা তাদের জীবনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও উন্নীত করেছে। তাদেরকে বিশেষত্ব প্রদান করেছে, পেশা হিসাবে তাদের স্থান নির্দিষ্ট করেছে। কোন জাতই শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট ছিল না। পেশা পরিবর্তনও সম্ভব ছিল। তাই আর্যরা অন্যরকম ও বিশেষায়িত হয়ে ওঠে ও মানুষ আর্যদের অনুসরণ শুরু করে উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্য। এবং সেই হিসাবে তারা আর্যদের জীবন, নিয়মনীতি, সব কিছুই নিজেদের জীবনের সাথে মেশাতে শুর করে। রাজারা ব্রাহ্মণদের মাধ্যমে আর্যদের জীবনশৈলী ও রীতিনীতি সমাজের বুকে ছড়াতে থাকেন ও আর্য সংস্কৃতিকে মহিমান্বিত করতে থাকেন। এরাই অনার্যদের মধ্যে আর্য সংস্কৃতির বীজ বপন করেছিল। Ghurye তাঁর বইতে সেটাই তুলে ধরেন যে, আর্য সমাজে শ্রম বিভাজনের সংগঠিত রূপের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে বিবেচিত হত বর্ণ। যোগাযোগ ও যুদ্ধের মাধমে যখন আর্য ও অনার্যদের মধ্যে আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, আর্য সমাজের সুশৃঙ্খল প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তারাও অনার্য সমাজে জাতপাতের উপাদানের প্রবেশ করান। এছাড়াও, পুরোহিত, আর্যদের প্রতিষ্ঠিত মঠগুলি ও ভ্রমণকারীরা আর্য বর্ণ ব্যবস্থার গুণাবলীকে মহিমান্বিত করেছিল। ফলস্বরূপ, আর্য সমাজের বর্ণের উপাদান উত্তর ভারত থেকে দেশের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে।

বর্ণের বৈশিষ্ট্য :

Ghurye ছয়টি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যর ভিত্তিতে ভারতে বর্ণ ব্যবস্থার ব্যাখা করেছেন।

1. সমাজের বিভাগীয় বিভাজন (Segmental division of society)
2. অনুক্রম (Hierarchy) / শ্রেণীবিন্যাস
3. নাগরিক ও ধর্মীয় অক্ষমতা এবং সুযোগ সুবিধা (Civil and Religious disabilities & Previleges)
4. পেশার অবাধ পছন্দের অভাব (Lack of unrestricted choice of occupation)
5. খাদ্য, পানীয় ও সামাজিক মিলনের উপর নিষেধাজ্ঞা (Restriction on food, drinks and social intercourse)
6. অন্তঃবিবাহ (Endogamy)

- **সমাজের বিভাগীয় বিভাজন**

সমাজের বিভাগীয় বিভাজন হল জনসংখ্যাকে গোষ্ঠীতে ভাগ করা। এটা মূলত চরিত্রের অনুভূমিক স্তর বিভাজন। সমাজ সমাজের সদস্যদের গোষ্ঠীতে ভাগ করে কিন্তু তকমা দেয় না। সদস্যপদ দিয়ে চরিত্র বর্ণনা করা হয়। সদস্যতার উপর ভিত্তি করে প্রতিটি সদস্যের নির্দিষ্ট অবস্থান, ভূমিকাও কাজ রয়েছে। এবং সেই অনুসারে, তাদের অর্পিত ভূমিকা তাদেরকে সম্পাদিত করতে হবে। তাদের নৈতিকতা, বাধ্যবাধকতা ও ন্যায্যতার বড় ভূমিকা এর পিছনে আছে।

- **শ্রেণিবিন্যাস**

সমাজের বর্ণ বিভাজনের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক সদস্যদের বিভিন্ন বর্ণে ভাগ করে তাদের একটি পিরামিডিক্যাল কাঠামো দেওয়া হয়, এটিকে বলা হয় শ্রেণীবিন্যাস, বিশুদ্ধতা, স্বচ্ছতা, নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর অগ্রাধিকার, সমাজের পছন্দ ইত্যাদি অনুক্রম অনুসারে সামাজিক অংশগুলির অবস্থান নির্ণয় করা হয় ও বিভিন্ন সামাজিক বিভাগীয় বিভাজনের নিরিখে তাদের স্থান আরোপিত করা হয়। যেটা প্রধানত উল্লম্ব প্রকৃতির। এই বর্ণশ্রেণীবিন্যাস বর্ণের প্রবেশধিকার ও প্রতিরোধ বানানোর জন্য দায়ী। এই বর্ণবিন্যাসই নির্ধারণ করে সমাজের শ্রেণীবিন্যাস এবং এটিই প্রাথমিক হয়ে ওঠে সদস্যদের ভূমিকা বরাদ্দ, দায়িত্ব ভাগাভাগি ও সীমাবদ্ধতা আরোপ করার জন্য। এবং এইসব দায়িত্ব নেবার জন্য Ghurye শ্রেণীবিন্যাস কেই মুখ্যকারণ বলে অভিহিত করেছেন। এটি মূলত শ্রম বিভাগকেই চিহ্নিত করে। সমাজের কার্যক্রমকে সাধারণ সমাজে চারটি ভাগেভাগকরা হয়— ধর্ম, শাসন, রক্ষণাবেক্ষণ ও গাহ্যস্থকর্ম। এই সকল কর্মকান্ডের মধ্যে ধর্মকর্মকে সমাজ সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া হয়। তাই ব্রাহ্মণকে সর্বোচ্চস্থান দেওয়া হয়। দ্বিতীয় কাজ হল শাসন, যা রাষ্ট্রকে নৈপুণ্যের সাথে পরিচালনা ও দেশকে বহিরাগত আগ্রাসন ও আক্রমণের হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করা বোঝায়। তাই এই কাজটি ক্ষত্রিয়দের দেওয়া হয়। ব্যবস্থাপক কার্যক্রমের দায়িত্ব বৈশ্যদের উপর দেওয়া হয়, সমাজের ভরণপোষণের দায় তাদের। গার্হস্থ্য কাজকর্ম ও ভৃত্যদের কার্জকর্ম শূদ্রদের দেওয়া হয় এবং তাদেরকে সমাজে নূন্যতম অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এইভাবে বর্ণ শ্রেণীবিন্যাসে নির্ধারক ভূমিকা পালন করে। ক্রমানুসারে অবস্থান যত বেশি ভূমিকা তত বেশি এবং দায়িত্ব তত বেশি। শ্রেণীবিন্যাসও জীবনের সুযোগ সুবিধা নির্ধারণ করে, যেমন জীবনের সুযোগ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি এবং জীবন সম্পদের ভিত্তি নির্ধারণ করে যেমন সম্পদ, ক্ষমতা, সম্পত্তি ইত্যাদি। যে যত উচ্চপদে আসীন সে তত সুযোগ-সুবিধার অধিকারী। ন্যায়বিচার বন্টনের ধারণা কখনোই প্রচলিত ছিল না কিন্তু বর্ণব্যবস্থায় লঙ্ঘিত হয়েছে বার বার। অগ্রাধিকার মূলক ব্যবস্থা বর্ণব্যবস্থায় প্রচলিত ছিল, যা জাতিগত অধিকার নির্ধারণ করত। বর্ণাশ্রম সমাজে কখনই অধিকার দাবি করত না কিন্তু নির্দিষ্ট বর্ণের উপর অগ্রাধিকার দাবি করত না কিন্তু নির্দিষ্ট বর্ণের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হত। অগ্রাধিকার দেওয়া হত উচ্চবর্ণদের কিন্তু বারণ ছিল নিম্নবর্ণের জন্য। বিধি নিষেধগুলি বর্ণ অনুসারে চরিত্রে আরোপিত হত প্রতিটি বর্ণ অনুসারে চরিত্রে আরোপিত হত। প্রতিটি বর্ণ তার আদর্শ সংস্কৃতি পেয়েছে। প্রতিটি গোষ্ঠী সদস্যরা তাদের নিজেস্ব নিয়ম প্রণালী নির্ধারণের

মাধ্যমে তাদের কার্যকলাপ, আচার আচরণ, নির্ধারিত করে। নিষেধাজ্ঞামূলক নিয়মের উপর আন্তঃবর্ণ ও আন্তঃজাতিগত প্রভাব ছিল বেশি। নিষেধাজ্ঞা শুদ্রদের উপর বেশি সীমাবদ্ধ ছিল। নিষধাজ্ঞা শুদ্রদের উপর যেমন ছিল বৈশ্য ও ব্রাহ্মণদের উপর বেশি ছিল না, আবার জোরদার ছিল উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে।

- **নাগরিক ও ধর্মীয় অক্ষমতা**

নাগরিক ও ধর্মীয় অক্ষমতা বর্ণ প্রথার অনমনীয়তা প্রকাশ করেছে। Ghurye তাঁর লেখার মাধ্যমে দেখিয়েছেন হিন্দু জীবনশৈলীর মধ্যে এই ধরনের অক্ষমতা পরিলক্ষিত ও অনুভূত হয়। বর্ণ নিয়ে অক্ষমতা দেশের বিভিন্ন অংশে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এর মধ্যেও বৈচিত্র্য দেখা যায়। নাগরিক ও ধর্মীয় অক্ষমতা মূলত বিশুদ্ধতা ও দূষণের ধারণা থেকে এসেছে। প্রতিবন্ধী ছিল অপবিত্র ও দূষিত জাত এবং সুযোগ সুবিধা ছিল শুধুমাত্র উচ্চবর্ণের জন্য।

- **পেশার অবাধ পছন্দের অভাব**

পেশাগুলি ছিল বংশানুক্রমিকভাবে সুনির্দিষ্ট, সাধারণভাবে, বর্ণাশ্রম প্রথায়, সামাজিক সদস্যদের অনুমতি দেওয়া হয়নি, তাদের ঐতিহ্যগত পেশা পরিবর্তন করতে। সামাজিক স্তরে অবস্থিত প্রতিটি বর্ণের সদস্যরা নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য ও কাজের গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য অন্য গোষ্ঠীকে যোগদান করতে দেয় না। উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণদের মত।

- **খাবার, পানীয় ও সামাজিক মেলাশোর উপর বিধিনিষেধ**

বর্ণদের উপর কিছু নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল। খাবার ও সামাজিক মেলামেশার উপর ভারতীয় সমাজে বর্ণভেদে কিছু বিধি নিষেধ ছিল। খাবার সাধারণ দুই ধরনের ছিল কাঁচা ও পাকা খাবার। পাকা খাবার খাওয়া ও বিতরণের উপর ছিল নির্দিষ্ট কিছু নিয়মকানুন।

যেমন—

  - বর্ণে যারা দুবার জন্মগ্রহণ করেছে যেমন— ব্রাহ্মণ বর্ণের লোকেরা কাঁচা খাবার গ্রহণ করতে পারে।
  - জাতিগোষ্ঠী যাদের থেকে দুবার জন্ম নেওয়া লোকেরা পাকা খাবার গ্রহণ করতে পারে।
  - জাতিগোষ্ঠী যাদের থেকে দুবার জন্ম নেওয়া বর্ণের লোকেরা জল গ্রহণ করতে পারে তবে খাবার নেই।
  - জাতিগোষ্ঠী যাদের থেকে দুবার জন্ম নেওয়া বর্ণের লোকেরা জল বা খাবার গ্রহণ করতে পারে না ও দূরত্ব বজায় রাখে।

- **অন্তঃবিবাহ (Endogamy)**

ভারতীয় বর্ণপ্রথা প্রাথমিক ভাবে মেরুকরণ করে অন্তঃবিবাহ প্রথার। এক বর্ণের মানুষ শুধু সেই

বর্ণের মানুষকেই বিবাহ করতে পারে। এই নিয়ম কেউ অবমাননা সেটা অপরাধ বলে বিবেচিত হয় না, পাপ হিসাবে নিন্দা করা হয়। পঞ্চায়েত শুধুমাত্র অন্তঃবর্ণ বিবাহের নিন্দ করে না, যারা এই নিয়ম ভঙ্গ করে তাদের উপর কঠোর শাস্তিও আরোপ করে।

ভারতীয় উপজাতি (Tribes in India)

ভারতীয় উপজাতি নিয়ে Ghurye যে সব কাজগুলি করেছেন সেগুলি সুনির্দিষ্ট আঙ্গিকে ছিল। তিনি তাঁর বইতে ভারতীয় উপজাতির ঐতিহাসিক, প্রশাসনিক ও সামাজিক বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি মহারাষ্ট্রের কোলিদের মতো নির্দিষ্ট উপজাতির উপরও কাজ করেছেন। Ghurye তাঁর লেখা প্রকাশ করেন এমন একটা সময়ে যখন অধিকাংশ নৃতাত্ত্বিক ও প্রশাসনিক ও সামাজিক বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি মহারাষ্ট্রের কোলিদের মতো নির্দিষ্ট উপজাতির উপরও কাজ করেছেন। Ghurye তাঁর লেখা প্রকাশ করেন এমন একটা সময়ে যখন অধিকাংশ নৃতাত্ত্বিক ও প্রশাসকদের অমিত ছিল, উপজাতিদের আলাদা পরিয়ে দিয়ে তাদের রক্ষা করা। অন্যদিকে Ghurye মনে করতেন যে, হিন্দুদের সাথে দীর্ঘ যোগাযোগের ফলে প্রায় সমস্ত উপজাতিদের হিন্দুকরণ হয়েছে। তাই উপজাতিদের পৃথক পরিচয় করা বৃথা। তারা এখন অনগ্রসর বর্ণের হিন্দু ছাড়া আর কিছুই নয়। তাদের পিছিয়ে পড়ার কারণ হচ্ছে, তাদের সাথে হিন্দু সমাজের সম্পূর্ণ একীকরণ হয়নি। দক্ষিণ ও মধ্য ভারতে যেসব আদিবাসীরা থাকেন যেমন, সাওতাল, ভীল, গন্দ প্রভৃতি, তারা এর উদাহরণ। (Ghurye 1963)

G. S. Ghurye এবং Verrier Elwin এর মধ্যে এই নিয়ে তীব্র বির্তক আছে। Elwin তাঁর বিখ্যাত বই 'Loss of Nerve' এ বলেছেন যে, উপজাতিদের ভালোর জন্য তাদেরকে বিচ্ছিন্নভাবে তাদের মত বসবাস করতে দেওয়া উচিত, সেই জায়গায় Ghurye বলেছেন। আদিবাসীদের হিন্দুবর্ণে আত্তীকরণ করা উচিত।

সুতরাং, Ghurye মনে করতেন, আদিবাসীদের হিন্দু সমাজে একীভূত হবার প্রক্রিয়া অনেক আগেই সম্পন্ন হয়েছে, এবং এর ফলস্বরূপ উপজাতিদের 'অনগ্রসর হিন্দু' হিসাবে সহজেই গণ্য করা যেতে পারে। আদিবাসীদের হিন্দু সমাজের মূল্যবোধও রীতিনীতির সাথে আত্তীকরণ, উন্নয়ণ প্রক্রিয়ার একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ।

ভারতের উপজাতিরা হিন্দু সমাজের জীবনধারা ও রীতিনীতিকে আয়ত্ত হিন্দু সমাজের এক অভিন্ন অংশ হিসাবে বর্তমান সমাজে বিবেচিত হচ্ছে। হিন্দু সমাজের প্রভাবে তারা মদ্য পান ছেড়ে দিয়ে, শিক্ষা লাভ করে। তাদের কৃষির উন্নতি ঘটিয়েছে। তাদের জীবনযাত্রা ও জীবনপ্রণালীর উন্নতি ঘটাচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, যেমন— হিন্দু সেচ্ছাসেবী সংগঠন যেমন— রামকৃষ্ণ মিশন ও আর্য সমাজ, উপজাতিদের উন্নয়নে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করছে। Ghurye তার পরবর্তী কাজের মধ্যে, বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী সাম্প্রদায়িক কাজকর্মের প্রবণতা লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন, এগুলি না আটকে রাঘলে দেশের ঐক্য ও ঐতিহ্য বিনিষ্ট হবে। Ghurye তাঁর

কাজের মাধ্যমে মধ্য ভারতে অবস্থিত উপজাতিদের চিন্তাভাবনা, অনুশীলন ও অভ্যাস নিয়ে বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন। তাঁর লেখা থেকে কাটোঁরি, ভুইয়া, ওরাঁও, খণ্ড, গণ্ড, কোরকুম ইত্যাদি উপজাতিদের সম্বন্ধে বিশদে জানা যায়। এইসব উপজাতিরাও পরবর্তীকালে হিন্দু ধর্মকে গ্রহণ করেছেন ও তাকে আপন করে নিয়েছেন। অর্থনীতির এক বিশাল ভূমিকা আছে উপজাতিদের হিন্দুধর্ম গ্রহণ করার পিছনে। শুধুতাই নয়, তারা আদিবাসী কারু শিল্প, হস্ত শিল্পের বাইরে এসে বৃহত্তর সমাজের পেশার সাথে নিজেদের একাত্ম করেছে, সমাজের চাহিদা অনুসারে। এবং নিজেদের উন্নয়ন ঘটিয়েছে।

গ্রামীণ নগরায়ণ (Rural Urbanisation)

Ghurye তাঁর সমস্ত জীবন দিয়ে ছিলেন গ্রামীণ নগরায়ণকে সুরক্ষিত করতে। প্রকৃতির সবুজের সাথে একযোগে শহরে সুযোগ-সুবিধা। তাই তিনি ভারতের গ্রামীণ নগরায়ণ প্রক্রিয়ার সমালোচনা করেছেন। তিনি দেখেছিলেন ভারতে নগরায়ণের নামে ঘটেছে শুধু শিল্পের বৃদ্ধি ও বিকাশ।

ভারতে নগরায়ণ প্রক্রিয়া, অনন্ত সাম্প্রতিক বছর পর্যন্ত, শুরু হয়েছিল গ্রামীণ এলাকা থেকে। শহরের বৃদ্ধির চিত্র তুলে ধরার জন্য তিনি সংস্কৃত গ্রন্থ ও নথিপত্র খুঁজে বের করেন। কৃষির উন্নয়নের ফলে উদ্ধৃত্ত খাদ্যশস্যের পরিমাণও বেড়েছে, তাই তার জন্য বাজারের প্রয়োজন।

ফলে, অনেক গ্রামীণ অঞ্চলে, গ্রামের একটি অংশ বাজারের কাজ করে। ফলে জনপদ গড়ে ওঠে যার ফলে প্রশাসানিক, বিচার বিভাগীয় ও অন্যান্য বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। অতীতে প্রতিষ্ঠানগুলি নগর কেন্দ্রিক ছিল। নগরকেন্দ্রগুলি সামন্ততান্ত্রিক পৃষ্ঠপোষকতার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। যেখানে সিল্কের কাপড়, গহনা, ধাতব নির্দশন, অস্ত্র ইত্যাদির আমদানি রপ্তানির হত। এর ফলে বহু শহরের বিকাশ ঘটে যেমন— বেনারস, কাঞ্চিপুরম, জয়পুর এবং মোরাদাবাদ ইত্যাদি। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, আদিবাসীদের জন্য, Ghurye গ্রামীণ নগরাবাদের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন। ঔপনিবেশিক সময়ে, মেট্রোপলিটন শহরগুলি গড়ে উঠেছিল যার বৃদ্ধি ও উৎপত্তি পাল্টে দিয়েছে ভারতীয় জীবন। কৃষিজ সামগ্রী ও হস্তশিল্প বিক্রির কেন্দ্র হিসাবে শহরগুলি আর ব্যবহার হত না। কাঁচামাল উৎপাদনে ও বিক্রি : দুটিরই ক্ষেত্র হিসাবে গ্রামীণ বাজারে পরিণত হয় শিল্প পণ্য বিক্রির জন্য। এইভাবে মেট্রোপলিটন অর্থনীতির আধিপত্য আবির্ভূত হয় গ্রামীণ অর্থনীতিতে। এইভাবে নগরায়ণ গ্রামীণ অর্থনীতিতে আস্তে আস্তে প্রবেশ করে। সেই শহর বা মহানগরকে ঘিরে যেসব গ্রামীণ অঞ্চলগুলি ছিল, তাদের সংস্কৃতিও প্রভাবিত হয় এই নগরায়ণের ফলে।

Ghurya বলেছেন, উচ্চশিক্ষা, গবেষণা বিচার ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, ছাপা ও বিনোদেন জগত সাংস্কৃতিক উৎস্যের কাজ করে, যার ফলে শেষ পর্যন্ত সাংস্কৃতিক বৃদ্ধি হয়। শহরের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলি সাংস্কৃতিকভাবে সংহত ভূমিকা পালন করে ও যুগের প্রধান নীতিগুলির বিকরণ কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে। কোন শহর নয়, কিন্তু বৃহৎ শহর বা মহানগরের মানুষের জীবনের সাথে জৈব সংযোগ আছে, তারা এই কাজটি ভালোভাবে করতে পারবে।

Ghurye এর মতে, একজন নগর পরিকল্পনাবিদ্‌কে অবশ্যই নিম্নলিখিত সমস্যাগুলির মোকাবিলা করতে হবে—

(i) পর্যাপ্ত পানীয় জলের সরবরাহ

(ii) মানুষের ভিড়

(iii) যানজট

(iv) যানবাহন নিয়ন্ত্রণ

(v) মুম্বাই শহরের মত রেল পরিবহনের অপর্যাপ্ততা

(vi) গাছের ক্ষয়

(vii) শব্দ দূষণ

(viii) নির্বিচারে গাছ কাটা

(ix) পথচারীদের দুর্দশা

সংস্কৃতি ও সভ্যতা :

সংস্কৃতির বৃদ্ধি ও রক্ষার ধরণ সম্পর্কে দুটি পরস্পর বিরোধী মতামত আছে। একটি তত্ত্বানুসারে, যেকোন সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি একই রকম থাকে ও সেটা থেকেই বৃদ্ধি পায় এবং একই ঘটনা ও সংস্কৃতি অন্যত্রও পরিলক্ষিত হয়। অন্য দল বিশ্বাস করে সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্বের কোন প্রান্তে একটি একক উদ্ভাবন বা আবিষ্কার শুধুমাত্র সেই জায়গায় কেন্দ্রীভূত না থেকে শেষ পর্যন্ত সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। স্যার G. e. Smith এই ক্ষেত্রে 'Diffusion Theory' এর কথা বলেছেন।

তিনি তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ "The Disposal of Human Placenta" যেটা প্রকাশিত হয়েছিল। 1937 সালে তাতে Ghurye বলেছেন তিনি বিভিন্ন জায়গায় শিশু জন্মের পর পরীক্ষা করেছিলেন কখন তাদের প্রথম চুল কাঁটা, নখ কাটা ইত্যাদি করা হয়। এটা করার একটাই উদ্দেশ্য ছিল, বিভিন্ন জায়গায় পদ্ধতির মধ্যে একটি তুলনা টানা Diffusion of Culture নিয়ে।

সংস্কৃতির বিস্তার মূলত একটি নতাত্ত্বিক তত্ত্ব, যা সাংস্কৃতিক যোগাযোগের উপর নির্ভর করে ও মূলত প্রাথমিক মানুষের মধ্যে কাজ করে। Ghurye এর মতানুসারে, সংস্কৃতি মানবজাতির সমগ্র ঐতিহ্যের সাথে জড়িত একটি সামগ্রিকতা যা সমাজ ও তার উপাদানগুলির মধ্যে বির্বতন ঘটায়। Ghurye অদশ্য আগ্রহ ছিল সাংস্কৃতিক বির্বতনের গতিপথ ও ঐতিহ্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণের প্রতি যা মানবজাতি অতীতকাল থেকে অস্বীকার করে আসছে।

সংস্কৃতি ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কিত। এটি ব্যক্তির অর্জনগত বিষয় ও সৃজনশীলতা। Ghurye এর

মানুষের শক্তির প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তারা তাদের সেরটা দিয়ে পুরনো সংস্কৃতিকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করে ও নতুন সংস্কৃতি নিজেস্ব চেতনা থেকে তৈরি করার সময়ও পুরোনকে প্রাধান্য দেয়। তিনি বেশি চিন্তিত ছিলেন হিন্দু সভ্যতার বির্বতনের প্রক্রিয়া নিয়ে। যাকে সাধারণত 'জটিল সভ্যতা' বলে অভিহিত করা হয়।

Ghurye এটাও ভেবেছিলেন এত দীর্ঘ ঐতিহাসিক সংস্কৃতির গতিশীলতা বিশ্লেষণের জন্য সভ্যতা প্রসারণের চেয়ে সংযোজন প্রক্রিয়া বেশি প্রাসঙ্গিক। তিনি ভেবেছিলেন সমাজবিজ্ঞানী হিসাবে সব থেকে কঠিনতম কাজ হল ভারতীয় প্রেক্ষাপটে এই জটিল সংগ্রহের বিশ্লেষণ করা।

তাঁর মতে, ভারত একটি বহুজাতিগত ও সংস্কৃতির আবাসস্থল, Ghurye তাঁর জাতি সম্পর্কে বিশ্লেষণে লিখেছেন, কিভাবে ঐতিহাসিক কাল থেকে বর্ণপ্রথা ব্রাহ্মণদের দ্বারা বিকাশিত হয়েছিল ও কীভাবে এটি জনসংখ্যার অন্যান্য গোষ্ঠীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। হিন্দুকরণ প্রক্রিয়া এই বিশ্লেষণের পটভূমি তৈরি করে।

Ghurye এই ধারণা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন যে "Common heritage of modern civilization" এবং সভ্যতা হল একটি "collective endeavour of humanity"। সভ্যতার উত্থান ও পতন, যাই হোক না কেন সংস্কৃতির এক অবিচলিত বৃদ্ধি ঘটেছে। সভ্যতার যতই রূপান্তর হোক না কেন, কিছু মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির সভ্যতার ভিত্তিপ্রস্তর হিসাবে থেকে গেছে। এই মূল্যবোধগুলিকে Ghurye বলেছেন "foundations of culture" তিনি এই রকম পাঁচটি মূল্যবোধের বর্ণনা দিয়েছেন, সেগুলি হল—

1. ধর্মীয় চেতনা
2. বিবেক
3. ন্যায়বিচার
4. জ্ঞান ও মতামত প্রকাশের অবধি স্বাধীনতা
5. সহনশীলতা

Ghurye বলেছেন "civilisation is the sum total of social heritage projected on the social plane". এটিও সমাজের একটি বৈশিষ্ট্যও। তাদের সভ্যতা অর্জনের ভিত্তিতে বিভিন্ন সমাজকে আলাদা করা যায়—

(i) প্রথমমত, এখনও পর্যন্ত এমন কোন সমাজ নেই, যা সম্পূর্ণ সভ্য বা খুব উচ্চ সভ্য

(ii) দ্বিতীয়ত, Ghurye ক্রমাগত উন্নতির নিয়মের বিশ্বাস করতেন।

(iii) তৃতীয়ত, মূল্যবোধের সাথে সভ্যতার ধনাত্মক সহগতির সম্পর্ক বিদ্যমান, মানবিক সভ্যতায় সভ্যতায় সংস্কৃতির মূল্যবোধ বেশি সংখ্যা মানুষের মধ্যে বিস্তৃত থাকে।

(iv) চতুর্থতা, প্রতিটি সভ্যতা সে উচ্চ হোক, নিম্ন হোক যাই হোক না কেন, কিছু স্বতন্ত্র গুণের অধিকারী।

সমাজবিজ্ঞানে ধর্ম (Socilogy of Religion)

ধর্ম মানুষের মৌলিক অধিকার। সভ্যতার প্রথম লগ্ন থেকে মানুষ বিশ্বাস করেছে, কোন অপার শক্তি আছে যা তাদের বোঝার বাইরে। এক্ষেত্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ওয়েবার (The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism, 1930) ও Durkheim (The Elementary Forms of Religions Life, 1951) মতো সমাজবিজ্ঞানীদের, Ghurye মনে করতেন, মানুষের সামগ্রিক ঐতিহ্যের কেন্দ্রে রয়েছে ধর্ম। তিনি পূর্ববর্তী অংশ সংস্কৃতির যে পাঁচটি ভিত্তির কথা উল্লেখ করে ছিলেন, তার মধ্যে 'ধর্ম চেতনা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এটি মানুষকে তৈরি করার সাথে সাথে তার ব্যবহার তৈরি করে সমাজে।

এইসমস্ত কাজকর্ম নির্দেশ করে Ghurye এর আগ্রহ ধর্ম নিয়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 'God and Men' বইতে Ghurye হিন্দু দেবদেবীর প্রকৃতি ও ভগবানের ধারণা নিয়ে বিশদে আলোচনা করেছেন। দেখিয়েছেন কিভাবে একযুগের আবহাওয়ার সাথে সেই যুগের দেব-দেবী সম্পর্কিত।

ধর্মীয় চেতনা বোঝাতে Ghurye তিনটি। প্রাচীনতম মানব সভ্যতার বিশ্লেষণ করেছেন। সভ্যতাগুলি হল মেসোপটেমীয়, মিশরীয় ও হিন্দু সভ্যতা। এই সভ্যতাগুলির বিভিন্ন পৌরানিক দিক, বিশ্বাস, অনুমান, সৃষ্টিতত্ত্ব, মৃত্যুর পরের জীবন, ঈশ্বর দর্শন, মন্দিরের স্থাপত্য ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তিনি সুগভীর আলোচনা করেছেন। Ghurye ভারতীয় সাধুদের মধ্য দিয়ে বংশ, বিকাশ ও সংগঠনকে বিবেচনা করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন, হিন্দুধর্মে অপস্বীত্ব ও হিন্দুধর্ম রক্ষণাবেক্ষণে রক্ষণাবেক্ষণে সন্ন্যাসীদের অগ্রণী ভূমিকা আছে।

ভারতীয় সাধু :

ভারতীয় সাধু (1953-1964) মহান বেদান্তিক দার্শনিক শঙ্করাচার্য ও অন্যান্য উল্লেখ্য ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সুগঠিত সমাজ বিজ্ঞান যা বিভিন্ন ধর্মীয় অংশ ও ধার্মিক কেন্দ্রগুলিকে তুলে ধরেছে। এই লেখার Ghurye ভারত ত্যাগের বৈপরীত্যমূলক প্রকৃতি তুলে ধরেছেন, একজন সাধু বা সন্ন্যাসীর সকল বর্ণ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা, নিয়ম ও সামাজিক নিয়মাবলী থেকে দূরে থাকার কথা। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে, শঙ্করাচার্যের সময় থেকেই হিন্দু সমাজে কম বেশি সাধুদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। এই সাধুরা একক ও একাকী সন্ন্যাসী আদর্শের অন্তর্গত ও যাদের স্বতন্ত্র ঐতিহ্য রয়েছে।

হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম ও মূল্যবোধ দ্বারাই সাধারণত ভারতীয় সমাজের সন্ন্যাসী সংগঠনগুলি তৈরি। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি মূলত বিশ্বামিত্রের মতো স্বতন্ত্র সন্ন্যাসীদের পতনকে নিশ্চিত করেছে। ভারতীয় সাধুরা ধর্মীয় বিবাদের মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কাজ করেছে, ধর্মীয় গ্রন্থ শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করেছে, এবং এমনকি বহিরাগত আক্রমণের হাত থেকে ধর্মকে রক্ষা করেছে।

জাতীয় ঐক্য ও সংহতি

সমসাময়িক ভারতীয় পরিস্থিতিতে Ghurye এর আগ্রহ ছিল। সমাজবিজ্ঞানী হিসাবে, তিনি খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন বিভিন্ন উপাদানের একাকীকরণ নিয়ে, ভারতীয় একতা নিয়ে এবং সাম্প্রতিক কালের বিভিন্ন

বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি নিয়ে, তাঁর এই উদ্বেগ তাঁর বিখ্যাত দুটি লেখার স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে Caste and Race in India (1932) এবং The Aborigines so called and their Future (1943)

Ghurye এর পরবর্তী লেখাগুলিতে তাঁর এই উদ্বেগের স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায় (প্রামণিক, 1994), তাঁর তিনটি বই আছে, যা এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক এবং একে 'ট্রায়োলজি' নামে আখ্যা দেওয়া হয়। এগুলি হল— 'Social Tensions in India" (1968), 'Whither India' (1974) এবং 'India Recreates Democracy' (1978) এই বইগুলিতে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধক মাথায় রেখে একটি কাঠামো তৈরি করেছিলেন তাতে ভারতে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্তরে অখণ্ডতা বজায় থাকে Ghurye বলেছেন এইসব গোষ্ঠীগুলি একটি সুনির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত জাতীয় সংহতি ও প্রীতি বজায় রাখতে সক্ষম হয়।

আধুনিক সমাজে, জাতীয় ঐক্যের পথে পাঁচটি বিপদ আছে যেগুলি হল — অত্যধিক পারস্পরিক ঐক্যের জন্য ভারতীয় ঐক্যের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তারা হল—

1) তফসিলি জাতি

2) তফসিলি উপজাতি

3) অনগ্রসর শ্রেণী

4) ধর্মীয় সংখ্যালঘু গোষ্ঠী - মুসলিম

5) ভাষাগত সংখ্যালঘু।

আমরাজানি Ghurye এর লেখার মূলকেন্দ্রবিন্দু ছিল সংস্কৃতি। তিনি ভেবেছিলেন, মূলত ব্রাহ্মণদের প্রচেষ্টার ফলে ভারতীয় সমাজে সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে উঠেছে। হিন্দু সমাজের সকল প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি ব্রাহ্মণদের দ্বারা হয়েছিল ও ধীরে ধীরে সেইগুলি অন্যান্য সম্প্রদায়ের দ্বারা গৃহীত হয়েছিল যদিও Ghurye এটাকে সংরক্ষণের প্রক্রিয়া বলে অভিহিত করেছিলেন, তবে এটি মূলত একমুখী প্রবাহ ছিল যা অ-ব্রাহ্মণদের মধ্যে ব্রাহ্মণবাদী ধারণা ও প্রতিষ্ঠানের অনুপ্রবেশ ঘটায়। এটা এমন একটি প্রেক্ষাপট, Ghurye যার সমস্যা ও সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করেছেন তদানীন্তন ভারতীয় সমাজের ঐক্যের পরিপ্রেক্ষিতে।

সাংস্কৃতিক ঐক্যের বিষয়ে Ghurye এর ধারণা নতুন ও ধর্মনিরপেক্ষ নয়। তিনি 'ভারতীয় সাংস্কৃতি'কে 'হিন্দু সংস্কৃতির' সমার্থক হিসাবে বিশ্লেষণ করেছেন তিনি ভারতের ঐক্য নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন ও দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ঐক্য নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন ও দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ঐক্য বজায় রাখার নিমিত্তে একটি চমৎকার আদর্শ প্রদান করেছিলেন। ভারতীয় বিভিন্ন গোষ্ঠীকে হিন্দুধর্মের ভেতরে নিয়ে এসেছিলেন।

লক্ষ লক্ষ মানুষ হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, তারা একত্রে একটি বিশাল রঙিগন কারুকার্য বিশিষ্ট অবয়ব তৈরি করেন ভারতীয় প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে। প্রথমে তিনি হিন্দুধর্মের আদর্শিক কাঠামো

বিশ্লেষণ করেন ও তার সাথে পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থের শিক্ষা যেমন— বেদ, উপনিষদ ইত্যাদি কীভাবে সাংস্কৃতিক ভিত্তি প্রদান করেছিল তা দেখানোর চেষ্টা করেন। Ghurye এর সাথে সাথে, পাণিণি, পতঞ্জলি, তুলসীদাস প্রভৃতি মহান হিন্দু চিন্তাবিদ্‌দের ভূমিকা নিয়েও আলোচনা করেন।

তিনি এইজন্য সাম্প্রতিককালের রাজনৈতিক নেতাদের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, তারা সেই রাস্তায় বেছে নিয়েছেন যে রাস্তা হিন্দু সংস্কৃতি একশবছর ব্যবহার করেনি, অনুসরণ করেনি, ভারতীয় জাতীয় সংহতি ও ঐক্য বজায় রাখার স্বার্থে। Ghurye এর মতে, সমাজ শুধু বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদের সমষ্টি নয়। সেই দলগত জীবন, যা ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করে। একজন ব্যক্তি সামাজিক গুণাবলী অর্জন করে ও গোষ্ঠীর মাধ্যমেই সেই সামাজিকীরণ ঘটে। এটাই হল যেকোন সমাজের সংহত কার্য। যখন সমাজের সব গোষ্ঠীগুলি দক্ষতার সাথে কার্য সম্পাদন করে। তখন সমাজে অখণ্ডতা, ঐক্যের সৃষ্টি হয়। ভারতীয় এই ঐক্যের প্রেক্ষাপটে আজ অন্যছবি দেখা যাচ্ছে। ঐক্যের পথে ভারতে সবথেকে বড় বাধা হচ্ছে, ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের গোষ্ঠী উদ্দীপনা। ভারতীয় সংহতির পথে বাঁধা হয়ে দাড়াচ্ছে ধর্ম ও ভাষাগত গোষ্ঠীগুলি।

জাতি গঠনের ক্ষেত্রে ভাষার ভূমিকাকে Ghurye অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। এমনকি, উপজাতির ক্ষেত্রে, উপজাতিদের জীবন ও সংস্কৃতি তখনই উন্নত হতে পারে যখন তারা সেই অঞ্চলের প্রভাবশালী ভাষাকে আয়ত্ত ও রপ্ত করতে পারে। Ghurye ব্যক্ত করেছেন যে, আঞ্চলিক ভাষার একটি প্রতীকী সম্বন্বিত মূল্য রয়েছে। আঞ্চলিক ভাষা স্থানীয় পর্যায়ে ভূখন্ডের ঐক্য নিশিত হবে ও ঐক্যের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

4.3.2 রাধাকমল মুখোপাধ্যায় (1889-1968)

রাধাকমল মুখোপাধ্যায় সামাজিক বাস্তুশাস্ত্র, আন্ত বিষয়ক গবেষণা ও সামাজিক কাঠামো ইত্যাদি বিষয়ক বিষয়ে পদ প্রদর্শক ছিলেন। আমরা প্রথমে তাঁর জীবনী সম্বন্ধে জানবো তারপর তাঁর কেন্দ্রীয় ধারণা নিয়ে আলোচনা করব।

জীবনী :

রাধাকমল মুখোপাধ্যায় 1889 সালে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, পশ্চিমবঙ্গের বহরমপুর শহরে। জীবনের প্রথম ষোল বছর তিনি কাটিয়েছিলেন এই শহরে। তাঁর বাবা ছিলেন একজন আইনজীবি ও তাঁর ইতিহাসের প্রতি ছিল গভীর আগ্রহ। রাধাকমল মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রথম বছর বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, তাঁর বাড়ি ইতিহাস, সাহিত্য, আইন ও সংস্কৃতের বইতে পূর্ণ ছিল। (সিংহ : 1956 : 3)। তিনি সে সাধারণ পরিবেশে বড় হয়ে উঠেছিলেন, তা ছিল পান্ডিত্যপূর্ণ। তাঁর বড় ভাই এমন সব বই পড়তেন, যা থেকে তিনি ছোট বলে তাঁকে দূরে রাখা হত। তাঁর বাবা মস্কেলদের সাথে দীর্ঘ আলোচনা করতেন সারাদিন ধরে এবং সন্ধ্যেতে তাঁর সঙ্গী ছিল বৌদ্ধিক ও ধার্মিক আলোচনা। গৃহের যেসব রমণী ছিলেন তারা ধর্ম, পূজা আচা ও ভক্তিগীতি নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন।

সুতরাং বোঝায় যায়, সে পরিবেশে তিনি বড় হয়ে উঠেছিলেন তা আদ্যপ্রাপ্ত জ্ঞানের পরিবেশ। মুখার্জির প্রথম দিকের স্মৃতি, যা তার মনে গভীর প্রভাব ফেলে গিয়েছিল তা হল মাদ্রাজ ও উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষে বিধ্বস্ত বিশাল জনগোষ্ঠীর দুঃখ ও দুর্দশা। বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে এই দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত দুঃভিক্ষের ছবি দেখে তিনি গভীর ভাবে প্রভাবিত হন। 1942-43 সালে দুভিক্ষের সময় তিনি কলকাতারছিলেন ও তা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। বিভিন্ন উৎসবে স্মৃতিও তাঁর মনে প্রাণবন্ত ছিল, যেমন— মহরমের মিছিল, দূর্গাপূজা তিনি তার জীবনকালে দেখেছিলেন বাঙলার স্বর্ণময় রেনেসার যুগ। 1905 সালে বাংলার প্রতিটি শহর রাজনৈতিক আবহে উত্তপ্ত ছিল। লর্ড কার্জনের বঙ্গ বিভাজননীতি বাংলার মানুষকে উত্তপ্ত ও বিদ্রোহী করে তুলেছিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক সমাবেশ মিছিল, দেশভক্তির গান, বিদেশী সামগ্রী বয়কট এবং স্বদেশী সামগ্রী গ্রহণ ইত্যাদি তাঁর জীবনে গণ আন্দোলনকে জাগিয়ে তুলেছিল। মুখার্জীর প্রাথমিক শিক্ষা হয় বহরমপুরে। এরপর তিনি কৃষণনাথ কলেজে পড়েন। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় বৃত্তি পেয়েছিলেন। তিনি এই কলেজে অনার্স নেন ইংরেজি ও ইতিহাসে, এখানে তিনি H.M হিসাবে পার্সিভাল, M. Ghosh, শ্রী অরবিন্দের ভাই ও ভাষাবিদ্ হরিনাথ দে এই সব গুনি মানুষদের সংস্পর্শে আসেন। তিনি এইসব পণ্ডিতদের খুবই প্রশংসা করতেন।

এখানে Comte, Herbert, Spencer, Hobbhouse ছাড়া আরোও অনেক ইউরোপীয় ও আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানীর লেখা অত্যন্ত বিশদে ও গভীরভাবে পড়েছিলেন। জীবনের এই সন্ধিক্ষণে, প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষা নিয়ে তাঁর আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন যা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁকে সমানভাবে টেনেছে। তখন দেশ রাজনৈতিক ও সামাজিক দুটি ক্ষেত্রেই গণঅভুত্থান ও সাংস্কৃতিক উত্থানের মধ্য দিয়ে চলেছে, যার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন রাধাকমল মুখার্জী। এই নবজাগরণ ধীরে ধীরে গণআন্দোলনের রূপ নেয়। এই প্রক্রিয়ায় সাহায্য করার জন্য মুখার্জী 1906 সালে মেছুয়াবাজার বস্তিতে একটি সান্ধ্য প্রাপ্ত বয়স্ক বিদ্যালয় চালু করেছিলেন। তিনি এই প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার জন্য সহজপাঠ লিখেছিলেন যা হাজার হাজার মুদ্রণ বিক্রি হয়েছিল। অচিরেই এই বিদ্যালয় একটি সামাজিক কেন্দ্রে পরিণত হয় যাতে স্থানীয় চিকিৎসকেরাও আগ্রহী হতে শুরু করেন। সামাজিক শিক্ষা আন্দোলনের পরিবেশ গড়ে ওঠে। এইসব চিকিৎসাকরা শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের চিকিৎসার জন্য কোন পারিশ্রমিক নিতেন না। (Singh : 1956) মুখার্জী তাঁর ইতিহাসের প্রতি আগ্রহের মূলে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষাকে মনে করতেন, কিন্তু "face to face contact with misery, squalor and degradation in slums of calcutta" সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতির প্রতি তাঁর আগ্রহ তৈরি করে। তিনি লিখেছেন, দেশ যখন কোন নির্দিষ্ট কাজের দায়িত্ব কাউকে দেয়, সেই কাজের দায়িত্ব সবথেকে ভালো সে পালন করতে পারে, সে একজন সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র। (Singh, 1956:5) মুখার্জীর সময়, কলাপাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজ বিজ্ঞানেরমধ্যে আবশ্যিক পাঠ্য হিসাবে অন্তগত ছিল— অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজতত্ত্ব। এই সময়েই তাঁর সাক্ষাৎ হয় বিনয়কুমার সরকারের সাথে। তাঁরা একসাথে থাকাও শুরু করেন। B. K. Sarkar তখন ছিলেন অধ্যাপক Bengal National College এর। এই কলেজ তদানীন্তন বিভিন্ন বিপ্লবীদের পাশে দাড়িয়েছে ও তাঁদের কাজে উৎসাহ জুগিয়াছে। তাঁরা হলেন— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অরবিন্দ ঘোষ ইত্যাদি। চরমপন্থী কংগ্রেসদের পাশেও থেকেছে যেমন— বিপিন চন্দ্র পাল। কিন্তু মুখার্জীর সেই মুহূর্তে আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু ছিল শিক্ষা, রাজনীতি নয়। তিনি ও তার

বন্ধুরা নিজেদের বলতেন "Ministers of the Poor", পোশাকও পরতেন পোশাক যেমন, কোট, প্যান্ট, জুতো ইত্যাদি বর্জন করেছিলেন। (Singh : 1956)

1910 সালে তিনি বহরমপুর, তাঁর পুরোনো কলেজে একজন অর্থনীতির শিক্ষক হিসাবে ফেরত গেলেন। তিনি এই সময়টাকে তাঁর জীবনের সবচেয়ে ব্যস্ততম সময় বলেছেন। এই সময় তিনি তাঁর জীবনের প্রথমবই অর্থনীতির উপর লেখেন "The Foundations of Indian Economics". তাঁর আগ্রহ সামাজিক বাস্তুতন্ত্র (Social Ecology) এবং ধর্মতত্ত্বের উপর এই সময়ই জন্মায়। তাঁর সেই সময়কার কলেজের 'Principal, Rev. E.M. Wheeler, বিজ্ঞানে খুব আগ্রহ ছিল, বিশেষ করে উদ্ভিদ বিদ্যায়। সেইজন্য শিক্ষকরা তাদের মধ্যে মুখার্জীও ছিলেন, অনেকটা সময় ব্যয় করতেন উদ্ভিদ ও পতঙ্গ সংগ্রহ করতে গিয়ে। শুধু সংগ্রহ করতেন না, সেইসব নিয়ে পড়াশুনাও করতেন। এইসময়ে তিনি বাস্তুতন্ত্রের প্রতি উৎসাহীহন ও মানবসম্প্রদায়ের সাথে বাস্তুতন্ত্রের যে সম্পর্ককেই বিষয়ে আগ্রহী হন। এই সময় তিনি বিখ্যাত বাঙলা মাসিক পত্রিকা 'উপসনার' সম্পাদক ছিলেন। এই সময় তিনি প্রতিটি প্রকাশিত সংখ্যায় লিখতেন ফলে বাঙলা সাহিত্যের সাথে নিবীড় যোগাযোগ তৈরি হয়েছিল। তিনি হাতের কাছে যা পেতেন তাই পড়তেন ও সাহিত্য নিয়ে তার উৎসুকতার কোন অন্ত ছিল না। যখন ভারতীয়দের উপর ইংরেজদের অত্যাচার চরম আকার ধারণ করেছিল। তখন তিনি একবারে 1915 সালে গ্রেপ্তার হন, শুধু মাত্র একদিনের জন্য, এবং সমস্ত তাঁর প্রাপ্তবয়স্ক বিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তাঁর উপর দোষারোপ ছিল যে তিনি প্রাপ্তবয়স্ক স্কুলের নামে সক্রিয় দেশ দ্রোহিতায় মদত দিচ্ছেন। ধন্যবাদ, তাঁর আইনজীবী ভাইকে, যার দৌলতে তিনি খুব তাড়াতাড়িই জেলে থেকে ছাড়া পেয়েছিলেন। তিনি পাঞ্জাবের লাহোড় কলেজ থেকে প্রস্তাব পেয়েছিলেন, সেখানে তিনি যান, তখন তাঁর মনের মধ্যে রাজনীতির বীজ সুপ্ত ছিল। কলকাতার ফিরে এসে স্যার আশুতোষ মুখার্জীর 1917 তে প্রতিষ্ঠিত 'Post Graduate Council of Aerts and Science" যোগদান করেন। সেই শিক্ষা প্রতিস্থানে তিনি প্রায় পাঁচ বছর শিক্ষাকতা করেছেন। তিনি সেখানে অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব ও রাজনৈতিক দর্শন পড়াতেন। 1921 সালে তিনি 'University of Lucknow' তে অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন, যবে থেকে বিশ্ববিদ্যালয় চালু হয়। সেখানে তিনি অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্বের বিভাগীয় প্রধান হিসাবে কাজ করতেন। (Singh : 1956) তিনি একটি সম্বন্বিত শিক্ষা পদ্ধতির আবিষ্কার করেছিলেন যার সাহায্যে তিনি অর্থনীতি সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ববিদ্যা পড়াতেন। মুখার্জীর মতে যদি আমরা তুলনামূলক পদ্ধতির মাধ্যমে সমাজবিজ্ঞান পড়ায়, তাহলে আমরা জাতি ও সংস্কৃতির বিজ্ঞানভিতিক আলোচনায় সক্ষম হব। তাঁর কর্মজীবনে তিনি তিনজন সমাজতত্ত্ববিদ্ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে প্রথম জন হলেন Professor Brajendra Nath Seal, দ্বিতীয় জন হলেন Professor Patrick Geddes এবং তৃতীয় জন হলেন তার সহকর্মী যার জীবদ্দশা খুব সংক্ষিত ছিল Narendra Nath Sen Gupta প্রথম দুইজন Prof. Seal এবং Prof. Geddes এর বিশাল অবদান ছিল সমাজতত্ত্বকে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পাঠ্যক্রম হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে। মুখার্জী তাঁর সব কাজে Prof. Seal এর পরামর্শ নিতেন, তিনি যে তুলনামূলক পদ্ধতির উপর দিয়েছিলেন পঠন পাঠনের ক্ষেত্রে তা মূলত Prof. Seal এর প্রভাবে, Patrick Geddes যেখানে মুখার্জীর ধর্ম, বাস্তুতন্ত্র ও লোকসংখ্যা নিয়ে কাজগুলিকে প্রভাবিত করেছিল, সেখানে Narendra Nath Sen Gupta

তাকে উৎসাহিত করেছিলেন সামাজিক মনবিদ্যার প্রতি। ভারতীয় চিন্তাবিদ্দের পাশাপাশি ও পশ্চিমী চিন্তা বিদ্রা তাঁর কাজকে প্রভাবিত করেছিল। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সমাজতত্ত্ববিদ্রা হলেন করেছিলেন সামাজিক মনবিদ্যার প্রতি। ভারতীয় চিন্তাবিদ্দের পাশাপাশি ও পশ্চিমী চিন্তাবিদ্রা তাঁর কাজকে প্রভাবিত করেছিল। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সমাজতত্ত্ববিদ্রা হলেন — Edward Allsworth, Robert Ezra Park of Chicago, Mckenzie এবং P. Sorokin বেশির ভাগ আমেরিকান সমাজতত্ত্ববিদ্দের উৎসাহ ছিল ধর্মতত্ত্ব, শহরে বিশৃঙ্খলা, বাস্তুতন্ত্র, সমাজের পরিবর্তন এবং এই ধরনের অনকে কিছু। বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ্দের সাথে তার বন্ধুত্ব তাঁরকাজের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল (Singh : 1956) মুখার্জী Lucknow University তে প্রায় তিরিশ বছর অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব পড়িয়েছিলেন। তিনি পরবর্তীতে J. K. Institute of Sociology and Human Relation of University তে উপাচার্য হয়েছিলেন।

মুখার্জী বিভিন্ন সমস্যার উপর তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ছাপ ছেড়ে গেছেন। তাঁর লেখনী প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য হল সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকের মধ্যে সম্বন্বয় সাধন এবং তিনি বিভিন্ন বিষয়ের পথ প্রদর্শক ছিলেন। তাঁর লেখনী পন্থার ঝলক তার ছাত্রদের লেখার মধ্যেও দেখা যায়। (Singh 1956 : 3-30)। তিনি 1968 সালে মারা যান কিন্তু তাঁরা চিন্তাভাবনা সমাজতত্ত্বের ছাত্র-ছাত্রীদের উপর বিশাল প্রভাব তৈরি করে। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিভিন্ন বিষয়গুলিকে আলাদা আলাদাভাবে পড়ানো হয় ও তাদের মধ্যে নূন্যতম যোগসূত্র ও বিদ্যমান থাকে না, মুখার্জী জোর দিয়েছিলেন বিষয়গুলির পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরি করার উপর। যেমন, সমাজতত্ত্ব, মনোবিদ্যা বাস্তুতন্ত্রে ইত্যাদি বিষয়ের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ তৈরির উপর। যেমন ধরা যাক, ভারতীয় অর্থনীতি সাধারণত ব্রিটিশ অর্থনীতির আদলে তৈরি, যেখানে দেশীয় অর্থনীতি, কুঠির শিল্প, হস্তশিল্পকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করা হয়েছিল। সাধারণ অর্থনীতিকে বাজারের সাথে মিলিয়ে দেখা হয়। পশ্চিমী অর্থনীতি সাধারণত শহরে বাজার ও শিল্পের সাথে সম্পর্কিত।

অর্থনীতি ও সামাজিক ব্যবহারের মধ্যে সম্পর্ক (Relationship between Economic & Social Behavior)

ভারতবর্ষের মত সমাজে অনেক অর্থনৈতিক লেনদেন / আদান প্রদান হয় উপজাতিদেব সাথে, যাদেরকে সাধারণত অর্থনীতিতে ধরা হয় না। মুখার্জী তাঁর কাজের মাধ্যমে চেষ্টা করেছিলেন এই ঐতিহ্যগত ও পরম্পরাগত সম্পর্কগুলিকে সমাজের সামনে তুলে ধরা। যে সমবায়প্রথা ও বর্ণপ্রথা ভারতে চলছে তাতে কোন প্রতিযোগিতার অস্তিত্ব নেই। অর্থনৈতিক যেসব আদান-প্রদান চলছে তার উৎপত্তি হিন্দুত্ত্বের আদর্শগত দিক থেকে, অন্য কথায় বলতে গেলে, হিন্দু ধর্মের প্রতিটি গোষ্ঠী পরস্পরের উপর নির্ভশীল, তাই গ্রামীণ অর্থনীতি বুঝতে গেলে, অর্থনীতির আদর্শ ও কাঠামো বুঝতে হবে সামাজিক নিয়মের উপর ভিত্তি করে। অর্থনীতির পথে ধর্মের বাঁধা বার বার এসেছে। দৈনন্দিন জীবনে আদর্শ মানুষের কর্মকাণ্ডের ধারা নির্বাচিত করে। ধরা যাক, একজন উচ্চবর্ণের হিন্দু যতই ক্ষুধার্ত হোক না কেন, তিনি কখনই শূকরের মাংসখাবেন না, সুতরাং, অর্থনীতি কখনই সামাজিক ব্যবহার না অনুধাবন করে বিশ্লেষণ করা সম্ভব না।

Social Ecology (সামাজিক বাস্তুতন্ত্র)

রাধাকমল মুখার্জীর মস্তিষ্ক প্রসূতফসল হল সামাজিক বাস্তুতন্ত্র। এই ধারণার উপর তাঁর অনেক কয়েকটি বই আছে। তাঁর মতে সামাজিক বাস্তুতন্ত্র বলতে বোঝায় যখন সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়ার দ্বারা পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়। কোন স্থানের পরিবেশের উপর ভৌগোলিক, পরিবেশগত জৈবিক প্রভাব দেখা যায়, বাস্তুশাস্ত্রের উপর সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাবও স্পষ্ট দেখা যায়। যেমন— অতীতে ভারতীয় বাস্তুতন্ত্রের অংশগুলি উন্মত্ত করা হয়েছিল মানুষের বসবাস ও চাষবাসের জন্য, রাজনৈতিক যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে।

বাস্তুতন্ত্র ও সমাজের বিকাশের মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট যোগসূত্র রয়েছে। পরিবেশগত অঞ্চলগুলিকে অবশ্যই একটি গতিশীল প্রক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা উচিত কারণ পরিবেশ ও জনগণ পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া দ্বারা একটি বসতি স্থাপন করে। পরিবেশগত ভারসাম্য বলতে কখনোই বোঝায় না, সেখানে যান্ত্রিক খোদাই এবং সেই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করা। এইরকম প্রচেষ্টা পরিবেশগত ভারসাম্যকে নষ্ট করে ও সামাজিক কাঠামোকে দুর্বল করে তোলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভারতে সেচ বাঁধ নির্মাণে, সংশ্লিষ্টস্থানের খুব কম মানুষই নতুন বসতিতে স্থানান্তরিত হয়। অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসন বা সঠিক পুনর্বাসনের দৃষ্টিভঙ্গি এইসব মানুষের জীবনে চরম বিপর্যয় ডেকে আনে, তাদের সামাজিক জীবনের বড়সড় ক্ষতি হয়। ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলে যজমানি প্রথা প্রচলিত আছে, পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উপর ভিত্তি করে এই প্রথা চলে। সাধারণত উত্তর ভারতে এই প্রথা দেখা যায়। যদি হঠাৎ করে এই প্রথার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের অন্য কোন নতুন জায়গায় সরানো হয়, তাহলে এই ধরনের প্রথা হঠাৎ শেষ হয়ে যায়। কেবলমাত্র, আগাম উপযুক্ত পরিকল্পনা করে এই ব্যাঘাত কাটিয়ে ওঠা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, সমবায়গুলি মানুষকে সাহায্য করে যদিও সেখানে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার পুরানো সামাজিক নিদর্শনগুলি অনুপস্থিত থাকে। তাই, শহরে শিল্প নির্ভর অর্থনীতিতে সুশৃঙ্খল ও নিয়মতান্ত্রিক পরিবর্তনের জন্য সুনির্দিষ্ট ও সুগঠিত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োজন, মুখোপাধ্যায়ের তাই দ্রুত শিল্পায়নের ফলে সৃষ্ট সামাজিক বিপর্যয় মোকাবিলার ক্ষেত্রে সামাজিক বাস্তুতন্ত্র ছাড়া অন্য কোন দ্বিতীয় পন্থা নেই। ভারতের সুদীর্ঘ ইতিহাসে, ভারতের রসদ ছিল মূল্যবোধের ভান্ডার। তাই নতুন ভারত পড়ার ক্ষেত্রে পরিকল্পনাকে শুধু তাৎক্ষণিক ও সমসাময়িক সমস্যাগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, আর্দশ ভিত্তিক, উন্নয়ণের উপর গুরুত্ব দিতে হবে, তবেই আক্ষরিক অর্থে ভারতের সামগ্রিক উন্নয়ণ সম্ভব হবে। সামাজিক বাস্তুশাস্ত্রের প্রতি আগ্রহের অংশ হিসাবে মুখার্জী আঞ্চলিক সমাজবিজ্ঞানের বিকাশ ঘটান। যদি আধুনিক ভারতের প্রতিটি অঞ্চল উন্ন হয়ে স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়, তাহলে সারা ভারতবর্ষ উন্নত হবে এবং ভারতীয় সমস্ত জাতি সামগ্রিকভাবে উপকৃত হবে। অন্যথায়, কিছু অঞ্চল অন্যান্য অঞ্চলের উপর কর্তৃত্ব করবে এবং উন্নয়ণের ধারা হবে একমুখী। ভারতবর্ষ একটি বৈচিত্র্যময় দেশ, প্রতিটি জাতির একটাস্বতন্ত্র ইতিহাস আছে, তাই উন্নয়ণ পরিকল্পনা করার আগে প্রাথমিক শর্ত হিসাবে। সেই গোষ্ঠী ইতিহাস ও পরিবেশের সাথে ভারসাম্য বজায় রেখে তা করতে হবে। সংক্ষেপে, তিনি প্রতীক হয়ে দাঁড়ালেন অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ও পরিবেশগত সুস্থতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য। ভারতবর্ষে অবস্থিত বিভিন্ন বর্ণ গোষ্ঠীর গোষ্ঠী ভিত্তিক কারুশিল্প উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত

হয়েছিল, যেমন- বয়ন শিল্প, খোদাই শিল্পি। রাধাকমল মুখার্জীর মতে যদি এই শিল্প সংস্কৃতিগুলি আধুনিক উন্নয়নের সাথে যথোপযুক্ত ভাবে অন্তভুক্ত করা যায়, তবে ভারতে সার্বিক উন্নতি হবে।

অন্যকথায় বলতে গেলে, ভারতীয় সমাজকে আধুনিককরণ করতে গিয়ে তার পুরানো ঐতিহ্যকে অবহেলা করা উচিত নয়। এগুলোই আগে সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল, অর্থনীতির কাঠামো এইসব কারুশিল্প দ্বারাই তৈরি হয়েছিল, প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে, তামিলনাড়ু ও অন্যান্য রাজ্যের সমবায়ে উত্তর ভারতের ঐতিহ্যবাহী কারুকার্য সংগঠিত হয়েছে। একইভাবে, যদি গ্রামোদ্যেগেও আধুনিক উৎপাদনের জন্য ঐতিহ্যগত দক্ষতা ব্যবহার করা হয়েছে।

মুখার্জী বনসংরক্ষণের পক্ষে আওয়াজ তুলেছিলেন। তিনি বিশদে লিখেছিলেন বনক্ষয়ের ফলে কি কি বিপর্যয় হতে পারে। গাছ কাটা বন্যার প্রবণতাকে বাড়িয়ে দেয় ও মাটির উর্বরতাকে হ্রাস করে। উপরের মাটি যা বন্যা বা অতিরিক্ত বৃষ্টির জন্য ভেসে যেতে পারে, তা কখনই নতুন করে তৈরি হয় না। তাই কাঠ ও বন পরিবেশগত সম্পদ। বনসংরক্ষণের জন্য মুখার্জী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের কথা বলেছিলেন। তার আবেদন ছিল বর্তমানে যেমন বিভিন্ন সংস্থা Chipko, Apko দ্বারা বনসংরক্ষণ হচ্ছে, সেই উপায়ে গাছ ধ্বংস বন্ধ করা। সেই সাথে তিনি একক চাষের ক্ষতিকারক দিকগুলিও তুলে ধরেছেন, যেমন অর্থকরী ফসলের চাষ উদাহরণ হিসাবে ধরা যায় তুলা বা আখের চাষ-চাষের আবর্তনকে রোধ করে। এই ধরনের পদ্ধতি বনকে ধ্বংস করা বা একক চাষ, শুধুমাত্র বাস্তুতন্ত্রকে ভঙ্গুর ও বিঘ্নিত করে তাই হয় মারাত্মক পরিবেশের জন্ম দেয়। প্রতিবছর ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত অংশ, বিশেষ করে উত্তর ভারত, হয় বন্যা বা খরা দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়। অবশ্যই উপকূলীয় অঞ্চলের ঘূর্ণিঝড় মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে, কিন্তু মানুষসৃষ্ট দুর্যোগ যেমন, বনের গাছ পালা ধ্বংস করা ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদের অবক্ষয়ের গতি কমানো বা প্রতিরোধ করা যেতে পারে।

মুখার্জী গ্রাম, শহর ও জাতিকে নিয়ে একটি একক বিস্তৃত উন্নয়ণমূলক প্রক্রিয়ায় একীভূত করার পক্ষে কথা বলেন। গ্রামের উপর ভিত্তি করে, গ্রামকে অবক্ষয় করে নগরোন্নয়নের পক্ষে তিনি কোনদিনই ছিলেন না। কৃষিকে বহুমুখী করতে হবে ও শিল্পকে বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। ভারসাম্যপূর্ণ্য ও সামঞ্জস্যতা রেখে বন্টন করতে চাইলে অর্থ ও তার উৎসের বন্টন শুধুমাত্র জনগণের মধ্যে না সেই অঞ্চলগুলির মধ্যেও ভাগ করতে হবে।

মুখার্জী বলেছিলেন শহরের সামাজিক সমস্যাগুলি সমাধানের উন্নত পদ্ধতি হল শ্রমিক শ্রেণির সমস্যাগুলির দূরীকরণের জন্য। গৃহীত প্রণালী ও ব্যবস্থা।

ভারতের শিল্পায়ণের ফলে গত কয়েক দশক ধরে, বিভিন্ন অঞ্চল ও ভাষার মানুষ একত্রিত হয়ে সফলভাবে কাজ করে চলেছে। কিন্তু মুম্বাই, কানপুর, কলকাতা ও চেন্নাই প্রভৃতি বস্তি এলাকায় যেসব শ্রমিকরা থাকে তারা খুব দুর্বিসহ পরিস্থিতিতে সামাজিক জীবন ধারণ করে। শিল্পায়ণের প্রাথমিক দিকে শহরের বস্তিগুলি সামাজিক অপরাধ যেমন— পতিতাবৃত্তি, জুয়া ও অন্যান্য অপরাধের মূল কেন্দ্র হয়ে

উঠেছিল। তাই বস্তির সামাজিক ও সাংস্কৃতিকজীবনে আমূল পরিবর্তন আনা জরুরি ছিল। সেই তাদের অর্থনৈতিক ও নীতিগত দিকের উন্নতি আনা অবশ্য জরুরি। তাই মুখার্জীর শ্রমিক শ্রেণির বিশ্লেষণ ভারতের বর্তমান শিল্প সংগঠনের জন্যও প্রাসঙ্গিক।

মূল্যবোধ তত্ত্ব নিয়ে পূর্বের আলোচনার ভিত্তিতে বলতে পারি যে, রাধাকমল মুখার্জীর আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু ছিল মানব সমাজে মূল্যবোধের প্রভাব। বিংশ শতব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে শুধু পশ্চিমী দেশগুলিতে শুধু নয় এমনকি ভারতবর্ষে মূল্যবোধের প্রভাবমুক্ত সমাজব্যবস্থা প্রভাব বিস্তার করেছে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে, মুখার্জী মনে করতেন। তথ্য ও মূল্যবোধের মধ্যে সাধারণত কোন বিচ্ছেদ বা পার্থক্য নেই। মানুষের সাথে মানুষের আদান প্রদানের ভিত্তিতে তথ্য, মূল্যবোধকে একে অপরের সাথে পার্থক্য নিরূপণ করতে ব্যবহার করা যায় না। এমনকি সাধারণ পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া যেমন— খাদ্য গ্রহণ, পোশাক পরা বা অভিবাদন জানানো মূল্যবোধ পরিচায়ক আচরণ বা বলা যেতে পারে স্বাভাবিকভাবে শর্তযুক্ত আচরণ। প্রতিটি গোষ্ঠীর নিজস্ব রীতিনীতি, সংস্কৃতি ও মূলবোধ থাকে যা গোষ্ঠীর আচরণ তৈরি করে। তাই পশ্চিমের ইতিবাচক মূল্যবোধ (Positivistic Tradition) থেকে তথ্যকে আলাদা করতে চেয়েছিলেন রাধাকমল মুখার্জী, বিশেষকরে ভারতের মতো সমাজের গবেষণায়।

রাধাকমল মুখার্জী মূল্যবোধের ক্ষেত্রে দুটি মৌলিক বিষয়ের উপর বিশেষ গুরত্ব আরোপ করেছেন। প্রথমত, মূল্যবোধ শুধুমাত্র ধর্ম ও নীতিতে সীমাবদ্ধ নয়। অর্থনীতি, রাজনীতি এবং আইন ও মূল্যবোধের জন্ম দেয়। অন্যকথায় বলতে গেলে, মানুষের চাহিদায় মূল্যবোধে রূপান্তরিত হয় ও সেটাই অন্তঃকরণের মাধ্যমে গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের ভাবনা চিন্তার উপর ক্রিয়া করে ও মূল্যবোধের সঞ্চার ঘটে। ভারত ও চীনের মত প্রাচীন সভ্যতাগুলি স্থিতিশীল ছিল। সুতরাং, মূলবোধগুলি স্তরবিন্যাসের মত উচ্চ ও নিম্নস্তরে সংগঠিত হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, মূল্যবোধ কখনই ব্যক্তিগত বা বিষয়গত আকঙ্খা চরিতার্থ করা বিষয় নয়। তারা বস্তুগতভাবে মানবজাতির সামাজিক আশা আকাঙ্খার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়। অন্য কথায় বলতে গেলে, সমাজের সর্বসাধারণের মূল্যবোধ হোক বা কোন উদ্দেশ্যগত মূল্যবোধ হোক। দুটিই অভিজ্ঞতামূলক পদ্ধতি দ্বারা পরিমাপযোগ্য সাধারণত বিশ্বের মহান সভ্যতাগুলো বস্তুবাদী মূল্যবোধ থেকে শুরু করে অন্তর্নিহিত বা আধ্যাত্মিক দুইরকম লক্ষ্য দ্বারাই প্রভাবিত হয়। সংক্ষেপে বলা যায়, মুখার্জীর মুল্যবোধের তত্ত্বে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে—

প্রথমত, মূল্যবোধ সুশৃঙ্খলভাবে পুরুষ ও মহিলাদের মৌলিক আবেগকে সন্তুষ্ট করে। স্বার্থপর আশা আকাঙ্খাগুলিকে দমনের মাধ্যমে সম্মিলিত স্বার্থগুলিকে প্রাধান্য দেয় যার ফলে জীবনযাত্রা পরিবর্তিত হয়, ফলে পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে সমাজের স্বার্থ সুরক্ষিত হয়।

দ্বিতীয়ত, মূল্যবোধগুলি, সাধারণত ব্যাপ্তিতে ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় মনোভাব ও প্রতিক্রিয়াকেই অন্তভুক্ত করে। এর অর্থ হল যে, মূল্যবোধগুলি প্রতীকীকরণের মাধ্যমে সকলের দ্বারা গৃহীত। উদাহরণস্বরূপ

বলা যায়, ভারতের জাতীয় পতাকা, সমস্ত ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও দেশের কাছে একটি সাধারণ প্রতীক যা একটা দেশ গঠন করেছে, দেশকে বহন করে চলেছে।

তৃতীয়ত, মানবসমাজে বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও কিছু সার্বজনীন মূল্যবোধ দেখা যায়। মানবজাতির প্রধান ধর্মবোধগুলি হল সার্বজনীন মূল্যবোধ ও নিয়মের ভাণ্ডার। সমাজকে গতিশীল রাখার অন্যতম পদ্ধতি হল উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মূল্যবোধগুলিকে সমসাময়িক সময়ের সাথে সময় ও প্রয়োজনের সাথে অভিযোজন করা।

ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা (Indian Culture & Civilization)

মুখার্জী তাঁর লেখায় ভারতীয় শিল্প, স্থাপত্য, ইতিহাস এবং সংস্কৃতির প্রতি আলোকপাত করেছেন। মুখার্জী (1964) বিশ্বাস করতেন এশিয়ার সংস্কৃতির মূল্য লক্ষ্য হল সামগ্রিক উন্নতি। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন "Art in Asia became the torch bearer of social and spiritual upheavals of millions.... Oriental art is most intensely charged with community feeling and is thus chiefly responsible for the historical continuity of Oriental Cultures." অপরপক্ষে পশ্চিমী শৈল্পিক প্রচেষ্টায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আধিপত্য ছিল এবং এটা মনে হত, শিল্পীর দ্বার তৈরি হয়ে শিল্পীর সাথে সাথেই তা শেষ হয়ে গেছে। এই পশ্চিমী শিল্প সামাজিক সংহতি বা আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য উপযুক্ত ছিল না। বিপরীতে ভারতীয় শিল্পে সামাজিক ও নৈতিকতা খচিত ছিল। রাধাকমল মুখার্জী লিখেছিলেন "The myriad temples, stapes and viharas of India bear witness to the link between art and ethics, religious and social values. Art in India is an enduring component of people's interaction with each-other which shows in concrete forms the active relationship between people's aspirations and their artistic creativity". ভারতীয় শিল্প সর্বদাই ধর্মের সাথে যুক্ত ছিল তাঁর ঐতিহাসিক গবেষণায়, মুখার্জী ভারতীয় ধর্মের অ-আক্রমনাত্মক প্রকৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ছিলেন, যেমন হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ ধর্ম ইত্যাদি। ভারতীয় ধর্মের উল্লেখযোগ্য গুণ ছিল কোন নির্দিষ্ট বিশ্বাস বা ধর্মাচারের পরিবর্তে চূড়ান্ত সত্যের উপর জোর দিত। ভারতীয় ধর্ম ও মূল্যবোধের প্রভাব বন্ধুত্ব ও শুভেচ্ছার মাধ্যমে অনেক দেশে ছড়িয়ে পড়ে। যেখানে যুদ্ধ করা বা যুদ্ধ জয় করার কোন প্রভাব ছিল না। অশোকের সময় থেকেই, শ্রীলঙ্কা, কম্বোডিয়া, তিব্বত ও ভারতের বাইরের অন্যান্য দেশে শান্তিপূর্ণ উপনিবেশ সংঘটিত হয়েছিল। ভারতীয় শিল্প ও ধর্মকে স্থানীয় সংস্কৃতিও সমৃদ্ধ করেছে এবং তা জন্ম দিয়েছে নতুন এক সংস্কৃতির। যেমন আজও, ইন্দোনেশিয়া, সুমাত্রা, ত্রিনিদাদের মতো আরোও বেশি কিছু দেশে হিন্দু ধর্মীয় মহাকাব্য রামায়ণের বিভিন্ন শৈলী অনুষ্ঠিত হয়। এইভাবে সামঞ্জস্যতা তৈরি হয়েছিল বিদেশী ও দেশীয় উপাদনগুলির মধ্যে শুধু তাই নয়, ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রগুলি জাতিগত বৈচিত্র্যের জন্য নমনীয়। তিনি সঠিকভাবেই ব্যাখা করে বলেছেন যে, এই ধর্মশাস্ত্রগুলি বৈচিত্র্যময় মানুষের সুশৃঙ্খল জীবনযাপনের জন্য মূল্যবোধ ও নিয়মগুলি একটি কাঠামো প্রদান করে যা প্রমাণ করে ভারতীয় শিল্প ও ধর্ম বিভিন্ন রূপ ও শৈলীর প্রতি সহনশীল।

মুখার্জীর ধারণা : সার্বজনীন সভ্যতা (Mukerjee's concept of Universal Civilisation)

মুখার্জী সমাজের সাধারণতত্ত্বকে একটি সার্বজনীন মূল্যবোধের প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন। তিনি 'সভ্যতা' শব্দটিকে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থে ব্যবহার করেছেন। তিনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন মানব সভ্যতা তিনটি আন্তঃসম্পর্কিত স্তরে বিবেচনা করা উচিত। সেইগুলি হল:

(i) **জৈবিক বিবর্তন : (Biological Evaluation)**

মানুষের জৈবিক বিবর্তন সভ্যতার উত্থান ও বিকাশকে সহজতর করেছে। তাদের সক্রিয় উপাদান হিসাবে পরিবেশকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা রয়েছে। প্রাণীরা শুধু পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে পারে, কিন্তু মানুষেরা বিভিন্ন উপায়ে তাদের মধ্যে অভিযোজন ঘটায়। মানুষ, জীবজগতেরএকটি প্রজাতি হিসাবে, প্রতিযোগিতা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়, সংঘর্ষ ও করে আবার সহযোগিতাও করে। (Symbiosis)

(ii) **মনস্তাত্ত্বিক সামাজিক মাত্রা (Psycho Social Dimension)**

প্রতিটি সমাজের একটি মনস্তাত্ত্বিক মাত্রা থাকে। সামাজিক মনোবিজ্ঞানে মানুষকে চিহ্নিত করা হয়, তার জাতি, জাতিগত বিষয় ও জাতিগত কাঠামোর ভিত্তিতে। সংকীর্ণ, জাতিকেন্দ্রিক মানুষগুলিকে, তার নিজের আত্ম অহংকারের বন্দী হিসাবে দেখা হয়। বিপরীত, মানব সমাজের সংকীর্ণ অনুভূতিগুলিকে অতিক্রম করার ও সার্বজনীনতাকে গ্রহণ করার ক্ষমতা মানুষের মধ্যে রয়েছে। যা, মহাবিশ্বের বৃহত্তর সমষ্টির মধ্যে নিজেকে চিহ্নিত করার ক্ষমতা প্রদান করে। এমনকি মহাবিশ্বে নিজেকে একজন জাতি বা সদস্য হিসাবে চিহ্নিত করার ক্ষমতা প্রদান করে। এই প্রক্রিয়ায়, সময় ও স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে আঞ্চলিক মূল্যবোধের থেকে বিশ্ব সংসারের মূল্যবোধকে বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মুখোপাধ্যায়ের মতে নৈতিকতার, আপেক্ষিকতা, মূল্যবোধ যা সমাজভেদে ভিন্ন হয় তা বর্তমান সমাজে সহায়ক নয়, তার স্থানে প্রয়োজন আছে নৈতিক সার্বজনীনতা যা মানবজাতির ঐক্যকে সুনিশ্চিত করে নতুন দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখতে গেলে, পুরুষ ও মহিলা দুজনেই মুক্ত সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে। সুতোর ঠাস বুনোনের এক একটি সুতো হল পুরুষ ও মহিলা উভয়েই। তারা আর বিভাজন বা আপেক্ষিকতা দ্বারা নির্দেশিত হয় না।

(iii) **আধ্যাত্মিক মাত্রা (Spiritual Dimension)**

মুখার্জীর দৃষ্টিতে, সভ্যতার একটি আধ্যাত্মিক মাত্রা রয়েছে। মানুষ ধীরে ধীরে অতীন্দ্রিয়ের উচ্চতা অর্জন করেছে। মানুষ এই অতীন্দ্রিয়ের ক্ষমতা অর্জন করেছে বহু জীবজনিত ও অস্তিত্বমূলক সমস্যা অতিক্রমের মাধ্যেমে। যেমন শারীরিক ও বস্তুগত সীমাবদ্ধতা। যেহেতু, সমাজবিজ্ঞান এই ধরনের আধ্যাত্মিকতাকে অস্বীকার করেছে, তাই তারা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ প্রদান করতে অক্ষম, কিন্তু শিল্প, পুরাণকথা ও ধর্ম আধ্যাত্মিকতাকে উৎসাহ প্রদান করে উপরের দিকে যাওয়ার

জন্য। আধ্যাত্মিকতার ইঙ্গিত Karl Mannheim এর বইতে পাওয়া যায়, যেখানে বেশির ভাগ সমাজবিজ্ঞানীরা এটাকে অস্বীকার করেছেন। Karl Mannheim একজন জার্মান সমাজবিজ্ঞানী যিনি সংস্কৃতির উপর বই লিখেছিলেন। তিনি যেখানে লিখেছেন, পশ্চিমী সমাজবিজ্ঞানীরা সাংস্কৃতিক মাত্রাকে অস্বীকার করেছেন (arts, myths, symbols etc)। এর ফলে সামাজিক বাস্তবতাকে একমুখী দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা হয়। মুখার্জীর মতে, ঐক্যতা, পূর্ণতা মানবজাতির আধ্যাত্মিকতাকে প্রকাশ করে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই তিনি ভারতীয় ও চৈনিক সভ্যতাকে প্রশংসা করেছেন, যারা তার সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে অক্ষত রেখেছে। তাদের শক্তি তাদের সার্বজনীন পৌরাণিক কাহিনী থেকে উদ্ভূত হয় এবং মূল্যবোধ আধ্যাতিমক অনুসন্ধানকে উৎসাহিত করে। মুখার্জী উল্লেখ করেন তার এই অনুসন্ধানটি UNO জাতি সংঘের মানবাধিকারের ঘোষণার একটি অন্যতম শর্ত। এই অধিকার মানবজাতির স্বাধীনতা ও মর্যাদাকে সুনিশ্চিত করে, তা তারা যে দেশেই থাকুক না কেন। আধ্যাত্মিকতা কোন পলায়নবাদী স্বপ্ন নয়। মানুষের সামগ্রিক অগ্রগতি সম্ভব ছিল যদি দেশগুলির মধ্যে সম্পদ ও ক্ষমতার স্পষ্ট বৈষম্য হ্রাস করা যেত। এতদিন দারিদ্র্য ও রাজনৈতিক নিপীড়ন অব্যাহত থাকায় মানবজাতির বির্বতন, বাস্তবসম্মত প্রস্তাব অনুয়ায়ী ছিল না। বিশ্বের দুর্দশা নিয়ে মানুষের সচেতনতা সার্বজনীনী মূল্যবোধ ও নিয়মের অনুসন্ধানকে উৎসাহিত করেছে।

রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ হল—

i) The Regional Balance of Man (1938)
ii) Indian Working Class (1940)
iii) The Social Structure of Values (1955)
iv) Philosophy of Social Sciences (1961)
v) Flowering of Indian Art (1964)

4.4 পশ্চিমী সমাজচিন্তাবিদ্ (Western Social Thinkers)

4.4.1 Emile Durkheim

এমিল ডুর্খাইমকে সমাজবিজ্ঞানের জনক বলা হয় কারণ তিনিই প্রথম দেখিয়েছিলেন দর্শন ও মনোবিদ্যা থেকে সমাজবিজ্ঞান সম্পূর্ণ আলাদা একটি শাখা। তাঁর জন্ম হয় 1858 সালে ফ্রান্সে। তিনি মনে করতেন, একটি বিষয়গত বিজ্ঞান হিসাবে অন্যান্য বিজ্ঞানগুলির আদলে সমাজতত্ত্ব গড়ে ওঠা সম্ভব এবং তা গড়ে ওঠা উচিত। সমাজতত্ত্ব গড়ে তোলার জন্য দুটি বিষয়ের দরকার আছে। প্রথমতঃ বিজ্ঞানগুলির আলোচ্য বিষয় সুনির্দিষ্ট হবে ও অন্যান্য বিজ্ঞানগুলির আলোচ্য বিষয় থেকে তার পার্থক্য থাকবে। তিনি মনে করতেন, সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি হল প্রকৃত অর্থে বস্তুসত্য, কারণ তারা ব্যক্তির অস্তিত্বের বাইরে বিরাজ

করে এবং যারা এই প্রতিষ্ঠানগুলির সদস্য তাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। সামাজিক ঘটনা, সামাজিক কাঠামো সাংস্কৃতিক নিয়ম, মূল্যবোধ মূলত সামাজিক বস্তুসত্য তা কখনোই নির্দিষ্ট ব্যক্তির সাথে সংযুক্ত হয় না বা তারা ব্যক্তি চেতনার অন্তর্ভূক্ত নয়, বরং সামাজিক ঘটনাবলীকে অভিজ্ঞতামূলক হিসাবে পৃথকভাবে অধ্যয়ণ করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, অন্যান্য বিজ্ঞানের বিষয়াদির মত, এই সমাজতত্ত্বের বিষয়ও পর্যবেক্ষণ ও ব্যাখ্যার উপযোগী হবে। সামাজিক ঘটনার ধারণার মধ্যে ডুর্খাইম বৈজ্ঞানিক সমাজতত্ত্বের উপযুক্ত বিষয়টিকে খুঁজে পান। তিনি মনে করতেন যে সামাজিক ঘটনাগুলি হল নিজেস্ব বা অনন্য ধরনের বাস্তবতা। সুতরাং, সামাজিক ঘটনাগুলিকে দুইভাবে অধ্যয়ন করা যেতে পারে এবং সামাজিক ঘটনাগুলিতে দুটি উপাদান বিদ্যমান material এবং immaterial। ডুর্খাইমের দ্বিতীয় সামাজিক তত্ত্ব/উপাদান অধ্যয়নে বেশি আগ্রহ ছিল, বিশেষকরে নৈতিকতা, যৌথ বিবেক, যৌথ প্রতিনিধিত্ব ও সামাজিক স্রোত ও ঘটনাবলী।

শ্রমবিভাগ (The Division of Labour)

'The Division of Labour in Society' নামক গ্রন্থটিতে ডুর্খাইম ব্যক্তির সাথে সমাজের সম্পর্ক, সামাজিক ঐক্যের রকমফের, বিভিন্ন ধরনের সমাজব্যবস্থা, সমাজের ঐক্য রক্ষায় ও মূল্যবোধ স্থাপনে আইনের ভূমিকা প্রভৃতি ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। 'শ্রমবিভাগ' হল বইটির কেন্দ্রীয় প্রসঙ্গ। তাঁর মতে, সামাজিক ঐক্যের ভিত্তি হল শ্রমবিভাগ, বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা স্থাপন করে শ্রমবিভাগ সমাজে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করেছে। ডুর্খাইমের মতে, সামাজিক ঐক্য দুই প্রকার— যান্ত্রিক ঐক্য (mechanical solidarity) ও জৈব ঐক্য (Organic Solidarity)। যান্ত্রিক ঐক্য হল সাদৃশ্যমূলক ঐক্য। আদিম সমাজে এই ধরনের ঐক্যের দেখা মেলে। জৈব ঐক্য বৈসাদৃশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ঐক্য। উন্নত শিল্পনির্ভর আধুনিক সমাজ যে সমাজকে ডুর্খাইম 'পৃথকীকৃত সমাজ' বলেছেন— তাতে এই ধরনের ঐক্য দেখা যায়। এই সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে মানসিক ও নৈতিক সাদৃশ্য কমে যায়। তাদের জীবনচর্চায় পার্থক্য দেখা যায়। ডুর্খাইম আইনের সামাজিক ভূমিকা ও বিভিন্ন সমাজে তার বিভিন্ন ধরণ সম্পর্কে আলোচন করেছেন। তাঁর মতে আইন দুই ধরনের দমনমূলক ও সংশোধনমূলক। যান্ত্রিক ঐক্যের উপর নির্ভরশীল আদিম সমাজে দমনমূলক আইনের প্রাধান্য ছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল শাস্তিদান, জৈব ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, আধুনিক সমাজে আইন মূলত সংশোধনমূলক।

আত্মহত্যা (Sucide)

ডুর্খাইম তাঁর পূর্বসূরীদের প্রদত্ত আত্মহত্যার মনস্তাত্ত্বিক, সৌজত্যবিদ্যাগত, জীবতাত্ত্বিকসমূহ, ভৌগোলিক তত্ত্বসমূহ খণ্ডন করেন। মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা অনুসারে, আত্মহত্যার কারণ ব্যক্তির অন্তর্নিহিত মানসিক, প্রবণতা এবং ব্যক্তির ব্যর্থতা হতাশা ও বিষাদবোধ। ডুর্খাইম, দেখান যে, ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে স্নায়বিক ব্যাধিগ্রস্ত বা পাগর্লের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি, কিন্তু এই সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে আত্মহত্যার সংখ্যা বিরল। বিপুল সংখ্যক তথ্য সংগ্রহ করে ডুর্খাইম আত্মহত্যার প্রবণতার একটি সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেন। তাঁর মতে আত্মহত্যা একটি সামাজি পরিবেশে গড়ে ওঠে। ডুর্খাইম চার ধরনের আত্মহত্যার কথা উল্লেখ করে তার সামাজিক ব্যাখা দিয়েছেন। আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যা (egoistic suicide) ঘটে গোষ্ঠীর সাথে ব্যক্তির

সায়ুজ্যের অভাবে। পরার্থে আত্মহত্যা (althuistic suicide) ঘটে গোষ্ঠীর সাথে ব্যক্তির অধিক মাত্রায় একাত্মতা সাধানের ফলে। নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যা (anomic suicide) ঘটে আর্থিক মন্দা দুর্যো ইত্যাদির ফলে যদি সামাজিক ভারসাম্যের পরিবর্তন হয়। চতুর্থ হল অদৃষ্টবাদী আত্মহত্যা (fatalistic suicide) যা জীবনের অতিরিক্ত ভারসাজ্যের ফলে ঘটে।

ধর্মীয় জীবনের প্রাথমিক রূপ (Elementary Forms of Religious Life)

এই কাজটিই ডুর্খাইমের সবথেকে জটিল কাজ ছিল যার মাধ্যমে তিনি ধর্মীয় সমাজতত্ত্ব এবং জ্ঞান দুটোর উপরই আলোকপাত করেছিলেন। ডুর্খাইমের মতে, ধর্মের সারমর্ম হল জগতের সমস্ত বিষয়বস্তুকে দুই ভাগে ভাগ করা — পবিত্র (Sacred) এবং অপবিত্র (Profane)। মানুষের নিত্যকার পার্থিব জীবন অপবিত্র বিষয়বস্তুতে ভার, পবিত্র বিষয়াদি নিয়ে ধর্মের এলাকা গড়ে ওঠে। এর মধ্যে পড়ে কিছু পবিত্র বস্তু, তৎসংক্রান্ত বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানাদি। অপবিত্র যাতে হঠাৎ পবিত্রের এলাকায় ঢুকে না পড়ে, সেজন্য পবিত্রকে আলাদা করে রাখা হয়। ডুর্খাইম টোটেম প্রথার উদাহরণ দেখিয়েছেন। টোটেম হল গোষ্ঠী প্রতীক, এই টোটেম গুলোকে পবিত্র হিসাবে ধরা হয়। ডুর্খাইমের মতে, বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতীক ও অনুষ্ঠানদির মাধ্যমে সমাজের সামগ্রিক সত্তা বলবান হয়ে ওঠে। এইসব প্রতীক ও অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে ব্যক্তি তার গোষ্ঠীর সাথে একাত্মতা অনুভব করে ও ধর্মে টিকে থাকে। ডুর্খাইমের মতে তিন ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান আছে— (১) নেতিবাচক সেগুলি হল আহার ও স্পর্শ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিধিনিষেধ, (২) নরনারীর মিলন সংক্রান্ত, সেগুলি উদ্দেশ্য হল জন্মবৃদ্ধি এবং (৩) মৃত্যু সংক্রান্ত। সামাজিক ঐক্যের সৃজন, বলবৃদ্ধি ও সংরক্ষণ ধর্মের মূল কাজ। অতএব, ডুর্খাইমের মতে, ঐতিহ্যপূর্ণ ধর্মের বিলোপে সমাজের তেমন কোন অসুবিধা হবে না। বরাং, মানুষকে স্পষ্টভাবে সমাজের উপর নির্ভরশীলতার যে প্রতিফলন অস্পষ্টভাবে ধর্মের মাধ্যমে হত, তা উপলব্ধি করতে হবে। শুধু সমাজের পবিত্র প্রতীকীকরণের প্রতিই আধুনিক মানুষ শ্রদ্ধা জানাবে, কোন দেবসত্তার প্রতি নয়।

ব্যক্তির সংস্কৃতি (Cult of Individuals)

ডুর্খাইম যদিও তাঁর বেশিরভাগ মনোযোগ সামাজিকতার উপর দিয়েছিলেন, তবে তিনি ব্যক্তিত্ববাদের ধারণাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেননি। প্রকৃতপক্ষে, তিনি বিশ্বাস করতেন আধুনিক সমাজে ব্যক্তি হয়ে উঠেছে পবিত্র এবং তিনি সমষ্টিগত বিবেকের আধুনিক রূপকে ব্যক্তির ধর্ম বলে অভিহিত করেছেন। ডুর্খাইমের মতে মানুষের মধ্যে দুটি সত্ত্বা বিরাজ করে — এক ব্যক্তির নিজেস্ব সত্ত্বা এবং অন্যটি ব্যক্তির সামাজিক সত্ত্বা। এই দুটি সত্ত্বা পারস্পরিক দ্বন্দ্বের মধ্যে থাকে, আবার ব্যক্তিগত উন্নতির সাথে সমষ্টিগতভাবে সমাজের ও উন্নতি হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আধুনিক সমাজে, বিভাজনে দ্বারা শ্রমের চিহ্নিতকরণ হয়েছে। ফলে ব্যক্তি বিশেষ সেই হিসাবে নিজেদেরকে আলাদা ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত করতে পারে। ডুর্খাইম যুক্তি দিয়েছিলেন ব্যক্তিত্বের ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিকই আছে। অহংবোধ, স্বার্থপরতা, স্বতন্ত্র স্বার্থের সাধনার সাথে নৈতিক ব্যক্তিত্ববাদ আত্মত্যাগ করার ক্ষমতার নির্দশন সমাজে ফেলে।

নৈতিক শিক্ষা ও সামাজিক সংস্কার (Moral Education and Social Reform)

ডুর্খাইম বিশ্বাস করতেন সমাজই নৈতিকতার উৎস, সুতরাং তিনি মনে করতেন নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে সমাজকে সংস্কার করা যেতে পারে। ডুর্খাইমের মতে নৈতিকতা সংস্কার করা যেতে পারে। ডুর্খাইমের মতে নৈতিকতা তিনিটি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত শৃঙ্খলা, অহংমূলক আবেগকে সীমাবদ্ধ করে; সংযোগ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে শেখায় এবং ব্যক্তিগত দায়িত্ব হল স্বায়ত্তশাসন, সমাজে কাজ করার জন্য তিনিটি নৈতিক হাতিয়ার দরকার, শিক্ষার মাধ্যমে শিশুদের এই তিনটি নৈতিক হাতিয়ারে বলীয়ান করা হয়। প্রাপ্তবয়স্কারাও এই নৈতিক হাতিয়ারগুলো লব্ধ করতে পারে— যেমন ধরা যাক NPTEL দ্বারা (MHRD দ্বারা অর্থায়িত একটি প্রকল্প) (Humanities and Social Sciences Introduction to Sociology Joint Initiatives of IIIs and IISc - Founded by MHRD, page-3 of 6 joining occupational associations) ডুর্খাইমের মতে, এই সংস্থাগুলি সদস্য অন্তভুক্তির মাধ্যমে শ্রম বিভাজন দ্বারা গঠিত সামাজিক অবস্থাকে দুর্বল করে তোলে ও সামাজিক এককীকরণে উদ্দেশ্য কাজ করে।

সমালোচনা (Criticism)

ডুর্খাইমকে তাঁর ইতিবাচক কার্যকরিতাবাদী মতবাদের জন্য প্রায়শই সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ডুর্খাইম ঐতিহাসিক তুলনামূলক পদ্ধতির সাহায্য ব্যাখা করেছিলেন যে, সমাজ জুড়ে অপরিবর্তনীয় সামাজিক আইন বিদ্যমান যা সমস্ত সামাজিক ঘটনাকে ব্যাখা করতে পারে। তিনি সামাজিক তথ্যের বস্তুনিষ্ঠ প্রকৃতির উপর জোর দেন। কিন্তু তিনি সমাজের বিষয় ভিত্তিক ব্যাখাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেন। তিনি তাঁর ব্যাখা কখনই ব্যক্তি সদ্যসের ভূমিকার উপর সেইভাবে আলোকপাত করেননি, ব্যক্তিসদ্যসের যে ক্ষমতা থাকে সামাজিক শক্তি উপেক্ষা করার তাকে তিনি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেছেন। উপরন্তু, ডুর্খাইম বিশ্বাস করতেন, মানুষ তার আবেগ দ্বারা পরিচালিত হয়। সমাজবিজ্ঞান ও নৈতিকতার সম্পর্ক নিয়ে তাঁর বিশ্লেষণ অনেক ক্ষেত্রেই রক্ষণশীল বলে পরিগণিত হয়েছে।

4.4.2 পশ্চিম সামাজিক চিন্তাবিদ হিসাবে কুলি (Cooley as Western Social Thinker)

সমাজতত্ত্ব ও সমাজমনস্তত্বে চার্লস হর্টন কুলে (1868-1929) র অবদান অসমান্য। প্রখ্যাত আইনজীবী থমাস এল কুলের পুত্র চার্লস হর্টন কুলে আমেরিকান সমাজতত্ত্ব বিকাশের একজন যুগান্তকারী ব্যক্তিত্ব হলেও প্রথমজীবনে তিনি ছিলেন কারিগরী বিদ্যা ও অর্থনীতির ছাত্র। মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি সমাজবিজ্ঞান পড়তে যান। 1905 সালে তিনি আমেরিকান সমাজবিজ্ঞান সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন ও 1918 সালে এর অষ্টম সভাপতি নির্বাচতি হন। তিনি সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় লুকিং-গ্লাস সম্পর্কে তার ধারণার জন্য। 1928 সালে থেকে কুলির স্বাস্থ্যের অবনতি হতে থাকে, 1929 সালে তাঁর ক্যান্সার ধরা পড়ে ও তার দুইমাস পরে তিনি মারা যান।

চার্লস হর্টনকুলে মিশিগানের অ্যানি আরবারে, ১৭ই আগস্ট 1864 সালে জন্মগ্রহণ করেন। মাতা ছিলেন ম্যারি এলিজাবেথ হর্টন ও বাবা ছিলেন থমাস. এম. কুলে। পিতা ছিলেন মিশিগানের সুপ্রিম

কোর্টের প্রখ্যাত আইনজীবী এবং মিশিগানের আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের ল'বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি 1859-1884 বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন ছিলেন। কুলির মা মেরির জনসাধারণ বিষয়ে আগ্রহ ছিল এবং তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহু প্রদেশ ঘুরে বেড়িয়ে ছিলেন স্বামীর সাথে Interstate Commerce Commission বিষয়ে। তাঁর বাবা প্রখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন যিনি তাঁর ছয় সন্তানের পড়াশুনার বিষয়ে প্রবল আগ্রহী ছিলেন। তবুও কুলির শৈশব কঠিন ছিল, যা তাঁর বাবার প্রতি তাঁর অনাসক্তবোধকে আরোও বাড়িয়ে দিয়েছে। তাঁর এই অনাসক্তবোধ তাঁর মধ্যে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি করেছিল যার জন্য শৈশবকালের ১৫ বছর তাঁর রোগ ব্যাধিতেই অতিক্রান্ত হয়েছে। এইজন্য তাঁকে কেউ কেউ মানসিক রোগীও মনে করতেন। ফলে তাঁর কথা বলার প্রতিবন্ধকতা দেখা যেতো, তাঁর ব্যবহারে অক্ষমতা বোধ পরিলক্ষিত হতো, সমবয়সীদের সাথে কথা বার্তায় যথেষ্ট আরষ্টবোধ ছিল। কুলি যেসব দিবাস্বপ্ন দেখতেন তাঁর প্রভাব তাঁর সমাজতাত্ত্বিক কাজের মধ্যে দেখা যায়। শিশু হিসাবে তিনি যে একাকী বোধ ও অসহয়তাবোধ অনুভব করতেন সেটাই তাকে পড়াশুনার দিকে ঠেলে দেয়।

যোল বছর বয়সে কুলি মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। কলেজের সময় থেকে কোষ্ঠকাঠিন্য তার শরীরকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছিল, এটা তাঁর পড়াশুনার ক্ষতিকরে। স্বাস্থ্যজনিত কারণে, সাত বছর পর বিমশিগান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তার স্নাতক উপধি লাভ করেন, 1887 সালে। পরের এক বছরে, mechanical engineering এর ডিগ্রি লাভ করেন। কুলি, 1890 সালে অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্বে তাঁর স্নাতকত্তোর ডিগ্রি লাভ করেন। 1892 পর্যন্ত UMich-এ তিনি অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব পড়েছিলেন। 1894 সালে তিনি Ph. D তে যোগ দেন আর তখনই সমাজতত্ত্বের উপর গভীর আগ্রহ তৈরি হয়েছিল। যেহেতু মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন সমাজতত্ত্বের উপর Ph. D করানো হত না, তাই তিনি তাঁর ডিগ্রি লাভ করেছিলেন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এর ফলে বিখ্যাত আমেরিকান সমাজতত্ত্ব ও অর্থনীতিবিদ Franklin Henry Guidding এপর সাথে পরিচয় ও কাজ করার সুযোগ ঘটে এবং তাঁর কাজে তাকে সাহায্য করেন। কাজটি ছিল "The Thory of Transportation in Economics".

যেহেতু দেশজুড়ে তাঁর বাবার খ্যাতি ছিল, তাই কুলি পরাজয়কে খুব ভয় করতেন। তাঁর জীবনে লক্ষ্যের অভাব ছিল, তাই তিনি হাতের কাছে যা পেয়েছেন বিজ্ঞান, অঙ্ক, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিদ্যা, সমাজতত্ত্ব সবই নিয়ে পড়াশুনা করেছেন। Herbert Spencer's এর কাজ নিয়ে পড়াশুনা করার পর তিনি সামাজিক সমস্যাগুলির দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর উপর Spencer এর সুগভীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ডারউইন তত্ত্বের প্রভাব ও তাঁর উপর দেখা যায়।

কুলি ঠিক করেছিলেন তিনি সমাজতত্ত্ব নিয়ে পড়াশুনা করবেন কারণ, এটা তাঁকে সামাজিক সমস্যা নিয়ে কাজ করতে সাহায্য করেছিল। মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের 1899 সালের সমাজতত্ত্বের প্রথম ক্লাসটা তিনিই নেন। তিনি Symbolic interactionism মতবাদ তৈরিতে John Dewey এর সাথে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

পারিবারিক জীবন (Family Life)

কুলি Elsie Jones কে 1890 তে বিয়ে করেন, যাঁর পিতা ছিলেন মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের Medicine বিভাগের প্রফেসর। Mrs. Cooley কুলির থেকে সম্পূর্ণ অন্য প্রকৃতির ছিলেন মানসিকতার দিক থেকে, তিনি সবার সাথে হইচই, মজা করতে মিশতে ভালোবাসতেন এর ফলে কুলির উপর সাংসারিক চাপ খুব একটা পড়েনি। তাদের তিন সন্তান ছিল— এক পুত্র ও দুই কন্যা। তাঁরা বিশ্বাবিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বাইরে থাকতেন। তাঁর তিন সন্তান তাকে গবেষণার কাজে সাহায্য করত। তিনি তাঁর তিন সন্তানের সমস্ত কার্যকলাপ লক্ষ্য করতেন এবং সেইসব ব্যবহারের পর্যালোচনা করতেন বয়স অনুসারে। শুধু তাই না, অন্যান্য ব্যক্তিদেরও লক্ষ্য করতেন। তবে সেই কাজ করার জন্য তিনি কখনোই তার পরিচিতি পরিমণ্ডলের বাইরে যাননি। কুলি উদ্ভিদবিদ্যা ও পাখি নিয়ে ও আগ্রহী ছিলেন, তিনি গবেষণা কাজের বাইরে এইসব নিয়ে থাকতেন।

তত্ত্ব (Theory) Cooley's methodology

কুলি প্রায়শই তাঁর অসন্তোষ প্রকাশ করতেন সামাজিক সদস্যদের মধ্যে বিভাজনের জন্য, তিনি বলতেন সামাজিক ক্ষেত্রে তা থাকা উচিত নয়। তিনি অভিজ্ঞতামূলক, পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি পছন্দ করতেন। তিনি the Insterstate Commerce Commision ও Census Bureau তে রাশিবিজ্ঞান ব্যবহারের যেমন প্রশংসা করেছেন, ঠিক তেমনি তিনি সমাজতত্ত্বের উপর কাজ করার জন্য Case Study এর উপর গুরুত্ব দিতেন। প্রায়শই তাঁর সন্তানদের বিষয় হিসাবে ব্যবহার করতেন। তিনি সমাজবিজ্ঞানীদের সহানুভূতিশীল পদ্ধতি ব্যবহার করার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। একজন ব্যক্তির সামাজিক চেতনা বোঝার জন্য আত্মদর্শন পদ্ধতির ব্যবহার করেছিলেন। কুলি ভেবেছিলেন, একমাত্র ব্যবহারিক পদ্ধতি হল বাস্তব পরিস্থিতিতে ঘনিষ্ঠদের ও নিবিড়ভাবে অধ্যয়ন করা, সেই ঘটনার সাথে জড়িত অন্যান্য ব্যক্তিদেরও। তারপর সেই পরিস্থিতি থেকে মন্দ জিনিস ও ঘটনাগুলিকে ভালোর সাথে প্রতিস্থাপন করা। তিনি বলেছেন, মানুষকে বোঝার একমাত্র উপায় হল কিভাবে ও কেন তার মানব প্রকৃতি এইভাবে কাজ করে এসেছে বা করছে। আর এখানেই তিনি তাঁর সমসাময়িকদের থেকে আলাদা যার শুধুমাত্র জোর দিতেন ঐতিহ্যগত ও বৈজ্ঞানিক কৌশল অবলম্বনের উপর।

পরিবহনতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞানের স্থানান্তর (Theory on Transportation and the Shift to Sociology)

কুলির অর্থনৈতিক তত্ত্বের উপর প্রথম গবেষণামূলক কাজ ছিল "The Theory of Transportation" (1874) তাঁর থিসিসে উনিশ শতকের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পের বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ নিয়ে আলোচনা করেন। এই কাজের মাধ্যমে তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন শহর ও নগরের পরিবহন ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য এবং পরিবহণ পথের সঙ্গমে অবস্থিত হওয়ার প্রবণতা, তথাকথিত 'beak in' এর পরের কাজে, কুলি তার প্রবণতার জায়গা থেকে সরে সমাজতত্ত্বে মনোনিবেশ করেছিলেন, তাঁর পরবর্তী কাজে ব্যক্তি সদস্য

ও সমাজের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের মিথষ্ক্রিয়া নিয়ে আলোকপাত করেন। "George Herbert এর বিখ্যাত বই 'Huma Nature and the Social order' (1902) বইতে যে ছবি পাওয়া যায়, Cooley এর গবেষণা তাকে ছাপিয়ে সমাজের স্বাভাবিক সামাজিক উত্থানকে প্রভাবিত করে। কুলি তাঁর "looking glass self" এর ধারণাটিকে ব্যাপকভাবে প্রসারিত করেছিলেন (I am, Who I think you think, that I am) তাঁর পরবর্তী বইতে "Social Organization" (1909) সেখানে তিনি সমাজ ও সামাজিক প্রক্রিয়াগুলির উপর আলোকপাত করেছেন।

সামাজিক প্রতিষ্ঠান (Social Organization)

'Social Organization' (1909) বই এর প্রথম 60 পৃষ্ঠা সিগমন্ড ফ্রায়েড এর তত্ত্বের সমাজতাত্ত্বিক প্রতিষেধক ছিল। কুলির মতে, প্রাথমিক গোষ্ঠী বা মুখ্য গোষ্ঠী (Primary Group) ব্যক্তির সাথে সমাজের সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে ব্যক্তিকে সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ করার ক্ষেত্রে মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রাথমিক গোষ্ঠী বলতে বোঝাতেন যে, গোষ্ঠী তিনি অন্তরঙ্গ, মুখোমুখি সম্পর্ক ও সহযোগিতার ভিত্তিতে এই গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। মনস্তত্বগতভাবে, এই অন্তরঙ্গতার ফলে সৃষ্টি হয় বিবিধ ব্যক্তিসত্তার মিশ্রণে গড়ে ওঠা এক বিভিন্ন ''আমি" র এক সামগ্রিকতা। এই সামগ্রিকতারই অপর নাম আমরা। তিনি বলেছিলেন ব্যক্তি জীবনের দুটি মাধ্যম আছে একটি বংশগত ও অন্যটি সমাজ থেকে উদ্ভূত, বংশগত জৈবিক ও পূর্বনিধারিত এবং সমাজই মানুষকে প্রকৃতিতে বড় করে তোলে, যা আমরা সমস্ত প্রাথমিক গোষ্ঠীতে প্রকাশ করা হয় যা আমরা সমস্ত সভ্যতার খুঁজে পেতে পারি। প্রাথমিক গোষ্ঠীর প্রভাব এত বেশি যে, জটিল পরিস্থিতিতে তারা তাদের বিশ্বাস ভাগ করে। সাধারণত যে সব প্রাথমিক গোষ্ঠী দেখা যায়, তার বাইরেও গিয়েও প্রাথমিক গোষ্ঠী তৈরি হয় অন্তরঙ্গতার ভিত্তিতে।

সামাজিক ব্যবস্থায় কুলির প্রশ্ন ছিল, সমাজ কী তৈরি করে? তিনি আলোকপাত করেছিলেন, ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে বৃহত্তর ঐক্যের সম্পর্ককে। তিনি সমাজ ও ব্যক্তিকে এক হিসাবে দেখতেন কারণ তারা একে অন্যের উপর নির্ভরশীল ছিল, একজন ছাড়া অন্যজনের অস্তিত্ব নেই। সমাজ যেমন ব্যক্তি বিশেষের আচরণকে প্রভাবিত করে, ঠিক সেই রকমই, ব্যক্তিবিশেষও সমাজকে প্রভাবিত করে। তিনি উপসংহারে আরোও বলেন যে, যে সমাজ যত শিল্পোন্নত হয়, তার বাসিন্দারা ও তত বেশি ব্যক্তিবাদী হয়। কুলি সামাজিক অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি ও বৈচিত্র্যের সমন্বয়ের প্রেক্ষিতে সমাজকে ধ্রুবক হিসাবে ধরেছেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণির পর্যালোচনা করেছেন এবং কিভাবে সামাজিক শ্রেণির উপর সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণ সম্ভব তার উপর আলোকপাত করেছেন। সামাজিক বিভিন্ন অবদান, অগ্রগতির ঘটনা মূল্যবোধের ক্ষমতার সমাজে বিভিন্ন শ্রেণি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

Cooley and Social Subjectivity :

কুলির 'Social Subjectivity' theory তিনটি প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমটি ছিল, সামাজিক ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে মানসিক প্রক্রিয়ার পর্যবেক্ষণ

করা, ব্যক্তি হিসাবে 'আমি' কে চেনা। যদিও, কুলি জানতেন এই বিষয়গত প্রক্রিয়াগুলি সামাজিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, সমাজের গতিশীলতাকে পরিক্ষণ করার প্রয়োজনীয়তা ছিল, যার ফলে সামাজিক বিশৃঙ্খলাগুলিকে চিহ্নিত করা যায় ও তাকে প্রাকৃতিক ঘটনা হিসাবে উল্লেখ করে, অভিযোজিত উদ্ভাবনের (adaptive innovation) সুযোগ সমাজকে দেওয়া যেতে পারে। অবশেষে জনসাধারণকে সচেতন করার দরকার আছে বর্তমান সমস্যাগুলি উপর 'অবহিত নৈতিক নিয়ন্ত্রণ' (informed moral control) প্রয়োগ করে কিভাবে তার মোকাবিলা করা যেতে পারে এবং ভবিষ্যতের দিক নির্দেশ করা যেতে সুষ্ঠ সমাজ গড়ে ওঠে।

এই উল্লেখিত দ্বিধাগুলির বিষয়ে, কুলি বলেছেন, "Society and indivdual denote not spearable phenomena but different aspects of the same thing, for a seperate individual is an abstraction unknown to experience, and so likewise is society when regarded as something apart individuals". ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক দ্বন্ধ যা 'মানসিক-সামাজিক' দ্বন্ধ তৈরি করে সেই দ্বন্ধের উত্তর দিতে তিনি "looking glass" তত্ত্বের বা 'আত্ম-দর্পণ' তত্ত্বের উদ্ভাবন করেছিলেন কোন ব্যক্তির আত্মসচেতনা আসলে তার সম্পর্কে অন্যান্য লোকের ধারণারই প্রতিফলন। এটিকেই পরে বলা হয় 'সহানুভূতিশীল আত্মদর্শন'। এই তত্ত্বটি শুধুমাত্র ব্যক্তির ক্ষেত্রেই নয়, বড়স্তরের অর্থনৈতিক সমস্যা, সামাজিক সমস্যার ক্ষেত্রেও প্রয়োজ্য, যা সময়ের সাথে সাথে বিকাশ লাভ করেছে।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে Cooley অন্যরকম দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখা করেছিলেন, বলেছিলেন "... even economic institutions could not be understood solely as a result of impersonal market forces." সমাজতাত্ত্বিক ও ঐতিহ্যগত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কুলি বলেছেন, কখনো কখনো ঐতিহ্যের বিলুপ্তি ইতিবাচক হতে পারে, যদি তা হয় "the sort of virtues as well as vices, that we find on the frontier. plain dealing, love of character and force, kindness, hope, hospitality and courage" তিনি বিশ্বাস করতেন সমাজতত্ত্ব ক্রমশ উন্নতি করে চলেছে, "growing efficiency of the intellectual process that would enlighten the larger public will."

আত্মদর্পণ (The "Looking Glan Self")

সম্ভবত, কুলির সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণতত্ত্ব এই আত্মদর্পণ, কুলির মতে, আত্মবিকাশ (development of self) ঘটে মূলত অপরের সাথে মেলামেশার মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের মাধ্যমে গড়ে ওঠে আত্ম (Self)। কোনও ব্যক্তির আত্মসচেতনা আসলে তার সম্পর্কে অন্যান্য লোকের ধারণারই প্রতিফলন। অতএব, 'তুমি/আপনি' অথবা 'সে/তিনি' ছাড়া 'আমি'র অস্তিত্বই অকল্পনীয়। আত্ম'র এই প্রতিফলক ভূমিকার কথা মাথায় রেখেই তিনি একে দর্পণ বা আয়নার সাথে তুলনা করেছেন।

— ব্যক্তির কাছে ব্যক্তির দর্পণ

— আত্মগঠনের মূলে প্রতিফলন ব্যক্তি-ব্যক্তির দর্পণ এক অপরের প্রতিফলন।

Each to each a looking glan reflects the other that do the pass. আত্মদর্পণের মাধ্যমে আত্মবিকাশের প্রক্রিয়াটি মূলত তিনটি পরস্পর আত্মসম্পর্কিত বিষয়ের উপর নির্ভর করে থাকে। প্রথমত, কল্পনায় অন্য ব্যক্তির কাছে আমাদের উপস্থিতি। দ্বিতীয়ত, এ সম্পর্কে সেই ব্যক্তির মতামত এবং তৃতীয়ত, উক্ত মতামত অনুযায়ী আমাদের আত্মনুভূতি (Self feeling) অর্থাৎ গর্বিত বা লজ্জিত হওয়া। আরোও সহজ ভাষায় বলা যেতে পারে, যখনই সমাজে একজন উদাহরণস্বরূপ, প্রথমা, অন্য একজনের ধরা যাক দ্বিতীয়ার, সম্মুখীন হয় তখন দ্বিতীয়ার চোখে মুখে প্রথমার উপস্থিতির প্রতিফলন ফুটে ওঠে। প্রথমা বুঝতে পারে দ্বিতীয়া তাকে কি নজরে দেখছে। যদি সুনজর সপ্রশংস দৃষ্টিতে দ্বিতীয়া তাকে দেখে তবে প্রথমা আনন্দিত হয় এবং সেই অনুযায়ী ভবিষত্যেও কে নিজের আচার ব্যবহার, সাজপোশাক ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিত করে অন্যথায় প্রথমা লজ্জিত হয় ও নিজেকে অন্যভাবে গড়ে তোলে যাতে দ্বিতীয়ার প্রশংসা পায়। এই প্রক্রিয়া একমুখী নয়, বরং দ্বিতীয়ার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এই চলমান প্রক্রিয়ার আত্মদর্পণের মধ্য দিয়ে গড়ে ও ঘটে আত্মবিকাশ।

1920 সালে "Human Nature and the Social order" বইতে কুলি লিখেছিলেন, ".... a somewhat definite imagination of how one's self that is, any idea the appropriates appears in a particular mind, and the kind of self feeling one has determined by the attitued towards this attributed to that oter mend. So in imagination, we perceive in another's mind some thought of our appearance, manners, aims, deeds characters, friends, and so on, and are variously affected by it".

সুতারাং, যে তিনটি স্তর 'the looking glass self' এ দেখা যায় সেগুলি হল—

- তোমার কল্পনায় তুমি অন্যব্যক্তির চোখে কি রকম
- তোমার কল্পনায় অন্যান্য ব্যক্তিরা কি ধরনের মতামত প্রকাশ করে তোমার সম্বন্ধে
- তুমি আনন্দিত হও, না গর্বিত না সুখ অনুভব কর, না কি দুঃখিত ও লজ্জিত হও।

সামাজিক প্রক্রিয়া (Social Process)

কুলি সামাজিক প্রক্রিয়ার উপর আলোকপাত করতে গিয়ে সামাজিক অযৌক্তিক, অস্থায়ী প্রকৃতির সামাজিক সংগঠন ও সামাজিক প্রতিযোগিতার তাৎপর্য বোঝাতে চেয়েছেন। সামাজিক প্রক্রিয়া হল একটি বিশাল পরিমণ্ডল যার উপর কুলির সমাজতত্ত্ব আলো ফেলেছে। কাজটি সমাজতাত্ত্বিকের চেয়ে বেশি দাশর্নিক ছিল। তিনি আধুনিক সমাজের অসুবিধাগুলিকে প্রাথমিক গোষ্ঠীর মূল্যবোধের সংঘর্ষ বলে অভিহিত করেছেন (প্রেম, উচ্চাকাঙ্খা, আনুগত্য) এবং প্রতিষ্ঠানিক মূল্যবোধের সাথে তুলনা করেছেন (নৈর্ব্যক্তিক মতাদর্শ যেমন অগ্রগতি বা Protestantism) সমাজ যেমন তার সামাজিক অসুবিধাগুলির সাথে মানিয়েনেবার চেষ্টা করে, ঠিক সেইরকম উপরোক্ত দুই ধরনের মূলবোধকে বাঁচিয়ে রাখাও চেষ্টা করে। কুলি সমাজে নায়ক ও নায়ক পূজার ধারণাও উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, বীর সামাজিক

নিয়মের অভ্যন্তরীণকরণের একজন সাহায্যকারী বা একজন সেবক কারণ তারা সামাজিক মূলবোধকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে কাজ করে এবং সাথে সাথে সমাজে প্রতিনিধিত্ব করে। সামাজিক প্রক্রিয়াটি ছিল কুলির শেষ প্রধান কাজ যা ডারউইনের নীতি দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

4.5 Theoretical Paradigms of Sociology

4.5.1 Symbolic Interactionist Perspective

প্রতীকী মিথষ্ক্রিয়াবাদ (Symbolic Interactionism) একটি সামাজিক তত্ত্ব বা ব্যক্তিদের মধ্যে যোগাযোগ, আলাপ-চারিতা ও সম্বন্বয়ের বিভিন্ন নির্দশনগুলির মাধ্যমে ব্যাখা করার চেষ্টা করে। তত্ত্ব রূপরেখা কিভাবে বিভিন্ন চিহ্নের মাধ্যমে একে অপরের সাথে এবং সমাজের অভ্যন্তরে যোগাযোগ করে, বোঝাপড়া করে সেইগুলি বিভিন্ন চিহ্নের মাধ্যমে যুক্ত করে। একজন শ্রোতা মৌখিক ও অমৌখিক উভয় প্রতিক্রিয়া কিভাবে গ্রহণ করবে ও সেই অনুযায়ী বক্তাকে তার প্রতিক্রিয়া জানাবে। তাই প্রতীকী মিথষ্ক্রিয়াবাদ, এখানে আমরা চেষ্টা করব—

- প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদের তত্ত্বের অর্থ ও ব্যাখা প্রদান করার চেষ্টা করব।
- তত্ত্বের বিভিন্ন ব্যাখা সম্পর্ককে পাঠককে অবগত করব।
- তত্ত্বের মৌখিক প্রাসঙ্গিকতা ও পদ্ধতি সম্বন্ধে পাঠকে অবগত করব।
- বিভিন্ন তত্ত্বের মূল ধারণা নিয়ে আলোচনা করব।

প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদে, দুটি মানুষের আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে সামাজিক ব্যবহার ও সামাজিক কাঠামো বোঝার চেষ্টা করা হয়। বিংশশতাব্দীতে Herbert Mead এবং Herbert Blumer এর মত চিন্তাবিদ্‌রা এই ধারণা / তত্ত্বের বিকাশ ঘটিয়ে ছিলেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, এই ধরনের প্রতীকী মিথষ্ক্রিয়া একজন ব্যক্তির বিকাশ ঘটাতে, উক্ত ব্যক্তি কিভাবে অন্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে ও কথোপকথন করে তা বুঝতে সাহায্য করে। কারণ এই ব্যাখাগুলিই উক্ত সমাজের কর্ম, ভাষা, স্থিতি বুঝতে আলোকপাত করে। এটাকে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে, বাস্তবসম্মত কর্মের সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা ও যুক্তিবাদী পদ্ধতির। প্রতীকী মিথষ্ক্রিয়া হল Charades খেলার মত, শুধুমাত্র এটি একটি পূর্ণাঙ্গ কথোপকথন। প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াদের উৎপত্তির ক্ষেত্রে যেমন দার্শনিক চিন্তাবাদের নিদর্শন পাওয়া যায়। ঠিক তেমনি এটি একটি মৌলিক একত্রীকরণের প্রস্তাব এই চিন্তা থেকেও উদ্ভূত হয়।

"প্রতীকী মিথষ্ক্রিয়া" শব্দটি একটি স্বতন্ত্র্য ও সুনির্দিষ্ট কথোপকথনকে বোঝায় যা নিদির্ষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে সংগঠিত হয়। প্রতীকী মিথষ্ক্রিয়া মানষ শুধুমাত্র প্রতিক্রিয়া দেখানোর পরিবর্তে একে অপরের কর্মের ব্যাখা ও সংজ্ঞায়িত করে, এই ধরনের কর্মের সাথে যুক্ত অর্থের ভিত্তিতে তৈরি হয়। এইভাবে, মানব মিথস্ক্রিয়াটি প্রতীকের ব্যবহার দ্বারা, ব্যাখ্যার মাধ্যমে বা নিশ্চিত করার মাধ্যমে মধ্যস্থতা করা হয় একে অপরের কর্মের অর্থ। এই মধ্যস্থতা প্রক্রিয়া মানব আচরণের উদ্দীপনা ও প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যাখা করা

হয়। ঐতিহাসিক পটভূমি উত্তর আমেরিকা থেকে প্রতীকী মিথষ্ক্রিয়াবাদ তার জমি খুঁজে পেয়েছে, যে সব দার্শনিকদের মধ্যে এর শিকড় পাওয়া যায়, তাঁরা হলেন — Peirce, Dewey, Cooley এবং Mead. সেইসাথে জার্মান সমাজতাত্ত্বিক ও অর্থনীতিবিদ্ Max Weber (1864-1920) এবং আমেরিকান দার্শনিক George H. Mead (1863-1931) উভয়ই, মানুষের আচরণের বিষয়গত অর্থ, সামাজিক প্রক্রিয়া ও বাস্তবাদের অর্থ খোজার চেষ্টা করেছেন।

প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদের প্রাথমিক প্রবক্তা ছিলেন জর্জ হারবার্ট মিড ও চার্লস হটর্ন কুলি। মিড বলেছিলেন কোন তত্ত্ব সঠিক কিনা তখনই বোঝা যাবে যখন সেই তত্ত্ব কোন সামাজিক সমস্যার সমাধান করতে পারবে। প্রতীকী মিথস্ক্রিয়া তত্ত্বের ক্ষেত্রে Mead এর বিশ্লেষণ এতটাই প্রভাবশীল ও কার্যকরী ছিল যে, অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানীরা তাকে প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদের একজন সত্যিকারের প্রতিষ্ঠাতা বলে বিবেচনা করেছিলেন। "Symbolic Interactionism" শব্দটি Blumer 1937 সালে তৈরি করেছিলেন। তিনি সমাজতাত্ত্বিক এই দৃষ্টিভঙ্গীকে 1950 সালের প্রথম ভাগে শিকাগোতে, ও পরবর্তী সময়ে ক্যালিফো নিয়াতে তার কাজের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, যখন বার্কলেতে ক্যালিফোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। যদিও Holton ও Cohen তর্ক করেছিলেন Blumer, Mead থেকে তাঁর তাত্ত্বিক ধারণা ধার করেছিলেন, কিন্তু Blumer ই পরবর্তীকালে নিদির্ষ্ট কিছু তত্ত্ব ও ধারণার সংযোজনে প্রতীকী মিথস্ক্রিয়ার তত্ত্বটির ভিত আরোও মজবুত করেছিলেন।

এছাড়া যে অন্য দুটি তত্ত্ব প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াকে প্রভাবিত করেছিল, তারা হল Yrjö Engeström এবং David Middleton এর তত্ত্ব। Engestron ও Middleton বিভিন্ন কাজে প্রতীকী মিথষ্ক্রিয়ারাদের উপযোগিতা ব্যাখা ও আলোচনা করেছিলেন "Variety of Work Selting including, courts of law, health care, computer software design, scientific laboratory, telephone sales, control, repair and maintenance of advance manufacturing system". অন্যান্য সমাজতত্ত্ববিদ্রা যাঁরা এই কৃতিত্বের দাবী করেছিলেন তারা হলেন Thomas, Park, James, Horton, Cooley, Znaniecki, Baldwin, Redfield and Wirth. যেখানে Functionalist Sociologist সামাজিক দৃঢ়তাকে সামাজিকীকরণে ভিত্তি হিসাবে ব্যাখা করেন, অন্যদিকে মিথস্ক্রিয়াবাদীরা মনে করেন, সামাজিকভাবে নির্মিত সম্পর্কগুলি অপরিবর্তনীয় অবস্থায় থাকে ও ওঠানামা করে যদিও সেই সম্পর্কগুলি নিয়ন্ত্রণকারী মৌলিক কাঠামোগুলিতে আপেক্ষিকভাবে স্থিতিশীলতা থাকে। মানুষের নিজের ভূমিকার প্রতি আগ্রহ আলোচ্য বাস্তবতা, প্রতীক ও সমাজের সামাজিক নির্মণের উপর চাপ দেয়। সংক্ষেপে প্রতীকী মিথস্ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য হল মানুষের দৃষ্টিকোণ মিথষ্ক্রিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে ও প্রতীককে কর্মের ভগ্নাংশ হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এটি প্রাথমিকভাবে দৈনন্দিন জীবনে কথোপকথনের ধরন নিয়ে কাজ করে ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে, পরিবর্তে সমাজের বৃহৎ গঠন কাঠামো, সামাজিক শক্তি, নিয়ম আইন এসবের উপর কম গুরুত্ব আরোপ করে। Joel M. Charon যিনি 'Symbolic Interactionism' এর লেখক, তিনি বলেন প্রতীকী মিথষ্ক্রিয়ার পাঁচটি তত্ত্ব আছে।

1. মানুষকে সামাজিক জীব হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। দৈনন্দিন জীবনে আমরা যা যা করি তাই হল প্রতীকী মিথস্ক্রিয়া। কোন ব্যক্তির চরিত্র বা গুণাবলী আলোচনা করার পরিবর্তে, মানুষের

সামাজিক ব্যবহারের উপর সমাজের কি প্রভাব আলোচনা করার পরিবর্তে, প্রতীকী মিথস্ক্রিয়া গুরুত্বদেয় দুই সামাজিক সদস্যের মধ্যে কথোপকথনের আদান প্রদানের উপর। কথোপকথোন হল মূল ভিত্তি এই তত্ত্বের। মানুষ তৈরি হয় পারস্পরিক আদান প্রদান, কথোপকথনের মাধ্যমে, আমরা কি করছি তা অনেকাংশে নির্ভর করে আমাদের জীবনের পূর্ব কথোপকথনের ভিত্তিতে এবং সাম্প্রতিককালের কথোপকথনের উপর। আমরা যা করি তার মূলে আছে প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদ। যদি আমরা কারণও খুঁজতে যায় তাহলেও প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদের উপর আলোকপাত করা উচিত।

2. মানুষকে চিন্তাশীল ব্যক্তি হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। মানুষ শুধু অন্যের সাথেই কথোপকথন করে না। নিজের সাথেও কথোপকথনে যুক্ত থাকে। আমাদের ধারণা, মূল্যবোধ, ব্যবহার ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ যতটা গুরুত্বপূর্ণ আমাদের চিন্তাশৈলী। আমাদের উপর কেউসহজেই কোন কিছু আরোপ করতে পারে না। কেউ সহজেই আমাদের প্রভাবিত করতে পারে না যারা আমাদের আশে পাশে আছে, আমরা শুধুই মাত্র সমাজের দ্বারা তৈরি নয়। আমরা শুধুই মাত্র সমাজের দ্বারা তৈরি নয়। আমরা চিত্তন শীল প্রাণী, আমরা শুধুমাত্র অন্যদের সাথে কথোপকথনে যুক্ত থাকি না, নিজের সাথেও কথোপকথনে যুক্ত থাকি। আমরা যদি কোন কিছুর কারণ বুঝতে চায় তাহলে মানুষের চিত্তন প্রণালীর উপর আলোকপাত করতে হবে।

3. মানুষ সরাসরি তাদের পরিবেশকে অনুভব করতে পারে না, পরিবর্তে সে পরিস্থিতিতে মানুষটি আছে তাকে সংজ্ঞায়িত করে। সকল অবস্থায় পরিবেশ বিদ্যমান থাকে, কিন্তু সেই পরিবেশ কেমন তাকে আমরাই সংজ্ঞায়িত করি। যে কোন জিনিসের সংজ্ঞা এলোমেলো ভাবে ঘটে না, পরিবর্তে এটি চলমান সামাজিক মিথস্ক্রিয়া ও চিন্তাভাবনার ফসল।

4. মানুষের চারপাশে যে সব ঘটনা ঘটছে, মানুষের প্রতিক্রিয়া বা কার্যকলাপ সেইসব ঘটনার প্রতিক্রিয়া মানুষের ব্যবহারের কারণ দর্শায়, সামাজিক মিথস্ক্রিয়া, বর্তমান চিন্তাপ্রণালী এবং বর্তমান কার্যের সংজ্ঞা। এটি আমাদের সমাজের সাথে মিথষ্ক্রিয়ার পরিমাণ নয় বরং এটি আমাদের নয় নিজের অতীত অভিজ্ঞতা এবং কর্মের কারণ। এটি পরিবর্তে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া, চিন্তাভাবনা, সংজ্ঞা যা বর্তমান সময় ও আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা দিয়ে আমাদের কর্মের মধ্যে প্রবেশ করে। প্রাথমিকভাবে কারণ হিসাবে এটাই আমরা বিবেচনা করি ও বর্তমান সংজ্ঞাতে প্রয়োগ করার চেষ্টা করি।

5. মানুষকে সক্রিয় সদস্য হিসাবে পরিগণিত করা হয় যে তার পরিবেশের সাথে সক্রিয় মিথস্ক্রিয়ায় অংশ নেয়। শর্ত আরোপ, প্রতিক্রিয়া, নিয়ন্ত্রিণ বন্দী, বা গঠনের মতো শব্দগুলি প্রতীকী শর্তবলী হিসাবে মিথাস্ক্রিয়ার মানুষের প্রতীকী মিথস্ক্রিয়া বর্ণনা করে ব্যবহার করা হয় না। সামাজিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যেতে পারে, মানুষ তাদের আশে পাশের পরিবেশে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে ও প্রত্যক্ষভাবে তার সাথে জড়িত থাকে।

4.5.2 কার্যকরী দৃষ্টিকোণ (Functionalist Perspective)

কার্যকরী দৃষ্টিকোণ সমাজকে একটি জটিল ব্যবস্থা হিসাবে বিবেচনা করছে, যার প্রতিটি উপাদান একত্রে কাজ করে যাতে সমাজের সামগ্রিক উন্নতি হয় ও স্থিতিশীলতা বজায় থাকে। এটি সমাজের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর বিষয়ের উপর আলোকপাত করে যা সামাজিক কাঠামো ও সামাজিক কার্যাবলী নিয়ে কাজ করে। কার্যপ্রণালী সাধারণত সমাজকে তার উপাদান গুলির কাজের পরিপ্রেক্ষিতে সম্বোধন করে, যেমন— নিয়ম, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, বর্ণ, ধর্ম, প্রতিষ্ঠান। হার্বার্ট স্পেন্সার এই অংশগুলিকে সমাজবিজ্ঞানে অঙ্গ হিসাবে উপস্থাপন করেছেন যা শরীরের সঠিক কার্যকারিতার জন্য একসাথে কাজ করে। উদাহরণ হিসাবে ধরা যায়, অপরাধ যা সাধারণত শারিরীক হিংসা, সম্পত্তির ক্ষতি, ভয় এসবের সাথে যুক্ত। ডুরখেইমের মতে, অপরাধও সমাজের একটি প্রয়োজনীয় অংশ কারণ এটি নৈতিক বন্ধন, সামাজিক সংহতি ও সচেতনতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। আবার সরকার শিশুদের বিনামূল্যে শিক্ষা প্রদান করে এবং যখন শিশুরা প্রাপ্তবয়স্ক হয়, তারা কর দেয় ও দেশকে উন্নতিতে সহায়তা করে। কার্যপ্রণালী ডুরখেইমের ধারণা থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করে। তিনি সমাজ কীভাবে তার স্থিতিশীলতা বজায় রাখবে ও সময়ের সাথে কিভাবে বাঁচবে সেই প্রশ্ন নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি দুটি শব্দ ব্যবহার করে সমাজের স্থিতিশীলতাকে ব্যাখ্যা করেছেন। যান্ত্রিক সংহতি ও জৈবিক সংহতি। আমি ঐতিহ্যবাহী সমাজ যান্ত্রিক সংহতি দ্বারা একত্রিত হয়েছিল। আদিম সমাজের সদস্যরা তুলনামূলকভাবে ছোট ও অভেদহীন গোষ্ঠীতে বসবাস করত, যেখানে তাদের মধ্যে দৃঢ় বন্ধন ছিল ও সবাই একই ধরনের কাজ প্রতিদিন করতেন যা দৈনন্দিন জীবনের মান ও প্রতীকের সমষ্টি ছিল। অপরদিকে, আধুনিক সমাজ জৈব সংহতির উপর নির্ভরশীল ছিল কারণ, শ্রমের বিস্তৃত বিভাজন, সদস্যদের সাথে যোগাটোগ ও তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি একে অপরের সাথে সরবরাহ করত।

1950 সালে রবার্ট মের্টন একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে বিশদভাবে ব্যাখা করেছিলেন উদ্ভাসিত (manifest) এবং latent (সুপ্ত) কার্যকারিতার মধ্যে পার্থক্য। উদ্ভাসিত কার্যকারিতা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীর সাথে সংযুক্ত। অপরপক্ষে সুপ্ত কার্যকারিতা অবৈধ কার্যাবলীর সাথে যুক্ত। অপরপক্ষে সুপ্ত কার্যকারিতা অবৈধ কার্যাবলীর সাথে যুক্ত। কার্যকারিতা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে বলতে হয় অপরাধ একটি সুপ্ত কার্যকারিতা যেটা আচরণ ও সামাজিক নিয়ম বজায় রাখার জন্য সীমানার কাজ করে।

4.5.3 দ্বন্দের দৃষ্টিকোণ (Conflict Perspective)

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ সমাজতাত্ত্বিক কাঠামো হল দ্বন্দ্বতত্ত্ব বা সংঘাত তত্ত্ব যা সমাজকে ব্যাখ্যা করে সীমিত সম্পদের জন্য সংঘাতে জড়িত গোষ্ঠীগুলির মধ্যে ক্ষমতার লড়াই হিসাবে। Karl Marx, প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন Complex theory এর, যিনি মানুষকে দুই দলে শ্রেণিবদ্ধ করেছেন : পুঁজিবাদী শ্রেণী ও সামাজিক শ্রেণী। সংঘাত তত্ত্ব অনুসারে, সংঘাত তখনই হয়, যখন প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলি অধস্তন গোষ্ঠীগুলি কে শোষণ বা নিপীড়ন করে। সুতরাং, মৌলিক সংঘাত তত্ত্বের ভিত্তি হল, সমাজের মধ্যে ব্যুক্তি বা গোষ্ঠী কাজ করবে তাদের ক্ষমতা ও সম্পত্তি বাড়ানোর আশায়। দ্বন্ধ সম্পর্কে ওয়েবারের বিশ্বাস মাস্কের ধারণার

থেকে কিছুটা আলাদা। তিনি কিছু সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার ধারণা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ধারণা সংহতি মানুষভেদে পৃথক হতে পারে, গোষ্ঠী ভেদেও তার পার্থক্য থাকতে পারে। তেমনি অসমতারপ্রতি ব্যক্তির প্রতিক্রিয়ার মধ্যেও পার্থক্য থাকতে পারে। পরবর্তী কালে বিশ ও একুশ শতাব্দীতে দ্বন্দতত্ত্ববিদ্‌রা তাদের তত্ত্বকে আরোও প্রসারিত করেছেন। যা শুধু কার্লমার্ক্সের অথনৈতিক তত্ত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। যদিও একথা অস্বীকার করা যায় না য়ে, গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বৈষম্যের মূলকারণ ও সংঘাতের মূল উপাদান হিসাবে অর্থনীতির ভূমিকা এখনও মুখ্য। গত কয়েক দশক ধরে, পশ্চিমী সভ্যতায় যে অধ্যয়নগুলির উপর জোরদেওয়া হয়েছে তার মধ্যে দ্বন্দ্বতত্ত্ব অন্যতম। এই তত্ত্ব অসমতা, শান্তি, সংঘাত ও অস্তিত্বের সংকট নিয়ে যে অধ্যয়নগুলি হয় তা সংঘটিত করতে সাহায্য করে।

4.6 সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আমরা ভারতীয় দুই সমাজতত্ত্ববিদ্ Ghurye এবং মুখার্জী সম্বন্ধে জেনেছি। দুই পশ্চিমী সমাজতত্ত্ববিদ্ Durkheim ও Cooley সম্বন্ধে তাদের জীবনী ও কাজ সম্পর্কে অবগত হয়েছি। আমরা সমাজতত্ত্বের বিভিন্ন দিক বোঝার চেষ্টা করেছি। Ghurye এর লেখার মাধ্যমে ভারতরে বর্ণপ্রথা, ভারতীয় উপজাতি ও গ্রাম শহরের নগরায়ণ নিয়ে বিশদে জেনেছি, তিনি ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি এবং ভারতীয় সাধুদের উপর আলোকপাত করেছিলেন, অন্যদিকে এমলি ডুর্খহেম আত্মহত্যার কারণ, শ্রমবিভাজন, ধর্মীয় জীবন নিয়ে কাজ করেছেন, আমরা কুলি ও তাঁর বিখ্যাত "Theory of Transportation সম্বন্ধেও জেনেছি। এছাড়া বিভিন্ন 'Theoretical Paradingms' যেমন প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদ, কার্যকরী দৃষ্টিকোণ ও দ্বন্দ্বের দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে অবগত হয়েছি।

4.7 স্বমূল্যায়ণ প্রশ্নাবলী

1. Ghurye এর মত অনুসারে ভারতীয় বর্ণব্যবস্থার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি?
2. ভারতে জাতয়ী ঐক্যের ক্ষেত্রে Ghurye যে পাঁচটি বাধার কথা উল্লেখ করেছেন, তা লেখ।
3. কেন Ghurye কে ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানের জনক বলা হয়?
4. Acculturation প্রক্রিয়া কি?
5. রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের মতে সভ্যতার আন্তঃসম্পর্কিত দুটি উপাদান লেখ?
6. বাস্তুবিদ্যা (ecology) বলতে কি বোঝ?
7. আধ্যাত্মিক মাত্রা (Spiritual dimension) কি?
8. Durkheim এর আত্মহত্যার তত্ত্বটি লেখ।
9. যান্ত্রিক সংহতি কি?

10. জৈব সংহতি কি?
11. Durkheim এর মতে নৈতিকতা কি?
12. কুলির 'Looking Glass' তত্ত্ব সম্পর্কে লেখ।
13. Social Subjectivity বলতে কি বোঝ?
14. কুলির মতে পরিবহন কি?
15. যোযোগের প্রতীকী মিথস্ক্রিয়া কি?
16. কার্যকরী দৃষ্টিভঙ্গীর একটি উদাহরণ দাও।

4.8 অভিসম্বন্ধ (Reference)

Bhattacharya, D. C (1996). Sociology (6th ed.) Cacutta Vijoya Publishing House.

Emile D (1997), Division of Labour in Society, N.P. : Free Press

Friedkin, Noah E (2004) Social Cohension. Annual Review of Socilogy. 30:409-25\

Perrin, Robest G (1973) "The Functionalist Theory of Change Revisited". The Pacific Sociologist Review 16, 1.

Ritzer, G (2011) Modern Socilogical Theory (5th ed) New York : McGrawhill.

Society and Education – NIOS (2019)
Retrieved from : https : //nios.ac.in/media/documents/dled/Block I-507.pdf

একক 5 ❑ সামাজিক পরিবর্তন

গঠন

5.1 উদ্দেশ্য

5.2 ভূমিকা

5.3 সামাজিক পরিবর্তন

5.3.1 সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা

5.3.2 সামাজিক পরিবর্তনের উদ্দেশ্য

5.3.3 সামাজিক পরিবর্তনে শিক্ষার ভূমিকা

5.4 ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় সামাজিক পরিবর্তন

5.4.1 সংস্কৃতায়ন

5.4.2 পশ্চিমীকরণ

5.4.3 বিশ্বায়ণ

5.5 সামাজিক সংযোগ

5.5.1 প্রচলিত প্রথানুযায়ী সামাজিক সংযোগ

5.5.2 **Informal Social Communication**

5.6 সারাংশ

5.7 স্ব-মূল্যায়ণ প্রশ্নপত্র

5.8 অভিসম্বন্ধ

5.1 উদ্দেশ্য

এই একক পড়ার পর ছাত্র-ছাত্রীরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে অবগত হবে—

- তারা সামাজিক পরিবর্তন কি, তার ক্ষেত্রগুলি কি ও তাতে শিক্ষার ভূমিকা কি
- আধুনিকীকরণ, নগরায়ণ ও পশ্চিমীকরণের ধারণা সম্পর্কে অবগত হবে
- তারা সামাজিক সংযোগকিতা বুঝবে

5.2 ভূমিকা

পরিবর্তন হল প্রকৃতির ধর্ম। প্রকৃতিতে এমন বিষয় হয়ত খুবই কম আছে যা স্থিতিশীল, সময়ের সাথে যার কোন পরিবর্তন হয় না। পরিবর্তন একটি সামাজিক নিয়ম আর যে শুধু ভূত আর বর্তমান দেখে, তার নজরে ভবিষ্যত কোনদিন ধরা পড়ে না। সমাজ সর্বদাই গতিশীল মানুষ সব সময় সামনের দিকে তাকায় যাতে সে ভবিষ্যতে প্রকৃতির সাথে মানিয়ে নিতে পারে। তাই প্রকৃতির সাথে তার সংযোগ স্থাপিত হয়, আর যেখানেই সংযোগ স্থাপিত হয়, সেখানেই পরিবর্তন অব্যসম্ভাবী। কোন কোন সময় পরিবর্তনের মাত্রা থাকে ধীর, শ্লস্থ আর কোন কোন সময় তার গতি হয় তীব্র। প্রত্যেক গোষ্ঠী, সমাজ ধীরে ধীরে তার রীতিনীতি, সংস্কৃতি মূল্যবোধ ইত্যাদি গড়ে তুলছে, যাকে সেই সভ্যতার সংস্কৃতি বলা হয়। বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন সংস্কৃতি সময়ে সাথে সাথে পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রতিটি গোষ্ঠীরই সামাজিক পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তার সভ্যতা সংস্কৃতিতে, তার ঐতিহ্যে মূল্যবোধে। কিছু গোষ্ঠীর সংস্কৃতি সময়ের সাথে পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে পরিবর্তিত হয়। আবার, কিছু সংস্কৃতি সেই পরির্বনের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে না, পিছিয়ে পড়ে। সময়ে সময়ে এই পরির্বনই সমাজকে গতিশীল রেখেছে। সময়ে সময়ে এই পরিবর্তনই সমাজকে গতিশীল রেখেছে। শিক্ষাকে সমাজ পরিবর্তনের অন্যতম শক্তিশালী হাতিয়ার বলে পরিগণিত করা হয়। শিক্ষা প্রক্রিয়ার সামাজিক প্রেক্ষাপটে পরিবর্তন সংঘটিত হয়। সামাজিক পরিবর্তন আসতে পারে সামাজিক গঠনে বা সামাজিক কার্যকলাপের পরিবর্তনের মাধ্যমে। সমাজ গঠনের অংশগুলি হল— পরিবার, বিবাহ ব্যবস্থা, বর্ণ ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সামাজিক রীতিনীতি প্রভৃতি।

Secondary Education Commission এর রিপোর্ট অনুযায়ী বলতে গেলে, "Education is expected to change the attitudes and values among people and create in them desirable progress."

কিছু সমাজতত্ত্ববিদ্ মনে করেন যে, সামাজিক পরিবর্তন ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন হল সমার্থক। তারা সামাজিক পরিবর্তন বলতে সাধারণত সামাজিক রীতিনীতিতে পরিবর্তন, কথা বলা ও লিখনশৈলীতে পরিবর্তন, ভাষায়, পোশাকে ও কেশ প্রণালীর পরিবর্তনকে ইঙ্গিত করেন, সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সমাজ পরিবর্তনের একটি অংশ, যা অন্য সংস্কৃতি দ্বারাও পরিবর্তিত হতে পারে। সামাজিক পরিবর্তন সদাঘটিত একটি পরিবর্তনশীল পদ্ধতি।

5.3 সামাজিক পরিবর্তন : ধারণা, ক্ষেত্রে ও শিক্ষার ভূমিকা

Dr. Henry এর চোখে সামাজিক পরিবর্তন হল— "Change in the composition of society is the basic meaning of social change".

Fairchild বলেছেন— "Social change means variation or modifications in any aspect of social process, pattern or form".

Merrill তাঁর বক্তব্যে বলেছেন— "Society is a complex network of patterened relationship in which all members parficipating in varying degree. These relationship change and the behaviour changes at the same time. These changes we refer to as social change".

Miller বলেছেন — "Social change refers to pattern of social relationship in a given setting."

B. B. Mathur বলেছেন— "Social change refers to the modifications in the organization and behaviour of the group as expressed in its laws, customs modes and beliefs."

Maclver ও Page বলেছেন— "Social change is a process responsive to many type of changes — changes in the man-made conditions of living, changes in the attitude of man and changes that go beyond human control to the biological and physical nature".

সুতরাং আমরা বলতে পারি, সামাজিক প্রক্রিয়ায় ও সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তনের ফলেই সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। সামাজিক পরিবর্তন হল সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনধারার প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থা, বৈষয়িক আচরণ ও ধারণাসমূহের পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তন হল দিক ও মাত্রা নিরপেক্ষ একটি ধারণা। এই পরিবর্তন নানা কারণে ও নানাভাবে সংঘটিত হয়। সমাজের মধ্যে যেকোন পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তন হিসাবে বিবেচিত হয় না। সামাজিক সংগঠন, সামাজিক কাঠামো, সামাজিক মিথস্ক্রিয়া, সামাজিক কার্যপ্রক্রিয়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তন হিসাবে বিবেচিত হয়। সামাজিক পরিবর্তন হল মানবসমাজের প্রাতিষ্ঠানিক ও মূল্যমানগত কাঠামোতে পরিবর্তন।

5.3.1 সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা (Concept of Social Change)

International Encyclopedia of the Social Science (IEES 1972) তে বলা হয়েছে, "looks at changes as the inportant alternations that occur in the social structure or in the pattern of action and interaction in societies".

পরিবর্তন সংগঠিত হয় সামাজিক প্রচলিত রীতিনীতিতে, গোষ্ঠীর আকার আয়তনে, কোন নির্দিষ্ট সামাজিক প্রতিষ্ঠানে বা প্রতিষ্ঠানগুলির আভ্যন্তরীণ সম্পর্কে। সামাজিক পরিবর্তনের অন্যান্য সংজ্ঞাগুলি ইঙ্গিত করে পরিবর্তন আসে সামাজিক ব্যবস্থায় ও সামাজিক কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান, তাদের মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া সামাজিক ক্রিয়াকার্ম, অবসর গ্রহণের প্রণালী, সামাজিক ভূমিকা ও সামাজিক অন্যান্য বিভিন্ন ধরণ ও ধারণাতে — আর এই সবই ঘটে সামাজিক পরিবর্তনের ফলাফল হিসাবে।

সামাজিক পরিবর্তন বলতে কোন গুণগত পরিবর্তন বোঝায় না। সমাজের পরিবর্তন সাংস্কৃতিক

পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কযুক্ত, যাকে 'Socio-Cultural Change' (সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তন) বলে অভিহিত করা হয়। কিছু সমাজ বিজ্ঞানী অবশ্য সামাজিক পরিবর্তন ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করেন। সামাজিক পরিবর্তনকে সামাজিক কাঠামোতে পরিবর্তন বলে সংজ্ঞায়িত করেন। তারা সমাজের আকার আয়তনের মধ্যে পরিবর্তন, সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পর্কের মধ্যে পরিবর্তনকে সামাজিক পরিবর্তন হিসাবে ব্যাখা করেন। তারা মনে করেন সামাজিক পরিবর্তন বলতে বোঝায় প্রধানত প্রকৃত মানুষের আচরণের মধ্যে পরিবর্তন। অন্যদিকে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন বলতে সাংস্কৃতিক ঘটনা যেমন— জ্ঞান, ধারণা, শিল্প, ধর্ম, নৈতিক মতবাদ, মূল্যবোধ, বিস্বাস ইত্যাদির মধ্যে ভিন্নতাকে বোঝায়। তবে এই পার্থক্য বিমূর্ত। কারণ কোন পরিস্থিতিতে কি ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে, তা নির্ণয় করা কঠিন বা প্রায় অসম্ভব। এইক্ষেত্রে, বর্তমান সমাজ কাঠামোর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আছে, আধুনিক প্রযুক্তির বিকাশ যা অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সামাজিক পরিবর্তন তার গতিতে ও পরিধিতে পরিবর্তিত হতে পারে। আমরা ছোট ক্ষেত্রে বা বড় ক্ষেত্রে সামাজিক পরিবর্তন বলতে পারি। বৃত্তকারেও সামাজিক পরিবর্তন সংগঠিত হয়। কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ পদ্ধতিতে প্রশাসনিক স্তরে সামাজিক পরিবর্তন সংগঠিত হয়। এটা কখনও কখনও বিপরীস্ত বিপ্লবীও হতে পারে। কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে সরকার উৎখাত হলে বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা যায়। জাতি গোষ্ঠীর পরিবর্তনের মধ্যে স্বল্পমেয়াদী পরিবর্তন দেখা যায় (migration rate / পরিযায়ী পরিমানের ওপর), পাশাপাশি অর্থনৈতিক কাঠামাতো দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন দেখা যায়। পরিবর্তন কখনও অবিরাম প্রক্রিয়া বিশেষত, কিন্তু কখনও কখনও অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ারূপেও আত্মপ্রকাশ করে, বিশেষত কোন নির্দিষ্ট প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে বা সামাজিক কিছু উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে যা একক সময়ে আবিভূত হয়ে প্রচলিত সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়।

5.3.2 সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্র (Scope of Social Change)

সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া ক্রমাগত ও ধীর প্রক্রিয়া। সমাজ পরিবর্তনের সামাজিক প্রয়োজনও আছে। সমাজ সামাজিক পরিবর্তন ঠেকাতে পারে না। সমাজ পরিবর্তন সমাজের অপরিহার্য অংশ যা সমাজের সম্পূর্ণ কাঠামো বা কোন অংশের সাথে যুক্ত হতে পারে। সামাজিক পরিবর্তনের গতি সমাজে বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হয় বিভিন্ন হারে। এক সামাজিক গোষ্ঠীর পরিবর্তন অন্য সামাজিক গোষ্ঠীর পরিবর্তনকে উৎসাহিত করে। পরিবর্তন একটি সামাজিক বিচ্যুতিও, যখন প্রয়োজনের থেকে অনাকাঙ্ক্ষিত অংশ বেশী বাদ দেওয়া হয়। সামাজিক পরিবর্তন শুধুমাত্র অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক পরিবর্তনের সাথেই জড়িত নয়। ব্যক্তিবিশেষের সামাজিক পরিবর্তনের সাথেও জড়িত। নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও বুদ্ধিমত্তার সাহায্যেও সামাজিক পরিবর্তন ঘটানো যায়। প্রত্যেক ব্যক্তিবিশেষের জীবনের নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে এবং তারা তা অর্জন করার চেষ্টা করে। সেই লক্ষ্য পূরণের জন্য ও সামাজিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে সে উদ্যোগী হয়। সুতরাং প্রতিটি সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কাজ করে। যখন ব্যক্তিরা নিজেদের অবস্থার বা ভূমিকা পরিবর্তন নিয়ে উদ্বিগ্ন ও উদ্যোগী হয়, তখন তাদের চিন্তা ও ব্যবহার সমাজের মধ্যে সমাজের মধ্যে স্থিতিশীলতার অভাব তৈরি করে, এর ফলে সামাজিক পরিবর্তন

ঘটে। বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেমন— প্রযুক্তি, শিল্পায়ন, ধর্ম ও আদর্শে, যেকোন কারণে পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়। পরিবর্তন শুরু হয় উদ্ভাবন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। তারপর, উদ্ভাবনের মধ্যে প্রকরম, উদ্ভাবনের সাথে জড়িত সামাজিক রীতিনীতি, প্রথা ঐতিহ্য, চরিত্র ও ব্যক্তি আচরণের মধ্য দিয়ে কেই সামাজিক পরিবর্তন ত্বরান্বিত হয়। কিন্তু, আমরা কখনই বলতে পারি না যে, একজনের চেয়ে অন্যজনের অবদান বেশি, সামাজিক পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে। এটাও কখন বলা বা অনুমান করা সম্ভব নয় যে, ভবিষ্যতে সমাজে কি পরিবর্তন আসতে চলেছে। পরিবর্তন প্রকৃতির নিয়ম ও সামাজিক পরিবর্তন সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে অপরিহার্য। সামাজিক পরিবর্তন মানে কিছু পুরনো জিনিস বা উপাদানকে বর্জন করা এবং নতুন জিনিস যোগ করা। সামাজিক পরিবর্তন সাধারণত ধরা হয়, সমাজের ভালোর জন্যই সংগঠিত হয় বা কখনও কখনও অন্যথাও হয়। আমাদের ঐতিহ্যের মধ্যে কখনও কখনও পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু এটা বলা দুঃসাধ্য, সেটাই সামাজিক পরিবর্তন কিনা।

5.3.3 সামাজিক পরিবর্তনে শিক্ষার ভূমিকা (Role of Education in Social Change)

শিক্ষা মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব পরিবর্তন এনেছে। শিক্ষা ব্যক্তিকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলে। ব্যক্তি বিশেষদের সমষ্টিক পরিবর্তন থেকে সামাজিক প্রেক্ষাপটে পরিবর্তন আসে। বিজ্ঞানের উন্নতির প্রধান উপকরণ হল শিক্ষা, এবং প্রযুক্তির বিকাশ হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি যা সমাজে ইতিবাচক বা নেতিবাচকভাবে সমাজের আভ্যন্তরীণ কাঠামোয় পরিবর্তন আনতে পারে। ফ্রান্সিস জে. ব্রাউন মন্তব্য করছেন, শিক্ষা এমন একটি প্রক্রিয়া যা সমাজের আচরণে পরিবর্তন আনে (Education is a process which brings about changes int he behaviour of our society)। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যা প্রতিটি ব্যক্তিকে কার্যকরভাবে সক্ষম করে সামাজিক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ করতে ও সমাজের অগ্রগতিতে ইতিবাচক অবদান রাখতে।

শিক্ষা সামাজিকীকরণের প্রধান উপাদান হিসাবে গৃহীত এবং শিক্ষক সেই সামাজিকীকরণের মাধ্যমে হিসাবে কাজ করে। শিক্ষাকে একটি যন্ত্র হিসাবে বর্ণনা করে, তিনটি মাধ্যমের সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকাকে তুলে ধরা হয়—

i) পরিবর্তনের মাধ্যম

ii) পরিবর্তনের বিষয়বস্তু

iii) যাদেরকে পরিবর্তন করতে চাওয়া হয় তাদের সামাজিক প্রেক্ষাপট অর্থাৎ ছাত্র।

শিক্ষামূলক বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানগুলি সেই গোষ্ঠীর মূল্যবোধকে প্রতিফলিত করে যার দ্বারা শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হয়। সেই হিসাবে শিক্ষকরা সুনির্দিষ্ট করেছেন শিক্ষা উপযোগী মূল্যবোধ ও আকাঙ্খা শিশুদের জন্য। শিক্ষিত সমাজ সংস্কার করা মূল্যবোধের উপর জোর দিয়েছিলেন, যেমন জাতপাতের ওপর বিধিনিষেধ অপসারণ, সামাজিক ক্ষেত্রে নারীদের সমতা, সামাজিক কুফল দূরীকরণ, দেশের শাসন ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক কণ্ঠস্বরের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। তাই, তারা এইভাবে উদাহরনৈতিক দার্শনিক

শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন শেখাতে চেয়েছিলেন। অন্যকথায়, শিক্ষাকে জ্ঞানের আলো বলে বিবেচনা করা হয় যা অশিক্ষার অন্ধকারকে দূর করে। একটি স্থির অগতিশীল সমাজে, শিক্ষার মূল ঐতিহ্য হল সেই সমাজের সাংস্কৃতির ঐতিহ্যকে নতুন প্রজন্মের কাছে সঞ্চারিত করা। কিন্তু পরিবর্তনশীল সমাজে, সংস্কৃতি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে পরিবর্তনশীল, শিক্ষা এইসব সমাজের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বহন করবে না, সাহায্য করবে সংস্কৃতির মধ্যে যে ধরনের পরিবর্তন হয়েছে বা হতে পারে, তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ভবিষ্যত সমাজের জন্য তরুণদের প্রস্তুত করা। সাম্প্রতিক সমাজে, "The proportion of change that is either planned or issues from the secondary conequences of deliberate innovations is much higher than in former times". নতুন গঠিত হওয়া সমাজের ক্ষেত্রে এটি বেশি মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়, যারা এখনও উন্নয়ণশীল অবস্থায় আছে। সুতরাং শিক্ষা ব্যবস্থা ও সমাজ পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ, কখনও কখনও শিক্ষা সমাজকে প্রভাবিত করে আবার কখনও কখনও সমাজ শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে।

5.4 ভারতীয় প্রেক্ষাপটে সামাজিক পরিবর্তন : সংস্কৃতায়ণ, পশ্চিমীকরণ, এবং বিশ্বায়ণ

আজকের পৃথিবী একটি আন্তঃসংযুক্ত বিশ্বের মত। পৃথিবীর কোথাও কোন ঘটনা বিশ্বের অন্যান্য অংশকে প্রভাবিত করে। পৃথিবীর সর্বত্রই প্রচলিত ধারণাগুলিকে আধুনিক ধারণা দ্বারা প্রতিষ্ঠাপিত করা হয়েছে। যাইহোক, কিছু ব্যক্তি অবিরত চেষ্টা করে তাদের ঐতিহ্য সংরক্ষণ করতে। কিন্তু শক্তিশালী দেশগুলি চেষ্টা করে তুলনামূলক কম শক্তিশালী দেশগুলিকে সাংস্কৃতিক উপনিবেশে পরিণত করতে। আমরা এখন এই প্রসঙ্গে আলোচনা করব।

5.4.1 সংস্কৃতায়ণ (Sanskritization)

ভারতীয় সামাজিক প্রেক্ষাপটেই সংস্কৃতায়ণের অস্তিত্বের হদিশ পাওয়া যায়। 'সংস্কৃতায়ণ' শব্দটি প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী M. N. Srinivas এর সৃষ্টি। তিনি 'Religion and Society, among the C.oorgs of Southern India' শীর্ষক বইতে 1952 সালে শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। শ্রীনিবাস সাধারণভাবে সামাজিক গতিশীলতার এবং বিশেষত নিম্নবর্ণের মানুষের মধ্যেকার সামাজিক গতিশীলতা ব্যাখার ব্যাপারে সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়াটির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি অন্তবর্ণ গতিশীলতার প্রক্রিয়া হিসাবে সামাজিকীকরণকে চিহ্নিত করেন। Social Change in Modern India নামক গ্রন্থে শ্রীনিবাস লিখেছেন— ভারতীয় সমাজে সংস্কৃতায়ণ হল সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। শ্রীনিবাসের অভিমত অনুসারে উচ্চবর্ণের জাতির জীবনযাত্রার প্রণালী অনুকরণ করার ব্যাপারে নিম্নবর্ণের জাতির মধ্যে একটি স্বাভাবিক প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। এই প্রবণতাকে নিম্নবর্ণের জাতি সযত্নে পালন করে। তারা উচ্চবর্ণের শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠান, জীবনরীতির বিধি নিষেধ, জীবনযাত্রা, প্রণালী প্রভৃতি অনুসরণ করে চলে। নিম্নবর্ণের হিন্দুরা দীর্ঘকাল ধরে এইরকম অনুকরণ ও অনুসরণের মাধ্যমে উচ্চবর্ণে উন্নীত

হওয়ার ব্যাপারে সচেষ্ট হয়। তারা তাদের পদবীর পরিবর্তন ও অন্যান্য আনুষাঙ্কিক কাজকর্ম সম্পাদন করতে থাকে। তারপর তারা কালক্রমে নিজেদের সংশ্লিষ্ট উচুঁ জাতির অন্তভুর্ক্ত বলে দাবি করতে থাকে। এবং এই দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্য তারা সর্বত্তোভাবে উদ্যেগী হয় ও প্রচার চালায়।

সংস্কৃতিকরণ হল একটি বিশেষ প্রক্রিয়া যার দ্বারা নীচু জাতির হিন্দু বা আদিবাসী বা অন্যান্য জনগোষ্ঠী নিজেদের প্রথা, রীতিবিধি, আদর্শবোধ এবং জীবনযাত্রার প্রণালী পরিবর্তন করে উচুঁজাতের এবং সাধারণত দ্বিজবর্ণের সমাজ হওয়ার চেষ্টা চালায়। "Sanskritization is the process by which a 'Low Hindu cast, or tribal or other group, changes its customs, ritual, ideology and way of life in the direction of a high, and frequently, 'twice born caslte'.

বর্ণের শাস্ত্রীয় বর্ণনা সংস্কৃত বৈদিক যুগ থেকে হয়ে এসেছে (1200-1500 খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ) এবং রঙ এর উপর নির্ভর করে বর্ণের ধারণা মূর্ত হয়ে উঠেছে। সেখানে চার অনুমিত আচার অনুষ্ঠানের বিশুদ্ধতার ক্রমানুসারে বর্ণপ্রথা গড়ে উঠেছে—

1) ব্রাহ্মণ (পুরোহিত ও পন্ডিত)

2) ক্ষত্রিয় (শাসক ও যোদ্ধা)

3) বৈশ্য (বণিক ও ব্যবসায়ী) — Staza change এরা প্রতিনিধিত্ব করে ''দুইবার জন্ম নেওয়া'' উচ্চবর্ণ ও যাদের পুরুষ সদস্যরা আনুষ্ঠনিক উপাচারের মাধ্যমে পবিত্র সুতো দান করে 'দ্বিতীয়' জন্মের অধিকারী হয়েছে।

4) শুভ্র (শ্রমিক ও চাকর) এবং দলিত (অস্পৃশ্য বা হরিজন), যাদের মধ্যে পরেরটিকে পরবর্তীকালে প্রযুক্তিগতভাবে বর্ণভেদ প্রথার বাইরে রাখা হয়

যদি ভারতীয় সমাজে বর্তমানকালের দলিতদের আন্দোলনগুলি দেখি, তাহলে বোঝা যাবে শুধুমাত্র সংস্কৃতিয়ানের জন্য সামাজিক পরিবর্তন ঘটছে না। বরঞ্চ, শুদ্র ও দলিতরা সমাজের উচ্চ সিড়িতে উঠতে সক্ষম হচ্ছে। তার মূলে আছে শিক্ষা, সম অধিকার, ইংরাজী শেখার সুযোগ, ভালো স্বাস্থ্য পরিষেবা, পরিষ্কার পানীয়, চাকরি ইত্যাদি।

1. সংস্কৃতকরণের মডেল (Models of Sanskritization)

সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী গোষ্ঠীর জাতিগুলিকে উচ্চ বা নিম্ন মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। পবিত্র সুতো পরা, মাংস ও মদের ব্যবহার থেকে বিরত থাকা, বিধবা বিবাহ না করা, অন্তঃবিবাহকে প্রাধান্য দেয়ো ধর্মীয় পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে পূজো করা ধর্মীয় গ্রন্থ ও পৌরাণিক কাহিনীর প্রতি ঝোঁক ও শ্রদ্ধা ভিক্ষা প্রদান এবং পূজার সময় উপঢৌকন, বৃদ্ধির ব্যবহার, প্রদীপ, ফুল শস্য ও বিসর্জন, ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিতে মন্দির ও তীর্থস্থানগুলিকে পবিত্রতা দেওয়া হয়েছে। তারা পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতার পরিমাপের মান হিসাবে বিবেচিত। সুতরাং দত্তক গ্রহণ, একজনের জীবনধারার উচ্চবর্ণের পথ এবং বর্ণ, আশ্রমের আদেশ গ্রহণ, কর্ম ও পুনর্জন্ম

ইত্যাদি সংস্কৃত সাহিত্যে প্রদত্ত চিন্তার প্রতি বিশ্বাস প্রদর্শন, ধর্ম, গুণ, মোক্ষ, মায়া ও ব্রহ্ম ইত্যাদি সবই সংস্কৃতকরণের বিশেষ রূপ। সংক্ষেপে ধর্মে বর্ণিত বিশুদ্ধতার আচরণ ও নিয়ম মেনে নেওয়া গ্রন্থগুলির সংস্কৃতকরণের একটি রূপ।

2. বর্ণ মডেল (Varna Model)

বর্ণ ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ মর্যাদা হল ব্রাহ্মণের পরে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র। অন্তজ হল বর্ণ ব্যবস্থায় পঞ্চম ও সর্বনিম্ন বর্ণ যারা অস্পৃশ্য হয়। সমাজের বিভিন্ন জায়গায়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যরা সম্মান ও মর্যাদা অর্জন করে। নিম্নবর্গীয়রা উচ্চ বর্গীয়দের আদর্শ, জীবন প্রণালী ইত্যাদি অনুকরণ করে। সেখানে ক্ষত্রিয়রা তাদের শ্রেষ্ঠত্ব উপভোগ করে। একইভাবে, বৈশ্যরাও তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ভোগ করে। শুধুমাত্র নিম্নতম জাতি (অন্ত্যজ) শূদ্রদের অনুসরণ করে। একটি বর্ণের জীবনধারা বা আদর্শের ভিত্তিকে অনুকরণ করা হয়। সেই শ্রেণীর দ্বারা ভোগ করা সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বকে সংস্কৃতায়ণের বর্ণ মডেল বলা হয়।

3. স্থানীয় মডেল (Local Model)

প্রতিটি সম্প্রদায়ের মধ্যে, কিছু বর্ণ তাদের সংখ্যাগত বা অর্থনৈতিক শক্তির ভিত্তিতে অন্যদের চেয়ে বেশি সম্মানিত বলে বিবেচিত হয়। এই জাতিকে "Master Class" বলা হয় অথবা শ্রীনিবাসের কথায় বলা যেতে পারে, "the dominant class"। গ্রাম্য সমাজে কৃষিবিদ্ জাতিরা প্রাধান্য পায়। নিম্নবর্ণের লোকেরা এই প্রভাবশালী বর্ণের জীবনধারা অনুকরণ করে ও তাদের আধিপত্য বাড়ানোর চেষ্টা করে। স্থানীয় উচ্চবর্ণের জাতিগুলি নিম্নবর্গীয়দের কাছে অনুপ্রেরণার কাজ করে। প্রভাবশালী জাতি যদি রাজপুতবা বানিয়া হয়, তবে ক্ষত্রিয়রা ও বৈশ্যরা তাদের দ্বারা প্রভাবিত হবে। সুতরাং সংস্কৃতকরণের মডেলগুলি প্রভাবশালী অনুযায়ী পরিবর্তত হতে থাকে। সংস্কৃতকরণের ক্ষেত্রে আধিপত্যশীল জাতিগুলি প্রক্রিয়াটিকে অগ্রসর বা পিছিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটি বর্ণের প্রভাবশালী হওয়ার জন্য, একটি বিশাল পরিমাণ আবাদযোগ্য জমি থাকা উচিত, গোষ্ঠীতে তাদের সংখ্যার প্রাধান্য থাকা উচিত এবং স্থানীয় শ্রেণীবিন্যাসে সেই বর্ণ যদি উচ্চস্থান দখল করে থাকে, তাহলে সেই বর্ণ স্থানীয় সংস্কৃতায়ণকে প্রভাবিত করবে। আধিপত্যের নতুন কারণগুলির মধ্যে আছে পশ্চিমীশিক্ষা, প্রশাসনে চাকরি এবং শহুরে আয়ের উৎস। এই প্রভাবশালী জাতিগুলি নিম্নবর্ণের মধ্যে অনুকরণ করার ইচ্ছাকে জাগিয়ে তোলে, তারা সেই মর্যাদাপূর্ণ জীবনধারা পাবার লক্ষ্যে তারা তাদের সামাজিক অবস্থার উন্নতি করতে সক্ষম হয়। কিছু কিছু জায়গায় এমন অভিযোগও শোনা যায়। উচ্চবর্গায়রা নিম্নবর্গীয়দের উপর অত্যাচার করে ও তাদের পদে পদে ছোট দেখায় এবং তাদেরকে বাধ্য করে যাতে তারা তাদের জীবনশৈলী অনুকরণ না করে।

সংস্কৃতকরণের জন্য প্রেরণা (Motivation for Sanskritizaion)

সংস্কৃতকরণের পিছনে যে কারণটি অন্যদের উৎসাহিত করে তা হল সংস্কৃতকরণের ফলে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সদস্য একই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করে যা উচ্চ বর্ণের লোকেরা

উপভোগ করত। নিজের মান বাড়ানোর এই অনুপ্রেরণা আসত আপেক্ষিক বঞ্চনার অনুভূতি থেকে কারণ হিন্দু সমাজ বর্ণাশ্রম প্রথা দ্বারা কাটোর ভাবে চালিত হত। জীবনের সম্ভাবনা, সামাজিক সুযোগ, অর্থনৈতিক অবস্থান ও রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা সবকিছুই বর্ণপ্রথা দ্বারা নির্ধারিত হতো। অনমনীয় বর্ণের নিয়মগুলি বর্ণের মধ্যে বিস্তরদূরত্ব তৈরি করেছিল। সব ধরনের সামাজিক সুযোগ সুবিধা উচ্চবর্ণের লোকেরা ভোগ করত, যেখানে নিম্নবর্ণের লোকেরা এইসব সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। সুতরাং সংস্কৃতাকরণের মাধ্যমে একজনের সামাজিক অবস্থান বাড়ানোর সর্বোত্তম উপায় হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। সংস্কৃতকরণের পিছনে আর একটি অন্তঃনিহিঞ্চত কারণ ছিল চাপা আন্তঃশ্রেণী বৈরিতার প্রকাশ। যে বর্ণাশ্রম প্রথার জন্য তারা উচ্চবর্গে বিরাজ করত, সুবিধা ভোগ করত তাদের উপরই হতাশা ও বিরক্তি ফুটে উঠত।

সংস্কৃতকরণকে গতিশীল করার কারণগুলি (Factgors Facilitating Sanskritization)

সংস্কৃতকরণ প্রক্রিয়াকে গতিশীলকরার কারণগুলিকে আধুনিক ভারতীয় প্রেক্ষাপটে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেগুলিহল—

1. ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা (British Rule) : ভারতে ব্রিট্রিশ শাসন প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে নিম্নবর্ণের মানুষ সংস্কৃতকরণের মাধ্যমে নিজেদের মর্যাদা বাড়ানোর সুযোগ পেয়েছিল। যেহেতু ব্রিটিশরা বর্ণপ্রথা নিয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহী ছিল না তাই তারা সংস্কৃতকরণের গতিশীলতার সাথে ন্যূনতম ভাবেও জড়িত ছিল না।

2. যোগাযোগের উন্নয়ণ (Development of Communication) সড়ক ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ণ পূর্বের দুর্গম এলাকাগুলোর সংস্কৃতকরণের প্রক্রিয়াকে ত্বরাণ্বিত করেছে। রেল ও অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে মানুষ ধর্মীয় কেন্দ্র যেমন— মথুরা, দ্বারকা, গয়া, কাশী, পুরী ইত্যাদি জায়গায় ভ্রমণ করতে সক্ষম হয়েছে।

3. যোগাযোগের পন্থা হিসাবে গণমাধ্যমের বিকাশ (Development of the Man Media of Communication) রেডিও, সিনেমা, মাইক্রোফোন, সংবাদপত্র, ধর্মীয় পাক্ষিক পত্রিকা ইত্যাদি সংস্কৃতকরণকে প্রভাবিত করেছে ও সংস্কৃতমূল্যবোধ এবং মর্তাদশকে জনপ্রিয়করণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।

4. রাজনৈতিক কারণ (Political Factors)

   ভারত একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশ। আর এটাই সংস্কৃতকরণের পথকে আরোও প্রশস্ত করেছে। সংস্কৃত কৃষ্টিতে যে প্রতিরোধ ব্যবস্থা ছিল তাকে ভারতীয় সংবিধান স্বমূলে উৎপাটিত করেছে। সর্বক্ষেত্রে সম অধিকার আইনের দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে। এবং অস্পৃশ্যতার অবসান হয়েছে। যারফলে বর্ণাশ্রমের একচেটিয়া আধিপত্ব অনেকাংশে খণ্ডিত হয়েছে।

5. শিক্ষাগত কারণ (Educational Factor)

   পশ্চিমী শিক্ষার প্রভাবের ফলে, সামাজিক ধর্মীয় আন্দোলন যেমন— আর্যসমাজ, ব্রাহ্ম সমাজ

ইত্যাদি আন্দোলন সমাজের বুকে গড়ে ওঠে, যা সংস্কৃতকরণ প্রক্রিয়াতে অনেক অবদান রেখেছিল। এছাড়া নিম্নবর্ণ গোষ্ঠীর মধ্যে সাক্ষরতা, সংস্কৃতকরণকে সম্ভব করে তোলে।

6. সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান (Cultural Institution)

প্রতিটি মন্দির এবং তীর্থক্ষেত্র সংস্কৃতকরণের উৎস হিসাবে কাজ করেছে। উৎসব ও অন্যান্য বিধিদ অনুষ্ঠানে যেখানে তীর্থযাত্রীরা জড়ো হয়, তারা তাদের সাংস্কৃতিক ধারণা ও বিশ্বাস পরস্পরের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। আরও বেশি কিছু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আছে যার সাথে সন্ন্যাসী ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুসারীরা ওতপ্রতোভাবেহ জড়িত, তারাও হিন্দুধর্মের ধারণা ও বিশ্বাসকে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে।

7. অর্থনৈতিক কারণ (Economic Factor)

উন্নত অর্থনৈতিক অবস্থা স্থানীয় বর্ণবিন্যাসে কোন ব্যক্তিবিশেষকে উচ্চবর্গে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে। কিন্তু সম্পদ অর্জন, সংস্কৃতকরণের অন্যতম শর্ত তা সব সময় নয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীনিবাস একটি ঘটনার উল্লেখ করেন। মহীশূরের একজাতি অপরিবর্তিত অর্থনৈতিক অবস্থান থাকা সত্ত্বেও নিজেদের সংস্কৃতকরণের মাধ্যমে উচ্চবর্গে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। তবে বাস্তবতা হলো যে অর্থনৈতিক অবস্থা শক্তিশালী হলে সংস্কৃতায়ণ সহজ হয়ে যায়।

8. সাম্প্রদায়িক আন্দোলন (Sectrian Movements)

সাম্প্রদায়িক আন্দোলনগুলিও সংস্কৃতকরণের পথকে সুপ্রশস্ত করেছিল। যখন তারা নিম্নবর্ণের সদস্যদের আকৃষ্ট করেছিল, তারা তাদের মর্যাদা বাড়াতে সাহায্যে করেছিল সাধকের দ্বারা পরিচালিত ভক্তি আন্দোলন ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে তাতে সামিল করেছিল। এটি সংস্কৃতকরণের শক্তি হিসাবে কাজ করেছিল। এর ফলে সামাজিক পরিবর্তন ত্বরান্বিত হয়েছিল।

সামাজিক পরিবর্তনে সংস্কৃতকরণের প্রভাব (Effects of Sankritization on Social Change)

যদি ভারতীয় সংস্কৃতি দ্বিজ জন্মানো বর্ণের দ্বারা প্রচলিত সাংস্কৃতিক আদর্শের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য), তাহলে আমরা বলতে পারি, সংস্কৃতকরণের প্রক্রিয়া হাজার বছর ধরে গতিশীল ছিল, কারণ বিদেশি হানাদাররা তাদের নিজেস্ব সংস্কৃতি ছড়িয়ে দেওয়ার পরিবর্তে ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে দ্বিজদ্বারা প্রচলিত সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেছে। সেই কারণেই সেলুকাসের কোন চিহ্ন নেই। যিনি গ্রীস থেকে আগত সিকান্দার দ্য গ্রেটের উত্তরসূরি ছিলেন শুক, হূর্ণ এরা ভারতীয় রাজাদের পরাভূত করলেও এদের বর্ণ বা শ্রেণীকে নিম্নবর্গীয় ধরা হত, পরবর্তীকালে এরা ভারতীয় সংস্কৃতি গ্রহণ করেন। মুসলিম, ব্রিটিশরা ভারতবর্ষ শাসন করার জন্য, রাজনৈতিক ক্ষমতার শীর্ষে থাকার জন্য, তাদের সংস্কৃতি পরিবর্তন করার দরকার পড়েনি।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে সংস্কৃতকরণ (Sanskritization in Religious Field)

নিম্নবর্গীয় মানুষরাও দ্বিজদের মতো মন্দির তৈরি করেছে। সেখানে দেব-দেবীর পাশাপাশি নিজ বর্ণের মহান ব্যক্তিদের বসিয়েছে। তারা অনেকে পবিত্র সুতোও ধারণ করেছে। তারা প্রতিদিন মন্দিরে যায়, আরতি ভজন করে। তারা নিজেদের বর্ণ থেকে পুরোহিত নির্বাচিত করেছে। মধ্যবর্ণায়দের মন্দিরে পুরোহিত হিসাবে দ্বিজদের নির্বাচন করা হয়। তারা দ্বিজদের মতো বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান করে। বলিদান ও হোম বিভিন্ন ধর্মীয় কার্যাবলী শিশুদের নামকরণ উৎসবে করা হয়। তারা ক্রমশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে এগোচ্ছে। তিনি নিষিদ্ধ খাবার ও পানীয় গ্রহণ পরিত্যাগ করেছে। তারা অপবিত্র পেশাও পছন্দ করে না। তারা বাসনপত্র ও জামাকাপড় পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে যত্নবান। উপজাতি সম্প্রদায়ের হিন্দু ধর্ম গ্রহণও সংস্কৃতকরণের উদাহরণ। মধ্য বর্ণীয়রা বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের দপ্তরের বিভিন্ন কাযকর্মে নিযুক্ত থাকে। তারা ও ক্রমে ব্রাহ্মণদের মত যাগযজ্ঞ করতে পারদর্শী হয়ে উঠেছে।

সামাজিক ক্ষেত্রে সংস্কৃতকরণ (Sankritization in Social Field)

সামাজিক পরিবর্তনের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সংস্কৃতকরণের সামাজিক দিকটি গুরুত্বপূর্ণ। সংস্কৃতকরণ ধর্মীয় ব্যবস্থার সাথে প্রবলভাবে সম্পর্কিত হলেও এর প্রধান লক্ষ্য হল সামাজিক সংস্কৃতকরণ। নিম্নবর্ণের লোকেরা সংস্কৃতিকরণের প্রতি আগ্রহী কারণ এর ফলে তারা নিজেদের সামাজিক মর্যাদাকে উন্নতর করতে পারে ও বর্ণ শ্রেণীবিন্যাসে উচ্চস্তরে অবস্থান করতে পারে। তারা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের সমান জায়গা চায়। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা দ্বিজদের মত সমান জায়গা অর্জন করেছে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংস্কৃতিকরণ (Sanskritization in Economic Field)

পেশার পরিবর্তনেও সংস্কৃতকরণের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সমাজ স্বীকৃত পেশা বা জীবিকা সামাজিক উচ্চতার প্রতীক। পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে সব্জী ও ফেরিওয়ালার কাজ করে চলেছে ভাঙ্গীরা। অনগ্রসর শ্রেণী উচ্চপদে কর্মরত। তফসিলি জাতি উপজাতিরা পরিষেবাগুলিতে সংরক্ষণের সুযোগ পায়। আবার দ্বিজরা বর্তমান সমাজে অনেক ক্ষেত্রে কেরানি বা পিয়ন হিসাবে তফসিলিজাতির কর্মকর্তাদের অধীনে কাজ করে।

জীবনযাত্রায় সংস্কৃতায়ণ (Sanskritization in Living)

জীবনযাপনের শর্তগুলিতে সংস্কৃতকরণ করা হয়েছে। নিম্নবর্ণের লোকের। এখন পাকা বাড়িতে বসবাস করে। দ্বিজদের মতো নিম্নবর্ণের লোকেরা বসার ঘর ব্যবহার করছে। তারা 'চেয়ারের' দিকে আকৃষ্ট। ভয়ের কোনরকম অনুভূতি ছাড়াই তারা উচ্চবর্ণের সাথে খাটের উপর বসে। তারা তাদের বাড়ি ঘর পরিষ্কার রাখে। তারা দেওয়ালে হিন্দু দেবদেবী ও তাদের নেতাদের ছবি লাগায়। তারা নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখে ওপরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক পড়ে। পূর্বে তারা দ্রারিদ্যতার কারণে অর্ধ উলঙ্গ ছিল বা থাকতে বাধ্য হয়েছিল। এখন তারা উচ্চবর্ণের অনুরূপ পোশাক পড়ে ও একই ভাষায় কথা বলে।

সংস্কৃতকরণের অন্যান্য প্রভাব (Other Effects of Sanskritization)

অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়া সত্ত্বেও, সংস্কৃতকরণ নিম্নবর্গীয় মহিলাদের জীবনে বিভিন্ন অসুবিধার সৃষ্টি করেছে। সংস্কৃতকরণের পূর্বে, তারা যেসব সামাজিক নিয়মাবলী পালন করত তা এত কঠোর ছিল না। কিন্তু সংস্কৃতকরণের ফলে যখন তারা উচ্চবর্ণের আচরণবিধি অনুকরণ করার চেষ্টা শুরু করল, তারা ব্রাহ্মণ সমাজের বিভিন্ন রীতিনীতি অনুসরণ শুরু করল যা অপমানকর ছিল নিম্নবর্গীয় মহিলাদের প্রতি। উদাহরণ হিসাবে ধরা যায়, বাল্যবিবাহ, বিধবা বিবাহ না করার অনুমতি বা বিধবাদের ন্যাড়া থাকা ইত্যাদিও নিম্নবর্ণে প্রবেশ করল ও তারা তা অনুকরণ করা শুরু করল। দ্বিতীয়ত, সংস্কৃতকরণ বৈবাহিক জীবনের উপরও সুগূঢ় প্রভাব বিস্তার করেছিল। স্ত্রীরা সর্বস্ব দিয়ে নিজেদের বিশ্বস্ততা ও সতীত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করত স্বামীদের কাছে। তৃতীয়তঃ সংস্কৃতকরণ অস্পৃশ্যজাতিদের প্রভাবিত করেছে মদ, গরুর মাংস, গৃহপালিত শূকরের মাংস ভক্ষণ ইত্যাদি পরিত্যাগ করতে। এর ভিত্তিতে শ্রীনিবাস বলেছেন "in the next twenty or thirty years the culture of untouchables all over the country will have undergone profound changes."

সমালোচনা (Criticisms)

সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ধারণা হিসাবে সংস্কৃতকরণকে বিভিন্নভাবে সমালোচনা করা হয়েছে—

প্রথমত, এটি অভিযোগ করা হয়েছে সংস্কৃতকরণ একটি জটিল ও ভিন্নধর্মী ধারণা, শ্রীনিবাস নিজেই স্বীকার করেছেন যে সংস্কৃতকরণ কোন একক ধারণা নয়, অনেক ধারণার সংমিশ্রণ।

দ্বিতীয়ত, সংস্কৃতকরণ তাত্ত্বিকভাবে আলাদা শব্দ।

তৃতীয়ত, সংস্কৃতকরণ, আইনগত অর্থে সত্য প্রত্যয়মূলক ধারণা যা আদর্শ সাধারণ ও নামমাত্র সংজ্ঞার মধ্যে দোদুল্যমান অবস্থায় বিরাজিত।

চতুর্থত, সংস্কৃতায়ন সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের অনেক দিক বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়।

সংস্কৃতায়ন অতীত ও সাম্প্রতিক ভারতের অনেক অ-সংস্কৃত পরিবেশকে উপেক্ষা করে।

পঞ্চমত, D. N. Majumdar তাঁর 'মোহনা' গ্রাম নিয়ে গবেষণায় দেখিয়েছেন, সেই গ্রামে নিম্ন বর্গীয়দের মধ্যে উচ্চবর্ণে উন্নীত হবার প্রতি কোন আগ্রহ বা চেষ্টা নেই। না সংস্কৃতায়ণ তাদের উচ্চবর্ণে উন্নীত হতে সাহায্য করছে।

ষষ্ঠত:, Lynch বলেছেন, সংস্কৃতায়ণ একটি সংস্কৃত আবদ্ধ প্রক্রিয়া, স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে সামাজিক গতিশীলতার জন্য যে আন্দোলনগুলিই হয়েছিল তার সবগুলিই সংস্কৃতায়ন দ্বারা ব্যাখা করা সম্ভব করা সম্ভব নয়।

সপ্তমত:, Chauhan সংস্কৃতায়ন থেকে বর্ধিত আচার অনুষ্ঠানকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ আচার অনুষ্ঠান অ-সংস্কৃত রীতিনীতিকে যে প্রাধান্য দেয় তা সংস্কৃতায়ন কখনই দেয় না।

5.4.2 পশ্চিমীকরণ (Westernization)

সংস্কৃতায়নের মতো পশ্চিমীকরণের ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল সামাজিক পরিবর্তন বুঝতে। আধুনিক ভারতের সামাজিক পরিবর্তন বুঝতে। আধুনিক ভারতের সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবর্তন পর্যালোচনার ক্ষেত্রে পশ্চিমীকরণের ধারণাটি তাৎপর্যপূর্ণ, ভারতীয় জনজীবনে সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে 'পাশ্চাত্ত্যীকরণ' ধারণাটির প্রয়োগের ক্ষেত্রে শ্রীনিবাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় প্রেক্ষাপটে দক্ষিণের কুর্গের গবেষণা করার সময়। শ্রীনিবাসের গবেষণায় এই ধারণা উঠে এসেছিল। লেখক পশ্চিমীকরণকে এইভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন— "..... the change brought about in Indian society and culture as a result of over 150 years of British rule, The term subsuming changes occuring at different levels of technology". শ্রীনিবাসের পশ্চিমীকরণ তত্ত্বের মধ্যে সাধারণত মানবতাবাদ এবং যুক্তিবাদ অন্তর্ভুক্ত ছিল। পশ্চিমীকরণের বিস্তৃত মাত্রা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে যোগেন্দ্র সিং (1944) লিখেছেন— "Emphasis on humanitarianism and rationalism is a part of westernization which led to a series of institutional and social reforms in India. Establishment of scientific, technological and educational institutions, rise of nationalism, new political culture and leadership in the country, are all by products of westernization".

শ্রীনিবাস যুক্তি দিয়েছেন পশ্চিমীকরণ প্রক্রিয়াটি সংস্কৃতায়ণকে শ্লস্থ করে দেয়নি, প্রকৃতপক্ষে উভয় প্রক্রিয়া একসাথে চলে, আবার কখনও কখনও পশ্চিমীকরণের বৃদ্ধি সংস্কৃতায়ণ প্রক্রিয়াকে বাড়িয়ে তোলে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও পরিবহন ব্যবস্থার সুবিধা পশ্চিমীকরণের প্রভাবকে ছড়িয়ে দিয়েছে এবং তীর্থস্থান ও বর্ণ সমিতির মতো সংস্কৃত প্রতিষ্ঠানগুলিকে আধুনিক করে তুলেছে।

তিন-চার দশক ধরে দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় সংস্কৃতিতে নতুন ধরনের সাংস্কৃতিক চিন্তা ভাবনার উদয় হয়েছে। যেসব দেব-দেবীর অবলুপ্তির পথে ছিল, তাদেরও পূর্জাআর্চা নতুন করে শুরু হয়েছে। গোষ্ঠীর সম্বনায়ক সমিতিগুলি আরোও ভালোভাবে সংগঠিত হয়েছে। অভিজ্ঞতামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, পশ্চিমীকরণের বৃদ্ধির সাথে সাথে সংস্কৃতির বৃদ্ধি হয়েছে।

উৎপত্তি (Origin)

শ্রীনিবাস তাঁর লেখনীতে পশ্চিমীকরণের উত্থানের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। শ্রীনিবাসের অভিমত অনুসারে পাশ্চাত্তীকরণ বা পাশ্চাত্য সমাজ সংস্কৃতির প্রভাব বলতে বোঝায় ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতীয় সমাজ্যব্যবস্থায় সভ্যতা সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংগঠিত পরিবর্তন যা স্বাধীন ভারতে এখনও অব্যাহত আছে এবং অনেক ক্ষেত্রে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও গতিময় হয়েছে। বস্তুত পক্ষে, সুদীর্ঘকালের ব্রিটিশ

শাসন ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন কায়েম করেছে। এই পরিবর্তন ব্যাপক, স্থায়ী ও কার্যকরী। ভারতবর্ষে ইংরেজ জাতি গ্রাম ও শহরে শুধু শোষণ করেনি, তাদের সাথে অনেক কিছু নিয়ে এসেছে। এইসবের মধ্যে সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকে উল্লেখযোগ্য হল — বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিশ্বাস, মূল্যবোধ প্রভৃতি। ব্রিট্রিশদের আমদানি করা ছাপাখানার প্রযুক্তি এক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ। এই ছাপাখানা দেশের মানুষের চিন্তা-চেতনা ও জীবনরীতিতে বহুমুখী ও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত করেছে। ব্রিটিশ শাসন ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে কিছু আমূল পরিবর্তন এনেছে। ব্রিটিশ শাসনের সূচনা হয় নতুন প্রযুক্তি, প্রতিষ্ঠান, জ্ঞান, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের মাধ্যমে। ধীরে ধীরে ঔপনেবেশিক শাসন, ভারতীয় সমজের বিভিন্ন অংশকে একীভূত করেছিল। আধুনিক ভারত প্রকৃতপক্ষে সেই সময় থেকে শুরু হয়েছে। জমি জরিপ হয়েছে, স্থির হয়েছে রাজস্ব ব্যবস্থা, নতুন আমলাতন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে এবং সেইসাথে সেনাবাহিনী, পুলিশ ও আইন-আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রিটিশ শাসন যোগাযোগ, রেলপথ, ডাক ও টেলিগ্রাফের বিকাশ ঘটায় এবং স্কুল কলেজ শুরু করে।

"One obvious result was that books and journals, along with schools, made possible the transmission of modern, as well as traditional knowledge to large numbers of Indian knowledge which could no longer be the privilege of a few hereditary groups while the newspaper made people in different parts of the far-flung country realize that they had common bonds, and the events happening in the world outside influenced their lives for good or ill".

ব্রিটিশ আমলের সময় থেকেই আরেকটি শক্তি যা পশ্চিমীকরণের ভিতকে শক্ত করার ক্ষেত্রে অনবরত কাজ করে চলেছে, তা হল খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারকদের কাজ। খ্রিস্টান মিশনারিরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করে আদিবাসী ও অস্পৃশ্যদের দ্বারা অধ্যুষিত অঞ্চলে কাজ করেছিল। দেশের পিছিয়ে পড়া অংশগুলি এইভাবেহ পশ্চিমীকরণের সান্নিধ্যে এসেছে।

সমসাময়িক ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে, যখন আমরা পশ্চিমীকরণের কথা বলি, পশ্চিমীকরণ বিরাট পরিবর্তন এনেছে গ্রামীণ ভারতীয় প্রেক্ষাপটে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে গ্রামের মানুষকে নিয়ে এসছে যোগাযোগের ব্যবস্থার বিস্তৃত সীমার মধ্যে যা গ্রামগুলিকে আধুনিকীকরণের পথে অগ্রসর হতে সাহায্যে করেছে। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান যেমন পঞ্চায়েতি রাজ, শিক্ষার ব্যাপক প্রসার গ্রামবাসিদের পশ্চিমীকরণের দিকে নিয়ে এসেছে।

সংস্কৃতায়ণ ও পশ্চিমীকরণ ধারণার মধ্যে যা আকর্ষণীয় হল তা হল পূর্বেরটি বর্ণাশ্রমের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় এবং পরেরটি বর্ণপ্রথার বাইরে পরিলক্ষিত হয়।

বৈশিষ্ট্য (Characteristics)

1. মানবতাবাদের প্রবর্তন (Humanitarianism)

পশ্চিমীকরণের প্রভাব বলতে কতকগুলি মৌলিক মূল্যবোধের প্রবর্তনকে বোঝায়। এ রকম একটি মুখ্য মূল্যবোধ হল 'মানবিকতাবাদ' (Humanitarianism)। মানবিকতাবাদ বলতে জাতি, ধর্ম, নারী-পুরুষ, বয়স, অর্থনৈতিক অবস্থা নির্বিশেষে সকল মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ সাধানের জন্য সক্রিয় প্রচেষ্টা। "A most important value, which in turn subsumes several other values, is what may be broadly characterised as humanitarianism, by which is meant an active concern for the welfare of all human beings, irrespective of caste, economic position, religion, age and sex". ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ব্রিটিশ সরকার মানবিকতাবাদী, বিবিধ সংস্কারমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। ব্রিটিশ আমলে ভারতে মানবিকতাবাদ ও যুক্তিবাদ ক্রমান্বয়ে অধিকতর ব্যাপক, গভীর ও শক্তিশালী হয়েছে। শ্রীনিবাস যুক্তি দিয়েছেন, 'মানবতাবাদ' শব্দের পরিধিব্যাপক। এটির অন্যান্য অংশের সাথে যুক্ত হয়েছে মূল্যবোধ, যেখানে প্রাধান্য পাচ্ছে সকলের কল্যাণ।

2. সমতাবাদ (Equalitarianisw)

পশ্চিমকরণের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সমতাবাদ। এর গণতান্ত্রিক মূল্য অপরিসীম। সমতাবাদ বৈষম্য হ্রাস করতে, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সকলের স্বাধীনতার জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। মানবতাবাদ যেমন পশ্চিমীকরণের বৈশিষ্ট্য ঠিক তেমনি সমতাবাদ সমসত্ত্ব সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

3. ধর্মনিরপেক্ষতা (Secularism)

ব্রিটিশ সরকার ও পরবর্তীকালে ভারতীয় সংবিধান ভারতকে ধর্ম নিরপেক্ষদেশ হিসাবে অভিষিক্ত করে। যুক্তিবাদী ও আমলাতান্ত্রিক সমাজে ভারতবর্ষকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ জাতি হিসাবে কল্পনা করা হয়। সমাজে অবস্থিত সকল ধর্মগুলির প্রতি রাষ্ট্রের সকলের শ্রদ্ধা থাকা প্রয়োজন।

4. সামাজিক সংস্কারের সূচনা

ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা, ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় অবস্থিত সামাজিক কুফল যা ভারতীয় সমাজকে ধ্বংস করছিল, তার বুকে কঠোরভাবে আঘাত হানে। বৈষম্য সৃষ্টিকারী হিন্দু ও মুসলিম আইন শাস্ত্রের অংশগুলিকে ব্রিটিশ সরকার আইন প্রবর্তন করে তার পতন ঘটান। সতীদাহ প্রথা, অস্পৃশ্যতা, পর্দা প্রথা ইত্যাদির অবসান ঘটিয়ে পশ্চিমীকরণ সাম্যবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষকরণের সূচনা ঘটিয়েছিল।

5. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রাধান্য

ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা ভারতীয় সমাজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রচলন করে। রেল, বাষ্পইঞ্জিন এবং প্রযুক্তি ভারতের মানচিত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটায়। এর ফলে ভারতীয় সমাজ শিল্পায়ণের দিকে আগ্রহী হয়ে ওঠে। যদিও শিল্পায়ণ গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় আঘাত হানে, ও নগরায়ণ ত্বরান্বিত হয়। গ্রাম থেকে লোকজন শহরের প্রতি ধাবিত হয় ও শহরে অভিবাসনও বাড়ে। এই সময়

ভারতীয় সমাজ ঐতিহ্য থেকে আধুনিকতার প্রতি উৎসাহী হয়ে উঠছিল। শিল্পায়ণ ও নগরয়ণের যুগ্ম প্রভাবে সমাজে নতুন মূল্যবোধের সূচনা হয়। ঐতিহ্যবাহী অনেক প্রতিষ্ঠানকে অস্পৃশ্য ও বর্ণের মত ব্যাথায় অ্যাখারিত করা হয়।

স্পষ্টতই, পশ্চিমীকরণ ধারণাটির মাধ্যমে M. N. Srinivas ব্রিটিশি আমলে ভারতীয় সমাজে যে পরিবর্তন এসেছিল তাকে বোঝাতে চেয়েছেন। স্বাধীন পরবর্তী ভারতবর্ষে পশ্চিমীকরণ ত্বরান্বিত হয়েছিল। ভারতীয় সমাজ অন্যান্য দেশের সংস্পর্শে এসেছিল। এছাড়াও মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের সমাজ ব্যবস্থা আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় গভীর প্রভাব ফেলেছিল। পরবর্তী পর্যায়ে শ্রীনিবাস আধুনিকায়নের প্রভাবের দিকে তাকিয়ে ধারণাটির পর্যালোচনা করার পরামর্শ দিয়েছেন। জানিয়েল লার্নার পশ্চিমীকরণ এবং আধুনিকীকরণের মধ্যে আধুনিকীকরণকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন।

আধুনিকীকরণের মধ্যে নগরায়ণও অন্তর্ভুক্ত ছিল। আধুনিকীকরণ প্রচার মাধ্যম ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের সক্রিয়তা অনেকাংশে বাড়িয়ে দিয়েছিল। "Modernization also implies social mobility. A mobile society has to encourage nationality for the calculus of choice which shapes individual behaviour and condition it rewards. People come to see the social future as manipulable rather than ordained and their prospects in terms of achievement rather than heritage."

আমরা যদি শ্রীনিবাসের সংস্কৃতিকরণ ও পশ্চিমীকরণের ধারণা প্রত্যক্ষ করি, দেখব, গ্রামীণ পরিবর্তনের মূল্যায়ণে পশ্চিমীকরণের তেমন উল্লেখযোগ্য প্রভাব নেই। সংস্কৃতায়ণ ও পশ্চিমীকরণের মূল্যবোধের আধিপত্য বেশি। এগুলো নির্দিষ্ট কিছু মতাদর্শও বহন করে। যোগেন্দ্র সিং যুক্তি দেন পশ্চিমীকরণ শব্দটির ব্যবহার ভারতীয় অভিজাতদের জন্য নিন্দনীয়। পশ্চিমীকরণের জায়গায় আধুনিকীকরণকে বেশি গ্রহণায় বলে মনে করেছেন। তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন—

..... modernization in India cannot be adequately accounted for by a term like westernization. Moreover, for many new elite in India as also in the new states of Asia, the term westerization has a pijorative connotation became of its association with former colonial domination of these country by the west. It is, therefore, more value loaded than the term modernization which to us apears a better substitute.

5.4.3 বিশ্বায়ণ (Globalisation)

'বিশ্বায়ণ' শব্দটি সমাজবিজ্ঞানীদের হাত ধরে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছে। যদি অর্থনীতি বিশ্বায়ণকে ত্বরান্বিত করে তবুও এর সমাজতাত্ত্বিক গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। উদাহরণ হিসাবে, George Ritzer বলেছেন বিশ্বায়ণ খুব দ্রুতগতিতে বিশ্বব্যাপী সমাজের একাত্মকরণ ও সমাজ এবং সংস্কৃতির পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে বৃদ্ধি করেছে। Scholte বিশ্বায়ণকে বলেছেন deterritorialization যার অর্থ হল আঞ্চলিকতা মুক্ত পৃথিবী বা বলা যেতে পারে 'superterritorial' আঞ্চলিকতার বহুল বিস্তৃতি

যা বিশ্বের সব মানুষকে পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ করতে সাহায্য করেছে। বিশ্বায়ণ বলতে সমাজের সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন বোঝায়, Albow বিশ্বায়ণ বলতে গিয়ে বলেছেন, "all those process by which the peoples of the world are incorported into a single society, global society." Ronald Robertson এর ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, "Globalisation as a concept refers both to the compression of the world and the intensification of conciousness of the world as a whole".

Anothony Guiddens বলেছেন, "Globalisation can thus be defined as the intensification of worldwide social relartions which link distant localities in such a way that local local happenings are shaped by events occuring many miles away and vice versa."

Water বিশ্বায়ণ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেন, "a social process in which the constraints of geography on economic, political, social and cultural arrangements recede, in which people become increasingly aware that they are receding and in which people act accordingly."

Held সহ অন্যান্যরা বলেছেন, "Globalization can be thought of a process (or set of processes) which embodies a transformationin the spatial organization of social relations and transactions — assessed in terms of their extensity, intensity, velocity and impact generating transcontinehtal or interregional flows and networks or activity, interaction and the exercise of power". V. Beack, 'globality' 'globalism' এবং 'globalization' মধ্যে পার্থক্য নিরুপণ করতে গিয়ে বলেছেন— 'globality' বলতে বোঝায় ব্যক্তিবিশেষ যখন পৃথিবী নায়ক সমাজে বসবাস করে। যার ফলে কাটাতারের বেঁড়া, দেশের পরিসীমা ক্রমশ ফিঁকে হয়ে যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য 'globalism' দেখা হয় পৃথিবীকে একটি বাজার হিসাবে (world market) যেটি যথেষ্ট শক্তিশালী (স্থানীয় ও জাতীয় এবং যেটা রাজনীতি ও রাজনৈতিক দ্বারা নির্ধারিত হয়। আর বিশ্বায়ণ হল 'the process through which sovereign national states are criss crossed and undermined by transational actors and varying prospects or power, orientation indentities and networks".

বিশ্বায়ণের বৈশিষ্ট্য (Distinctive Characteristics of Globalisation)

1. সীমান্তহীন বিশ্ব (Borderless World)

বিশ্বায়নের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল 'সীমান্তহীন' বিশ্বের ধারণা। ধারণাটি এসেছে "borderless world" যার রাজনৈতিক অর্থ হল "deterritorialization". "Deterritorilization" এর অর্থ হল যে সব আঞ্চলিক উপাদানসমূহ বিশ্বায়ণের উপর আঘাত হানে, তার গুরুত্বকে খর্ব করে দেওয়া, সারা পৃথিবীকে একটি ক্ষুদ্র গোলকে পরিণত করে

দেওয়া। যে আঞ্চলিক ব্যবস্থা, দেশের ভৌগলিক গঠন ও সীমা এবং এর বিভিন্ন উপাদান শত শত বছর ধরে দেশের মৌলিক উপাদান, পরিচিতি তৈরি করেছে। বিশ্বায়নের প্রভাবে প্রভাবিত দেশগুলি সেই মৌলিক কাটামোয় পরিবর্তন অনুভব করে। বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন পণ্য, সেবা এবং অর্থ ও তথ্যের আদান প্রদান ঘটছে। আন্তর্জাতিক ভ্রমণ, কৃষ্টি, ঐতিহ্য সংযোগ সাধনকরে আজ জীবনের সাধারণ দিকগুলিকে তুলে ধরেছে। কিছু বিশ্লেষক মনে করেন যে বিশ্বায়ণ বিশ্বায়ণ দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যকে অনেকাংশ ঝাপসা করে দিয়ে 'borderless world' বাড়াতে অনেকাংশ সাহায্য করেছে। সুতরাং, বিশ্বায়ণ ভূ-রাজনৈতিক সীমানার পতন ঘটায় ও জাতির মদ্যে দূরত্ব সংকুচিত করে। বিশ্বায়ণের এটিই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

2. উদারনীতিকরণ (liberalisation)

বিশ্বায়ণ ও উদারনীতিকরণ সম্পর্কটি একে অপরের সাথে ওতপ্রতোভাবে জড়িত। উদারনীতিকরণ / উদারীকরণ বিশ্বায়ণকে ত্বরান্বিত করেছে। উদারীকরণের মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতিগুলি শিথিল হয়েছে এবং বিশ্বঅর্থনীতির সাথে দেশের অর্থনীতি আজ এক মঞ্চে উপস্থিত। বিশ্বায়ণ ও উদারীকরণ উভয়ের ফল হল আধুনিকীকরণ, উদারীকরণ হল শিল্প, অর্থনীতিকে মুক্তকরণের এক প্রক্রিয়া। বিনিয়োগ, আর্থিক লেনদেন, ব্যবসা, রপ্তানি ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিধিনিষেধের অপসারণ বোঝায়। উদারীকরণ সাধারণত ব্যাণিজ্য, অর্থনীতি বা পুঁজিবাজারের সাথে সম্পর্কিত। বাণিজ্য উদারীকরণ বলতে বোঝায়, আমদানি বা রপ্তানির উপর বিধিনিষেধ কমানো ও মুক্ত বাণিজ্য সহজতর করা। অর্থনৈতিক উদারীকরণ বলতে সাধারণত, বিশেষ করে বেসরকারী সত্ত্বাকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অংশ গ্রহণের অনুমতি দেওয়াকে বোঝায় এবং মূলধন বলতে ঋণ ও শয়ার বাজারের উপর আরোপিত বিধিনিষেধকে হ্রাস করা বোঝায়। এইভাবে উদারীকরণ শিল্পপতি / ব্যবসায়ীকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যথেষ্ট স্বাধীনতাপ্রদান করে। উদারনীতিকরণ নীতি ছাড়া বিশ্বায়ণ সম্ভব নয়।

3. মুক্ত বাণিজ্য (Free Trade)

মুক্ত বাণিজ্য উদার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূর্তপ্রতীক। সহজভাবে বলতে গেলে, বিশ্বায়ণ একটি প্রক্রিয়া হল যা বিচ্ছিন্ন আঞ্চলিক ধারণা থেকে সমষ্টিগত বিশ্বের তাৎপর্য্যকে ত্বরান্বিত করে। বিশ্বায়ণ একটি দীর্ঘ মেয়াদী প্রক্রিয়া যা অর্থনীতি, রাজনীতি, ধারণা, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের বৃহত্তর পরিবর্তন ঘটায়। আন্তর্জাতিক পূর্বোল্লিখত ক্ষেত্রগুলিতে সহযোগিতার মাধ্যমে মূল্যবোধ ও জ্ঞানের বিনিময়ের মাধ্যমে বিশ্বায়ণকে ত্বরান্বিত করে। দেশগুলির মধ্যে অবাধ বাণিজ্য, সীমান্তের মধ্যে পুঁজির সহজ চলাচল, বিদেশী বিনিয়োগের মাধ্যমে অবাধ বাণিজ্যনীতির পথ সুপ্রশস্ত হয়। এর ফলে ছোট ব্যবসা ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলির বৃদ্ধি হয়, বিশ্বজুড়ে নতুন বাজারের সৃষ্টি হয়। যা দেশ ও মহাদেশগুলির মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরোও উন্নত করে তোলে।

4. অর্থনৈতিক কার্যকলাপের বিশ্বায়ণ (Globalization of Economic Activities)

এই প্রক্রিয়ার ফলে বিশ্বায়ণ আরোও প্রসারিত হয়, এর গতি, তীব্র হয় ও বিশ্বব্যাপী আন্তঃসংযোগ

বাড়ে। এটি পরিবর্তনের চারটি ধরণ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়—

প্রথমতঃ, এটি সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে সীমান্ত, অঞ্চল ও মহাদেশের মধে আরোও সুদৃঢ় বন্ধন তৈরিতে সাহায্য করে।

দ্বিতীয়তঃ, এটির তীব্রতা ক্রমবর্ধমান মাত্রা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

তৃতীয়তঃ, এটি বিশ্বব্যাপী মিথষ্ক্রিয়া ও প্রক্রিয়াগুলির গতি বৃদ্ধির সাথে যুক্ত করা যেতে পারে, যেমন বিশ্বব্যাপী পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার বিকাশ ঘটায় ও তাকে ত্বরান্বিত করে। পারস্পরিক ধারণা, পণ্য, তথ্য, অভিবাসন, সংস্কৃতি প্রভৃতির আন্তঃসংযোগ প্রবাহ বাড়ায়।

এবং চতুর্থ, এটি বিশ্বব্যাপী সংযোগ, মিথষ্ক্রিয়ার গতি বাড়াতে সাহায্য করে। এই অর্থে, দেশীয় বিষয় ও বৈশ্বিক বিষয়গুলির মধ্যে সীমানা ক্রমবর্দ্ধমান হয়ে ওঠে। তরল বিশ্বায়ণ বলতে বিশ্ব অর্থনীতির ক্রমবর্দ্ধমান আন্তঃনির্ভরশীলতাকে বোঝায়।

নিম্নে অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য ছাড়া আরোও যে সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্বায়ণের আছে তা উল্লেখ করা হল—

1. বিশ্বায়ণ একটি সার্বজনীন প্রক্রিয়া হলেও সবক্ষেত্রে এর প্রভাব সমান নয়। এটি একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াও।
2. বিশ্বায়ণ উন্নয়ণমূলক হওয়ার সাথে সাথে সমাজের জন্য ক্ষতিকারক প্রক্রিয়া।
3. বিশ্বায়ণ একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া।
4. বিশ্বায়ণ একটি অপরিবর্তনীয় প্রক্রিয়া।
5. বিশ্বায়ণ সঙ্করজাত, একাজাতিকরণ ও সম্বন্বায়ক প্রক্রিয়া
6. বিশ্বায়ণ বিচ্ছুরণের দিকে পরিচালিত করে।
7. বিশ্বায়ণ একটি বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া।
8. বিশ্বায়ণ আদ্যপ্রাপ্ত একটি প্রক্রিয়া (Top down prcess)।
9. বিশ্বায়ণ একটি বিরাষ্ট্রীকরণ প্রক্রিয়া

বিশ্বায়ণের মাত্রা (Dimension of Globalisation)

1. বিশ্বায়ণের অর্থনৈতিক মাত্রা।
2. বিশ্বায়ণের সামাজিক মাত্রা।
3. বিশ্বায়ণের রাজনৈতিক মাত্রা।

4. বিশ্বায়ণের প্রযুক্তিগত মাত্রা।
5. বিশ্বায়ণের সাংস্কৃতিক মাত্রা।
6. বিশ্বায়ণের সার্বিকমাত্রা।

বিশ্বায়ণের পক্ষে যুক্তি (Arguments in favour of Globalisation Include)

- যে সব দেশের অর্থনীতি বিশ্ব অর্থনীতির সাথে বেশি জড়িত তাদের অর্থনৈতিক কাঠামো অন্যান্য দেশের তুলনায় যারা বিশ্ব অর্থনীতির সাথে জড়িত নয়, তাদের থেকে প্রায় গড়ে 25% বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে খুব দ্রুত হয়েছ ও মানুষের জীবনযাপনের মাত্রাও উন্নত হয়েছে। উন্নত সম্পদ, উন্নত স্বাস্থ্য সেবা, বিশুদ্ধ পানীয় সবই বিশ্বয়ণের ফল।
- দেশে বিদেশী বিনিয়োগ বেড়েছে এবং দেশের অগ্রগতিতে ইন্ধন জুগিয়েছে।
- বিশ্বায়নের ফলে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে, দেশগুলির মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বৃদ্ধি পেয়েছে। উন্নতদেশগুলির আধিপত্য হ্রাস পেয়েছে, যুদ্ধভীতি হ্রাস হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
- উন্নত প্রযুক্তিব্যবস্থা দ্রব্যমূল্যের দামের হ্রাস ঘটিয়েছে এবং পৃথিবীর যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এসেছে।
- বয়স্ক লোকদের স্বাক্ষরতার হারও বৃদ্ধি পেয়েছে।
- গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আধুনিক যোগাযোগ এবং বিশ্বব্যাপী বিস্তার অগণতান্ত্রিক শাসনকে পতনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।
- বহুজাতিক সংস্থাগুলি উন্নত কার্যক্ষেত্র ও ভালো পারিশ্রমিক দিচ্ছে দেশীয় সংস্থাগুলির থেকে।
- আন্তর্জাতিক অভিবাসন সাংস্কৃতিক মিথস্ক্রিয়াকে আরোও ত্বরান্বিত করেছে। অন্য সংস্কৃতির প্রতি সম্মানবোধ তৈরি করে যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আরোও সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

বিশ্বায়ণের বিরুদ্ধে যুক্তিগুলির মধ্যে আছে—

বিশ্বায়ণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক খরচ খুব বেশি, ফলে বিশ্বায়ণের সুবিধা নিতে অক্ষম দেশগুলি আরও পিছিয়ে পড়ে।

- বিশ্বব্যাপী ধনী দরিদ্রের বিভাজন বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- বাণিজ্য ও ভ্রমণের বিস্তারের ফলে AIDS এর মত রোগগুলির বিস্তার বেড়েছে।
- দেশগুলির বর্ধিত পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৃহত্তর দুর্বলতা দেখা দিয়েছে। যেমন— সারা বিশ্বজুড়ে মন্দার বাজার তৈরি হয়েছে।
- জাতিগুলির স্বয়ংসম্পূর্ণতা হ্রাস পেয়েছে।

- বিশ্বায়ণের ফলে পরিবেশের অনেক হানি হয়েছে। উন্নত দেশগুলি কাঁচামালের উৎস হিসাবে অনুন্নত দেশগুলির পরিবেশকে নির্বিচারে ধ্বংস করেছে। এখন পর্যন্ত আবাস যোগ্য গ্রহ পৃথিবীকে বিশ্বায়ণ ধীরে ধীরে বসবাসের জন্য অযোগ্য অনিরাপদ আশ্রয়ে পরিণত করেছে।
- প্রধান অর্থনৈতিক শক্তিগুলি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে উন্নয়ণশীল বিশ্বের উপর আধিপত্য স্থাপন করেছে। সারা বিশ্বজুড়ে একধরনের অর্থনৈতিক উপনিবেশ স্থাপনের কাজ চলছে। তারা উন্নয়ণশীল দেশগুলিকে নিজের অংশীদার হিসেবে নয়, পরজীবী হিসাবে বিবেচনা করে।
- বাণিজ্যের উদারীকরণ বোকরত্বকে আরোও কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা, অভিবাসনের চাহিদা বাড়িয়ে দিয়েছে। কাজের খোঁজে কম উন্নয়ণশীল দেশগুলি থেকে বড় সংখ্যার মানুষ কাজের আশায় উন্নত দেশগুলিতে পাড়ি দিচ্ছে ফলে আরও বেশি মানব পাচার বাড়চ্ছে।
- বিশ্বায়ণ 'Brain Drain' কে আরোও ধ্বনি ত্বরান্বিত করছে।
- আধুনিক সমাজে বিশ্বায়ণের ফলে আদিবাসী ও জাতীয় ভাষা ও সংস্কৃতিগুলো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।
- বিশ্বায়ণের ফলে সীমান্ত সন্ত্রাস, পাচার ইত্যাদি বহুল পরিমাণে বেড়েছে।

5.5 সামাজিক যোগোযোগ : আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক

সামাজিক যোগাযোগ বলতে মৌখিক, অমৌখিক সংকেতের ব্যবহার, সামাজিক মিথস্ক্রিয়া এবং সামাজিক জ্ঞান বোঝায়। সমাজে অবস্থিত দুটি মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সামাজিক যোগাযোগের গুরুত্ব অপরিসীম। দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে সামাজিক বিনিময়কে সামাজিক যোগাযোগ বলে। এই যোগাযোগ গুলির উপর ভিত্তি করে সামাজিক কাঠামো ও সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। যোগাযোগের মাধ্যমে তৈরি সামাজিক নিয়ম নীতি, সংস্কৃতির পরিবেশে আমরা বেঁচে থাকি। সামাজিক যোগাযোগ সমাজের মৌলিক উপাদান। সমাজের অস্তিত্ব সামাজিক যোগাযোগের মধ্যে নিহিত থাকে। দুটি মানুষের সামাজিক সম্পর্কের উপর সামাজিক যোগাযোগ কিছু নির্দিষ্ট প্রভাব তৈরি করে, যা মানুষের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। এটি মানুষের মধ্যে মানসিক সম্পর্ক স্থাপন করে। যোগাযোগ মৌখিক হতে পারে বা বিভিন্ন শারিরীক ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে যেমন শরীরের নড়াচড়া, মুখের অভিব্যক্তি, অঙ্গভঙ্গি চোখের যোগাযোগ ইত্যাদি।

যোগাযোগ দুই প্রকার—

(i) আনুষ্ঠানিক সামাজিক যোগাযোগ (Formal Communication)

(ii) অনানুষ্ঠানিক সামাজিক যোগাযোগ (Informal Communication)

5.5.1 আনুষ্ঠানিক সামাজিক যোগাযোগ (Formal Communication)

পূর্বনির্ধারিত নিয়মাবলী, মাধ্যমের দ্বারা অফিসিয়াল তথ্যের প্রবাহকে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ বলা হয়। তথ্যের সরবরাহ নিয়ন্ত্রিত করা হয় এবং তা সুনির্দিষ্ট প্রচেষ্টার মাধ্যমে সঠিকভাবে সরবরাহ করা হয়। আনুষ্ঠানিক সামাজিক যোগাযোগ একটি শ্রেণীবদ্ধ কাঠামো অনুসরণ করে ও আদেশের পালাক্রমে পালন করা হয়। বিভিন্ন বিভাগের সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মীদের ও নেতাদের থেকে কাঠামোটি সাধারণত উপরে থাকে যা সংস্থার নিম্নস্তরের কর্মীদের মাধ্যমে নিচে চলে যায়। কর্মচারীরা তাদের দায়িত্বপালন করার সময় আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ চ্যানেল অনুসরণ করতে বাধ্য থাকে। আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ কার্যকরী বলে বিবেচিত হয় কারণ, এটি একটি সময় উপযোগী ও পদ্ধতিগত যোগাযোগ ব্যবস্থা।

5.5.2 অনানুষ্ঠানিক সামাজিক যোগাযোগ (Inormal Communication)

তুলনামূলকভাবে, অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ বলতে বোঝায় বহুমাত্রিক যোগাযোগ। অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ অবধি এবং তা কোন নিয়মের দ্বারা আবদ্ধ নয়। অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ দ্রুত, প্রকৃত, অনেক বেশি সম্পর্কযুক্ত এবং যোগাযোগের খুব স্বাভাবিক রূপ। মানুষ একে অপরের সাথে অবাধে যোগাযোগ করতে পারে এবং অন্তঃরঙ্গতার পরিবেশ গড়ে ওঠে। তারা পরস্পরের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারে ও যা কাজের জগতের বাইরেও সম্প্রসারিত। অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ প্রকৃতিতে সহজাত। এটি উৎপাদনশীলতা গড়ে তুলতে সাহয্য করে এবং কর্মীদের মধ্যে সুস্থ সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

এখানে আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের কিছু পার্থক্যের সংক্ষিপ্ত তালিকা তুলে ধরা হল—

- আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ হল নির্ভরযোগ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা যেহেতু একটি কাগজের পথ আছে। এর তুলনা, অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ হল তুলনামূলক কম নির্ভরযোগ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা কারণ এর কথা কাগজে লেখা অসম্ভব।
- আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ধীর, আমলাতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে এটি কখনও কখনও অসহনীয়ভাবে ধীর। অন্যদিকে অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ খুব দ্রুত এবং প্রায়শই তাৎক্ষণিক।
- বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সম্বন্বয়ে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ সম্পূর্ণ করা হয়, যেখানে অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের জন্য প্রয়োজন খুবই সামান্য প্রক্রিয়া।
- আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের মাধ্যমে তথ্য শুধুমাত্র পূর্বনির্ধারিত যোগাযোগ পদ্ধতির মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়। যেখানে অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ মাধ্যমে তথ্য অবাধে চলে।

- আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের সাথে গোপনীয়তা বজায় রাখা হয়, যেখানে অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ ব্যক্তির উপর নির্ভরতার কারণে সম্পূর্ণ গোপণীয়তা বজায় রাখা কঠিন হয়ে ওঠে।

আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের ধরন

- স্মারকলিপি
- ব্যক্তিগত যোগাযোগ ব্যবস্থা
- মিটিং
- সম্মেলন
- একজনের সাথে একজনের মুখোমুখি আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎ।
- সংবাদ।
- চিঠিপত্র
- উপস্থাপনা
- বৃক্তৃতা
- নোটিশবোর্ড
- সাংগঠনিক ব্লগ
- ম্যানেজার ও নেতাদের ইমেল

অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগের ধরন

- পরচর্চা
- Single Strand — কোন ফর্ম ফিলাপের মাধ্যমে তথ্যের আদান প্রদান
- Probability Chain — একজন ব্যক্তি অন্যকে একই তথ্য আদান প্রদান করে।
- Cluster — এক গোষ্ঠী থেকে কোন খবর অন্য গোষ্ঠীতে ছড়িয়ে যায়।

5.6 সারাংশ

এই অধ্যায়ে আমরা সমাজের ধারণা, প্রকৃতি ও পরিধি নিয়ে আলোচনা করেছি। এর পাশাপাশি সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় শিক্ষার ভূমিকা নিয়েও আলোচনা করেছি। সংস্কৃতায়ণ, পাশ্চাত্যয়ণ ও বিশ্বায়ণের বিষয় এবং তাদের ভূমিকা নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। সর্বশেষে সামাজিক যোগাযোগ কি ও তার ধরন নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

5.7 স্বমূল্যায়ণ প্রশ্নাবলী

1. সামাজিক পরিবর্তন কি?
2. সামাজিক পরিবর্তনের কারণগুলি কি কি?
3. সামাজিক পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় শিক্ষার ভূমিকা কি?
4. সংস্কৃতীকরণ ধারণাটি কার দ্বারা বিকশিত হয়েছিল?
5. সংস্কৃতকরণ কি?
6. সামাজিক পরিবর্তনে সংস্কৃতকরণের প্রভাব কি?
7. সংস্কৃতীকরণের যেকোন দুটি প্রভাব লেখ।
8. বিশ্বায়ণ কি?
9. বিশ্বায়ণের কারণগুলি কি কি?
10. সামাজিক পরিবর্তনের উপর বিশ্বায়ণের প্রভাব কী?
11. বিশ্বায়ণের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখ।
12. সামাজিক যোগাযোগ কি?
13. আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ বলতে আপনি কি বোঝেন?
14. অনানুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের যেকোন দুটি পার্থক্য উল্লেখ কর।

5.8 অভিসম্বন্ধ (Reference)

Bhattacharya, D. C (1996). Sociology (6th ed.) Cacutta Vijoya Publishing House.

Garvey, J (2019). Blog Employees (Web Blog Post) Retrieved from https://www.peoplegoal.com/blog/what-is-formal-and-informal-communication

Mondal. P (Year?) Westernization : Origin and characteristics of Westernization Retrieved from : https://www.yourarticlelibrary.com/sociology/rural sociology/westernisation-orgin-andcharacteristic-of-westernisation/31941

Rao, Shakar, C.N. (2012) Sociology (7th ed.). Mangalore Karnataka : S. Chand & Company Pvt. Ltd.

Y. K. (2016) Foundation in Sociology of Education. Delhi : Kanishka Publishers.

একক 6 ❑ ভারতীয় সামাজিক নীতি

গঠন

6.1 উদ্দেশ্য

6.2 ভূমিকা

6.3 বহুত্ববাদী সমাজ হিসাবে ভারতবর্ষ

6.4 সামাজিক বৈচিত্র্য এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি

6.5 শিক্ষা এবং সমসাময়িক সামাজিক সমস্যা

6.5.1 জনসংখ্যা বিস্ফোরণ

6.5.2 বেকারত্ব

6.5.3 দারিদ্র্যতা

6.5.4 নিরক্ষরতা

6.6 সারাংশ

6.7 স্ব-মূল্যায়ণ প্রশ্নপত্র

6.8 অভিসম্বন্ধ

6.1 উদ্দেশ্য

এই একক পড়ার পর ছাত্র-ছাত্রীরা সক্ষম হবে—

- বহুত্ববাদী সমাজ বলতে কি বোঝায়
- বৈচিত্র্য ও অন্তভুক্তিকরণের ধারণা বুঝতে সাহায্য করবে
- সমসাময়িক সমস্যাগুলিকে চিনতে, বুঝতে ও অনুধাবন করতে সাহায্য করবে।

6.2 ভূমিকা

ভারতবর্ষ সেই অতীতকাল থেকেই প্রকৃত অর্থে এক বহুত্ব বিশিষ্ট সমাজ। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য এই ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন বৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন, বহুধর্ম ও বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মানুষগণ ভারতের অখন্ড রূপকে তুলে ধরেছে। বিভিন্ন বৈদেশিক শক্তির আক্রমণ মুঘল

শাসন ও ব্রিটিশ শাসনের অধীনস্ত থেকেও ভারতবর্ষের বাসিন্দাগণ জাতীয় ঐক্য ও অখন্ডতা বজায় রেখেছেন। বহিঃশত্রুর আক্রমণ, বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষের পরিমাণ ভারতের ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মকে সমৃদ্ধ করেছে এবং এক জীবন্ত সংস্কৃতিতে পরিণতকরেছে। ভারতীয় সমাজে শুধুমাত্র ভাষাগত ধর্মীয় বা জাতিগত বৈচিত্র্য নেই। সেই সাথে জীবনযাপনের ধরন, খাদ্যাভাস, জমি বন্দোবস্ত পোষাক পরিচ্ছদ, জীবিকা, সামাজিক আইন, জন্মরীতি ও মৃতদেহ সৎকারের ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য বর্তমান। স্বাধীনোত্তর পর্বে ভারত সরকারের কাছে সবথেকে বড়ো চ্যালেঞ্জ ছিলো স্থানগত, সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এই বৈচিত্র্যকে বাঁচিয়ে রেখেই দেশের অখণ্ডতা বজায় রাখা। ভারতবর্ষ এই প্রকৃত অর্থেই ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র, স্বাধীনতার পরেই দারিদ্র্য দূরীকরণ ও নিম্নবর্গীয় মানুষের ক্ষমতায়ম-এর উদ্দেশ্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও অন্যান্য উন্নয়ণশীল প্রকল্প গৃহীত হয়। এই এককে এইসকল বিষয়ে আমরা বিস্তারিত জানবো।

6.3 ভারতের বহুত্ববাদী সমাজ

বহুত্ববাদী সমাজ এমন এক ধরনের সমাজ যে সমাজে বহু ভাষাভাষী, সংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ভাবধারায় মানুষ বর্তমান। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে বিদ্যালয়ের শ্রেণীগুলিতে বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ভাষাভাষি ছাত্র-ছাত্রীরা একসাথে লেখাপড়া করে। অধিকাংশ সমাজ বিজ্ঞানীরা মনে করেন বহুত্ববাদী সমাজ পরিবেশ ও অর্থনীতির মধ্যে একটা ভারসাম্য রক্ষা করে কিন্তু ১৯৫৮ খ্রিঃ সমাজ বিজ্ঞানী স্মিথ এই ধরনের সমাজের সমালোচনা করেন। তার মতে বহুত্ববাদী সমাজে শুধু বৈষম্যকেই তুলে ধরে ঐক্যের বার্তা দেয় না। 1967 সালে ডাল থিওরীতে বলেন বহুত্ববাদী সমাজ শ্রম বিভাজন ও ক্ষমতার বিভাজনকে স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরেন। বহুত্ববাদী সমাজের সুবিধা হলো প্রত্যেকের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং অন্যান্য সিস্টেম এর মতো নতুন করে বিভাজনের জন্ম দেয় না।

শ্রেণী বিভাজন সর্বত্র একইরকম কিনা এই নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই বিতর্ক আছে, একদল মনে করেন যে বহুত্ববাদী সমাজের শ্রেণী বিভাজন অর্থনৈতিক পার্থক্যকে নির্দেশ করে, অপরদিকে অন্য বিজ্ঞানীরা মনে করে বহুত্ববাদী সম্বন্ধে মানুষ অর্থনৈতিক, শ্রেণীগত বা অন্যান্য বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও একত্রে বসবাস করেন।

ভারতবর্ষে বহুত্ববাদী সমাজে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিফলিত হয়। প্রায় 2400 ধরনের কাস্ট আছে ভারতীয় সমাজে, আছে বহু ধর্মও তবুও ভারতীয়রা একে অপরের সাথে এক ব্যক্তি হিসাবেই মেশে। আরও বলা যায় যে একই ইন্সটিটিউট এ বিভিন্ন ধর্মের লোক একসাথে কাজ করতে পারে। লেবানন-এ সিয়া ও সুন্নি দুই প্রধান মুসলিম গোষ্ঠীর সাথে খ্রিস্টানধর্মের মানুষগণ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে বসবাস করেন।

6.4 বিভিন্ন ধরনের সামাজিক বৈচিত্র্যতা

মূলতঃ জাতিগত, ধর্মীয় ও ভাষাগত পার্থক্যের উপর ভিত্তি করেই সামাজিক বৈচিত্র্য পরিবর্তত হয়। সরোকিমের মতে সামাজিক পার্থক্য মূলতঃ দুই ধরনের, যথা— আন্তঃগ্রুপ পার্থক্য এবং অন্তরগ্রুপ পার্থক্য। তাছাড়া সমাজিক পার্থক্য নিরুপন হয় যথাক্রমে ইউনিবাউন্ড গ্রুপ যেখানে একটি গ্রুপের সদস্যরা জাতি, সেক্স বা ধর্মের ভিত্তিতে একত্রিত হয়। তাছাড়া মাল্টি বাউন্ড যেখানে কয়েকটি ইউনিবাউন্ড গ্রুপ কতকগুলি মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে একত্রিত হয়, যেমন—কাস্ট, শ্রেণী ও উপজাতি। বিভিন্ন অন্তঃ শ্রেনীকে যখন উচ্চতর বা নিম্নতর এইভাবে নির্দেশিত করা হয় তখন তা অন্তরগ্রুপ বিভাজনের জন্ম দেয়, যেমন— ভারতীয় শ্রেনী ব্যবস্থা।

ভাষা ঃ

ভাষা হচ্ছে অন্যতম ঐক্যবদ্ধতার নিদর্শন। অন্য যেকোনো সামাজিক সূচকের থেকে ভাষা অনেক বেশী শক্তিশালী সূচক। কোনো এক সামাজিক গ্রুপের পরিচয় আরও বেশী শক্তিশালী হয়ে ওঠে যখন সেই গ্রুপের সদস্যরা সকলেই একই ভাষায় কথা বলেন। ভারতবর্ষে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যগুলি পুনর্গঠন ভাবা হলেও ভাষাগুলিও সমস্যা সম্পূর্ণরূপে দূর করা যায়নি। ভাষা ভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের সময় অল্প কিছু ভাষাকেই সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ শুধু আঞ্চলিক স্তরেই সীমাবদ্ধ থাকে। তিন ভাষা সূত্র সব রাজ্য একইরকমভাবে অনুসরণ করেনি। এছাড়া সংখ্যালঘুভাষার মানুষদের শিক্ষানীতি, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সুরক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থাও কোন রাজ্য করেনি। জাতীয়স্তরে সংঘবদ্ধতার জন্য, ভাষাগত দিকটাও নীতি-নির্ধারক কাঠামোর মধ্যে রাখতে হবে। ভারতীয় সংবিধান 15টি ভাষাকে প্রধান ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। প্রত্যেক প্রধান ভাষার আঞ্চলিক ও দ্বান্দ্বিক পার্থক্য রয়েছে। এছাড়াও প্রায় 227 ভাষা ও উপভাষা রয়েছে যা ভাষাগত ঐক্যবদ্ধতার অন্তরায়। এছাড়া উপলব্ধি ভাষাগত পার্থক্য পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে ভুগেছে।

ধর্ম ঃ

সামাজিক বন্ধন ও ঐক্যের জন্য ধর্ম এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ধর্ম বলতে সাধারণতঃ আমরা কোনো অতিপ্রাকৃতিক বিষয়ের উপর বিশ্বাসকে বোঝায়। ভারতীয় সভ্যতার আদিপর্ব থেকেই ধর্মকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। ভারতবর্ষ বহুধর্ম ভিত্তিক এক দেশ। ধর্ম সংস্কার আন্দোলন ভারতের সাংস্কৃতিক জগতের এক ভাষাঙ্গীক অংশ। 1961 সালে জনগননা অনুযায়ী মোট 7টি ধর্ম যথা হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ এবং অন্যান্য এই 7টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এছাড়া ইহুদী, পার্শী ও উপজাতি ধর্মের কথা বলা হয়েছে। রক্ষণশীলতা ও প্রণতি এই দুই বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন ধর্মের পার্থক্যকে তুলে ধরেছে। ধর্মান্তকরণ ভারতীয় সমাজে এক বিতর্কিত বিষয়। বর্তমানেও এই সমস্যা বিদ্যমান, বিশেষতঃ আদিবাসী সমাজে ধর্মান্তকরণ বিষয়টি বর্তমানে অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং কখনও কখনও সংঘর্ষের সূচনা করছে। অপরদিকে ধর্ম কোনো গ্রুপের আভ্যন্তরীণ শ্রেণী, ভাষা ও অন্যান্য পার্থক্যকে দূরে সরিয়ে সকলকে

ঐক্যের সূত্রে গাঁথে। এমনকি বাইরের থেকে আগত ধর্মগুলি যেমন ইসলাম, ইহুদী, পার্শী প্রভৃতি ধর্ম ক্রমশ ভারতীয় চরিত্র লাভ করেছে। হিন্দুধর্ম প্রধান ধর্ম হলেও অনান্যে ধর্ম একই সাথে পাশাপাশি তৈরী হয়েছে। ভক্তি ও সুফি আন্দোলন ধর্মীয় আদান প্রদানের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ভারতীয় সংবিধান সব ধর্মের প্রতি সম্মান দেখিয়ে ভারতবষকে এক ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ হিসাবে ঘোষণা করেছে। শুধু তাই নয় সব ধর্মের মানুষের এখানে নিজ ধর্ম পালনের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। জাতীয় নীতি ব্যবস্থা ও শিক্ষা ব্যবস্থায় একই ধর্ম নিরপেক্ষতার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে দেখা হয়।

জাতি ব্যবস্থা ঃ

জাত বা কাস্ট হচ্ছে এমন এক ব্যবস্থা সামাজিক সম্পর্ককে নির্ধারণ করে। ইহা ভারতীয় সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যা এন্ডোগামী, বংশানুক্রম পেশাগত দিক, শুদ্ধতাও অশুদ্ধতা ইত্যাদিকে প্রভাবিত করে। ইহা ভারতীয় সমাজের আভ্যন্তরীণ ভিত্তি এবং সামাজিক ভিত্তি বা ধর্মীয় অনুশাসনের বেড়াজালকে অতিক্রম করে গেছে। চতুাবর্ণাশ্রম ব্যবস্থা বিভিন্ন শ্রেনী সমন্বয়ে জাতি প্রথার উৎপত্তি ঘটিয়েছে। কাস্ট বংশানুক্রমিক এক ব্যবস্থা বংশানুক্রমিক হলেও জাত ব্যবস্থা কখনই স্থবির নয়। হাজার ধরনের গোষ্ঠী, উপগোষ্ঠী, উপঙ্গত কাস্টসিস্টেমের পরিবর্তন ঘটাতে সামাজিক বৈষম্যকে বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করেছে। কিছু সমাজ বিজ্ঞানী মনে করেন সামাজিক বিভাজকের দুটে ভিন্ন ধরন হলো কাস্ট এবং ক্লাস, কাস্টের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ক্লাস তৈরী হয়। যতই রূপান্তর বা পরিবর্তন থেকে কাস্ট সিস্টেম আজও ভারতী.য় সমাজে আদর্শের মতো বহমান। কাস্ট সিস্টেমের মধ্যেই লুকিয়ে আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনার উপাখ্যান। ভারতীয় সংবিধান শোষিত অনুশাচিত জাতি (SC) ও অনুশুচিত উপজাতি (ST) গুলিকে রক্ষা করার জন্য উপযুক্ত বিধান দিয়েছে।

উপজাতি ঃ

ভারতীয় উপজাতিগণ আমাদের সমাজ সংস্কৃতিতে এক অনন্য স্থান অধিকার করে আছে। 2001 সালের জনগণনা অনুসারে মোট জনসংখ্যার 4 শতাংশ উপজাতি। ভারতবর্ষে উপজাতি শব্দের অভিধাণিক অর্থ খুজে বের করা কঠিন। ইম্পেরিয়াল গেজেট অনুসারে উপজাতি তারাই শব্দের কখন নাম, কখন উপভাষা আছে, যারা এক এক জায়গায় বাস করে এবং অবশ্যই এন্ডোগমাস। উপজাতি বর্গের উপর সেইভাবে আজও গবেষণা হয়নি. কিছু জনের মতে ভারতবর্ষে ট্রাইব বা উপজাতি শব্দটি প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য তৈরী হয়েছে।

এই উপজাতিগণকে রাজ্য অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে ফলে এমনও হয়েছে যে একটি রাজ্যে একদল উপজাতি অনুসুচিত উপজাতির (ST) মর্যদা পেলেও অন্য রাজ্যে তারা তা পায়নি। এই উপজাতিগণ সাধারণ ভারতীয়দের থেকে পড়াশোনায় শত যোজন পিছিয়ে আছে। তাদের অনণ্য সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য অনান্য পিছিয়ে পড়া অনেক গোষ্ঠী থেকে তাদের আলাদা করেছে। এই উপজাতিগণের মধ্যে কোন কোন দল আজও আধুনিক সভ্যতার থেকে বহুদূরে সভ্য সমাজ থেকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে অবস্থান করছে। যেমন আন্দামানের জারোয়ারা আভার একদল আধুনিকতায় নিজেদের সজ্জিত করেছে, যেমন রাজস্থানের

মীনারা। এইসকল উপজাতি গণের মধ্যে ভাষাগত, বিবাহ বংশানুক্রম সাংস্কৃতিক, অবস্থানগত, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক পার্থক্য সুস্পষ্টভবে বিদ্যমান। উপজাতিদের মধ্যে জাতীয় থেকে আধুনিকতার প্রভাব অনেক বেশী আর তাই উপজাতিদের সমস্যাগুলি স্থানগত, রাজ্যগত এবং বিভিন্ন উপজাতি অনুসারে বিভিন্ন ধরনের।

লিঙ্গ ঃ

লিঙ্গ পুরুষ ও নারীর মধ্যে জৈব সামাজিক পার্থক্য নিরুপণ করে। লিঙ্গগত বৈষম্য হচ্ছে সমাজের সৃষ্টি যা বিভিন্ন বিপরীত বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর এবং ইহাকে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রী লিঙ্গ এই দুইভাগে বিভক্ত করেছে। লিঙ্গ বৈষম্য আসলে জৈব সামাজিক বৈষম্য যা সুপ্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় সমাজে প্রোথিত রয়েছে এবং সামাজিক সংগঠন রূপে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতা ও তার নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই লিঙ্গ বৈষম্যের বিষয়টি লুকিয়ে রয়েছে। এই লিঙ্গ বৈষম্য এক সামাজিক গ্রুপ থেকে অন্য সমাজিক গ্রুপে ভিন্ন রূপে বর্তমান। ভারতবর্ষে শিক্ষার মানোন্নয়ণের সাথে সাথেই লিঙ্গ বৈষম্যের বিষয়টি আরও প্রকট এবং গভীরতর হয়েছে। 2001 সালের জনগননা অনুসারে যেখানে পুরষ শিক্ষিতের হার 75.85% সেখানে স্ত্রীশিক্ষিতের হার মাত্র 54.16%। শিক্ষার প্রতি স্তরেই লিঙ্গ বৈষম্য বর্তমান। উদাহরস্বরূপ বলা যায় প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর মধ্যে 22 শতাংশ ফাঁক বর্তমান। লিঙ্গর ক্ষেত্রে লিঙ্গগত বৈষম্যের মূল কারণ ভারতীয় নারীদের সমাজে পশ্চাদপদ অবস্থা। যদিও ভারতীয় সমাজে নারীদের প্রতিক্ষেত্রেই পুরুষশাসিত সমাজের দ্বারা শোসিত হতে হয় তবে ইহা এক সামাজিক গ্রুপ থেকে অন্য সামাজিক গ্রুপে ভিন্নধর্মী। লিঙ্গবৈষম্য তীব্রতর হয় যখন এর সাথে শ্রেণী, কাস্ট, ধর্ম ও অন্যান্য বিভাজনমূলক বিভাগগুলি যুক্ত হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষায় স্কুল ছুটের থর উপজাতি মেয়েদের মধ্যে সবথেকে বেশী। একটি গ্রুপের বৈষম্য ক্রমে আঞ্চলিক বৈষম্যে পরিণত হতেপারে যদি ঐ বিশেষ গ্রুপেরসদস্য সংখ্যা ঐ অঞ্চলে সবথেকে বেশী হয়। তাই অঞ্চল অনুসারে আর্থসামাজিক বৈশিষ্ট্যের তারতম্য পরিলক্ষিত হয় যদিও অঞ্চল কোনো সামাজিক শ্রেণীবিভাগ নয়। যেমন— উত্তরাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চল আর্থিক ও শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে কারণ এই অঞ্চলে সবথেকে বেশী পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর লোক বাস করেন। বিভিন্ন গ্রপের অন্তর বৈষম্য ও আন্তঃ বৈষম্য বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হবে। নিম্নলিখিত অধ্যয়ে শিক্ষার উপর সামাজিক বৈচিত্র্যের প্রভাব আলোচনা করা হল।

বিকালাঙ্গতা বা অক্ষমতা ঃ

জনবিভাজনের আরেকটি বিভাজক হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের অক্ষমতা যেমন— শারীরিক, মানসিক এবং পরিস্থিতিজনিত।

আমাদের এই বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের তাদের সক্ষমতা অনুসারে সমাজে স্থান করে দিতে হবে।

এছাড়াও আরোও বহু ধরনের সমাজ বিভাজক আছে যেমন— বাসস্থানের ধরণ বিবাহ, শহর বা

গ্রাম বংশানুক্রম ইত্যাদি। এইভাবে পুরো ভারতীয় উপমহাদেশেই বিভিন্ন ধরনের বিভাজন রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে বিভাজন কখনই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য নয় বরং সবরকম বিভাজনকে আত্তীকরণ করে ভারতীয় সংস্কৃতি ঐক্যবদ্ধতার বার্তা দেয়।

সামাজিক অন্তর্ভূক্তিকরণ ঃ

প্রত্যেক দেশেই বেশ কিছু সামাজিক গ্রুপকে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে অংশগ্রহণে বাধা দেওয়া হয়। শুধুই আইন করে নয়; ব্যবহার বিশ্বাস ও ধারনার উপর ভিত্তি করে এই বাধন সৃষ্টি করা হয়। এছাড়া সামাজিক অনগ্রসরতা লিঙ্গ, বয়স, অবস্থান, কর্মস্থান, ধর্ম, নাগরিকত্ব, অক্ষমতা ও লিঙ্গ প্রভৃতি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল।

সামাজিক বর্জন ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, চাহিদা ও সুবিধাপ্রাপ্তি থেকে মানুষকে চরমভাবে বঞ্চিত করে। এই বিষয়টি মাথায় রেখে জাতিপুঞ্জ দাবি তুলেছে 'No one leave behind' যা বিভিন্ন দেশকে অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়ণের মাধ্যমে সুস্থায়ী উন্নয়ণের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করছে। সামাজিক অন্তর্ভূক্তিকরণ এর এক আঙ্গাঙ্গিক অংশ।

বিশ্ব ব্যাঙ্ক সামাজিক অন্তর্ভূক্তির সংজ্ঞায় বলেছে—

১. এটি এমন এক পদ্ধতি যা ব্যক্তি ও গ্রুপের সামাজিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করে।

২. এমন এক প্রক্রিয়া যা পশ্চাদপদ গোষ্ঠীর ক্ষমতায়ণ সুযোগবৃদ্ধি ও সম্মান জ্ঞাপনের মধ্যে দিয়ে তাদের সামাজিক ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করে।

সামাজিকভাবে অন্তর্ভূক্তিমূলক সমাজ এমন এক সমাজকে বোঝায় যা সব বৈষম্য দূরে সরিয়ে রেখে সকলের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে গণতন্ত্রের উন্নয়ণ এবং পুঁজিবাদের বিবর্তনের সাথে সাথেই সামাজিক অন্তর্ভূক্তিকরণ বিষয়টি গতি লাভ করে। এটা খুবই বৈপীরত্যমূলক সামাজিক বৈশিষ্ট্য কারণ সমাজে রাজনৈতিক সংগঠনগুলি সমাজ বিভাজনের উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠেছে এবং শাসক রাজনৈতিক সংগঠন এই সমাজে বিভাজককে ভিত্তি করেই তাদের কাজ চালায়। অপর দিকে যুগে যুগে নতুন নীতি ও পথের মাধ্যমে সামাজিক অন্তর্ভূকরণ এর প্রচেষ্টা হয়েছে। এই অন্তর্ভূক্তিকরণ হয়েছে প্রয়োজন।

সামাজিক অন্তর্ভূক্তিকরণ, সামাজিক অঙ্গীভূত বা আত্তীকরণের সবথেকে ভালো উদাহরণ হলো ভারতীয় সমাজ যা যুগযুগ ধরে সামাজিক অন্তর্ভূক্তি ও আত্তীকরণের মাধ্যমে বহুজাতিকে গ্রহণ করেছে। মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া থেকে আগত বিভিন্ন উপজাতি যেমন— শক ও হুনদের ভারতীয় সমাজ গ্রহণ করেছে। নতুন নতুন শর্ত ও শব্দ প্রণয়ণ করা হয়েছে এদের সমাজে অন্তর্ভূক্তির উদ্দেশ্যে। 'ম্লেচ্ছ' শব্দটি শুধুমাত্র বিদেশীদের প্রণয়ণ হয়নি একইসাথে ভারতীয়দের সাথে এই বিদেশীদের সামাজিক সম্পূর্ণ নির্ধারণ করতো এই শব্দ। মধ্যযুগের ইতিহাসও এই ধরনের বিভিন্ন সামাজিক গ্রুপের অন্তর্ভূক্তিকরণের সাক্ষী।

উনিশি শতকের ব্রিটিশ শাসকেরা ভারতীয় সমাজের বৈশিষ্ট্যস্বরূপ স্থবিরতা ও অপরিবর্তনশীলতাকে তুলে ধরে ছিলেন। অপরিবর্তনশীল গ্রামীণ ভারতীয় সমাজ ও তার স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিলো এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। জাত ও ধর্ম বিভিন্ন ইউরোপীয় মতবাদ মূলতঃ এই ধারণায় উপর ভিত্তি করেই তৈরী হয়েছিল। কিন্তু বাস্তব চিত্র ছিলো অন্য। বিভিন্ন সামাগ্রিক সংগঠন ও গ্রুপের মধ্যে আদান প্রদান ছিলো যা ছড়িয়ে পড়েছিলো দেশ থেকে দেশান্তরে। তীর্থক্ষেত্র ছিলো এর এক প্রকৃষ্ঠ উদাহরণ বহু জাতি, তাদের চিন্তা ও ভাবনার সম্বন্বয় সাধন এই সরলরৈখিক অন্তর্ভূক্তিকরণ উর্দ্ধমুখী প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই বেশীরভাগ ঘটেছিলো। উপনিবিেশিক ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিকগণ ও বসবাসকারী ভারতীয়দের মধ্যে অন্যান্য, বিভিন্ন উপায়ে সম্পদ শোষণ দুই সমাজকে দুইমেরুতে অবস্থান করিয়েছিলো।

ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা, শাসিক ও শাসিত এই দুই এর মধ্যের অসাম্যকে জাতি, প্রযুক্তি ও সভ্যকরণ এর দোহাই দিয়ে আইনি স্বীকৃতি প্রদান করেছিলো। ঔপনিবেশকারীদের সমাজ ও উপনিবেশ এর মধ্যে প্রধান পার্থক্য ছিলো, সম্পদের মালিকানায় বৈষম্য যা ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্রের মতে 'ঔপনিবেশিক উৎপাদন ব্যবস্থা'। ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রাক উপনিবেশিক যুগেও সামাজিক অসাম্য ছিলো। ঐতিহাসিক ইরফাণ থাকিব দেখিয়েছেন যে মুঘল ভারতে গবীর মানুষের অবস্থা ছিলো সত্যিই সঙ্গীন। এই সামাজিক অসাম্য ও তার বৈশিষ্ট্য আগে ভালোভাবে জানা প্রয়োজন এবং তারপরেই কিভাবে তা দূরীকরণ সম্ভব তা নিয়ে ভাবতে হবে।

অন্তভূক্তির বিভিন্ন ধরন ঃ

যেহেতু আমরা সামাজিক বর্জনের ভিত্তি ও উপায়গুলো জানি তাই সামাজিক অন্তর্ভূক্তিকরণের নীতিগুলো আমরা বুঝতে পারি। বলাবাহুল্য চিরকালই এই সামাজিক অন্তভূক্তিকরণের জন্য নানা আন্দোলন রয়েছে যা বহুমুখী সমাজে এই অন্তর্ভূক্তিকরণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে। তবে জাতির ভিত্তিতে বিভাজিত এই সমাজে অন্তর্ভূক্তিকরণ প্রক্রিয়া বেশ জটিল। প্রথমেই সমাজে সেই বিশেষ শ্রেনীর অবস্থান জানা প্রয়োজন। এন. কে. বোস 1941 সালে তার গবেষণার মধ্য দিয়ে দেখিয়েছিলেন কিভাবে হিন্দু সমাজ বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীকে তাদের বিশেষ শিল্প দক্ষতার ভিত্তিতে হিন্দু সমাজ বিন্যাসে স্থান করে দিয়েছে। ঐতিহাসিকগণের মতে যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন গোষ্ঠী কোনো একজাতির নাম প্রথা করে ধীরে ধীরে বৃহত্তর ভারতীয় সমাজে ভঙ্গীভূত হয়েছে. অনেকের মতে ধর্মান্তকরণের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিবর্ণ নতুন সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে পড়লেও অনেকেই তাদের প্রাক্তন জাতির বিশ্বাস ও রীতিনীতি বজায় রেখেছে। সামাজিক ও জাতীয় কলেবর বৃদ্ধির সাথে সাথে নতুন নতুন গোষ্ঠী অঙ্গীভূত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ উত্তর পূর্বের নানা, মণিপুরি, মিজেন প্রভৃতি উপজাতিগুলি ভারতীয় সমাজের মূলস্রোতে অঙ্গীভূত হয়েছে যদিও তারা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিকাঠামোতে জাতি ও ধর্মের ভিত্তিতে কোনোটিই অবস্থান করেনি। উত্তরপূর্বের জাতিগত বৈচিত্র্য নিঃসন্দেহে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় এক নতুন অঙ্গ ছিলো এবং যাকে অঙ্গীভূত করতে হবে। সামাজিক অন্তর্ভূক্তিকরণ ভারতের জাতি গঠনের অন্যতম এক বৈশিষ্ট্য যা বিভিন্ন গোষ্ঠীকে এক অভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আঙিনায় এনেছে। ভারতীয় গণতন্ত্র এই অন্তর্ভূক্তিকরণ প্রক্রিয়াকে এক বিশেষ রূপ দান করেছে।

অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতক এবং পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতকে ভক্তি আন্দোলন সামাজিক বর্জন ও সংরক্ষণশীলতাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিলো। দক্ষিণ ভারতের ভীরশৈবা আন্দোলন এবং নানক, কবীর, রবিদাস প্রমুখ ভক্তি আন্দোলনের নেতৃত্ববর সামাজিক বর্জনের তীব্র সমালোচনা করেন এবং এক নতুন উদারবাদী চিন্তার প্রবর্তন করেন। পরবর্তীকালে সুফী আন্দোলনও ইসলামের গন্ডী ছাড়িয়ে সবধর্ম সম্বন্বয়ের আদর্শ, মানবতাবাদের আদর্শ তুলে ধরে।

ধর্মীয় সংস্কার এর সাথে সামাজিক সংস্কারের সুগভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। আর তাই উনিশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের নায়কেরা ধর্মীয়রীতি নীতি, অনুশীলতা ও সামাজিক বৈষম্যকে তীব্রভাগে আক্রমণ করেন। উনিশ শতকের গোড়ার থেকেই রাজা রামমোহন রায়, জ্যোতিবা ফুলে, শ্রী নারায়ণ গুরু, দয়ানন্দ সরস্বতী, দাদাভাই নৌরজী প্রমুখ সমাজ সংস্কারগণ প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের তাগিদ অনুভব করেছিলেন, তারা প্রচলিত জাতপাত, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। রাজা রামমোহন রায় মনে করতেন এই ধরনের বিভাজন থেকে যে কোনো সমাজের উন্নতির অন্তরায়। পরবর্তীকালে এম. জি. রানাডে, এন. জি. চন্দ্রভাকর প্রমুখ সমাজ সংস্কারকগণ সংস্কার আন্দোলনকে সমাজের মূলস্রোতে নিয়ে আসেন।

ইতিমধ্যে ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সংস্কারের কাজ করতে থাকেন। যেমন জ্যোতিবা ফুলে মেয়েদের জন্য স্কুল খোলেন এবং সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ছিলো সবথেকে বড়ো গণ আন্দোলন। এই গণ আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্যছিলো উদরতা, গণতান্ত্রিক এবং অন্তর্ভূক্তিমূলক, জাত ধর্ম, আঞ্চলিকতাকে দূরে সরিয়ে রেখে সর্বশ্রেণীর মানুষ এতে যোগদান করেছিলেন। মেননের মতে অসহাযোগ ও আইন-অমান্য আন্দোলনের সময় এক বিরাট সংখ্যক নারী এই গণ আন্দোলনে যোগদান করে এবং এমনকি কারা বরণও করেন। এছাড়া কম্যুউনিস্ট ও সোসাল সিস্টেমের প্রচেষ্টায় কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণী, প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষ করা বহু সংখ্যায় এই গণতান্ত্রিক গণ আন্দোলনে যোগদান করেন।

গান্ধীজীর আদর্শবাদ এই সামাজিক অন্তর্ভূক্তিকরণের মধ্যে দিয়েই প্রোথিত হয়েছিল। সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষকে জাতীয়বাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিয়ে সবাইকে এক বৃহত্তর আঙিনায় নিয়ে আসা তার সর্বাধিক সাফল্য। তিনি অস্পৃশ্যতা ও হিন্দু মুসলিম বিভাজনকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ব্যধি হিসাবে উল্লেখ করেন এবং কখনোই এইসব বিভাজিকা শক্তির বিনিময়ে স্বাধীনতা চাননি। তিনি মনে করতেন যদি এই সকল সামাজিক ব্যাধি থেকে আমরা নিজেদের মুক্ত করতে না পারি তবে বিদেশী শক্তির নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা অর্জন অর্থহীন হয়ে যাবে। জাতিপাত হীন এক সমাজ গড়ার লক্ষ্যে গান্ধীজীর আপোষহীন লড়াই ইতিহাসে এক অনন্যস্থান অধিকার করে আছে। গান্ধিজী নিজেই এই আন্দোলন শুরু করেছিলেন বিশেষ করে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে। উনিশো চব্বিশ-পঁচিশ এবং 1934-35 সালে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে তিনি সমগ্র ভারত ভ্রমণ করেন এবং অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে জমিও গঠন করেন। উচুঁজাতের লোকেরা যাতে নিজের থেকে এগিয়ে এসে এই অস্পৃশ্যতার প্রথা বন্ধ করে সেই বিষয়ে গান্ধীজী জোর দিয়েছিলেন। বংশ পরম্পরা সুবিধা ভোগের মধ্যেই অস্পৃশ্যতা লুকিয়ে আছে বলে

গান্ধিজী মনে করতেন। বংশ পরম্পরাগত সুবিধা ভোগকে অবলুপ্তি ঘটিয়ে জাতপাত ও অস্পৃশ্যতা থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব। তাই তিনি এই ধরনের অন্যান্য উদাহরণগুলোকে অস্পৃশ্যতা নামক ভয়ঙ্কর রোগের বহিলক্ষণ বলে মনে করতেন। গুরুভাশুর ও ভাইকম 'মন্দির প্রবেশ' আন্দোলন এই অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের প্রাথমিক ধাপ হিসাবে মনে করা হয়।

গান্ধিজী চেয়েছিলেন যে সমস্ত উঁচুজাত অস্পৃস্যতাকে জন্ম ও প্রশ্রয় দিয়েছে তারা এই প্রথা বন্ধ করতে নিজের থেকেই এগিয়ে অমুক এবং ঐ অস্পৃশ্যতাদের সামাজিক সম্মান দিক। তাই তিনি চেয়েছিলেন নিচুজাতের, অস্পৃশ্য মানুষদের সামাজিক অন্তর্ভূক্তি হোক স্বতঃস্ফূর্তভাবে, কোনো অধিকারের ভিত্তিতে নয় কারণ তিনি জানতেন অন্তর থেকে স্বেচ্ছায় যদি সমাজ তাদের গ্রহণ না কার তবে কোনোদিনই লক্ষ্যপূরণ হবে না। গান্ধিজী হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে বিভাজন ভারতের জাতীয়তাবাদী রাজনীতির প্রধান অন্তরায় বলে মনে করতেন এবং এই বিভাজন ভুলে হিন্দু ও মুসলিমদের ঐক্য ও ভালোবাসার বন্ধনে তিনি আবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। দাঙ্গা বিধস্ত নোয়াখালিতে তিনি হিন্দু রমণীদের মুসলিম রমণীদের শিক্ষাদান করতে বলেছিলেন কারণ এর মধ্য দিয়ে তিনি উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদের পাঁচিল ভাঙতে চেয়েছিলেন। তিনি জিন্নার মধ্যে সমঝোতা করেছিলে কারণ তিনি মনে করতেন দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ বিভাজন আসলে একপ্রকার সামাজিক বাউন্ড।

দলিতদের খ্রীস্টানধর্মে ধমান্তকরণকে তিনি তীব্র সমালোচনা করে বলেন যে এইভাবে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তিনি মনে করতেন এতে এক ধর্মের দ্বারা অপর ধর্মের অসম্মান হয়। বরং সেইসব ধর্মীয় রীতিনীতির সংশোধন করে সেইসব অত্যাচারিত মানুষদের ন্যায়বিচারের পক্ষে তিনি সওয়াল করেন। বাস্তবেই ধর্মান্তকরণ সামাজিক অন্তর্ভূক্তির পরিবর্তে এক নতুন ধরনের সামাজিক বর্জন ব্যবস্থা তৈরি করে। সামাজিক অন্তরর্ভূক্তমূলক প্রক্রিয়া অবশ্যই কোনো হিংসা বা দাঙ্গা ছাড়াই সংগঠিত করতে হবে। নেলসন ম্যান্ডেলা গান্ধিজীর এই নীতিকেই বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনে প্রয়োণ করেছিলেন। মার্টিন লুথার কিং আমেরিকাতে কালো মানুষদের অধিকারের আন্দোলনে এই নীতির প্রয়োগ ঘটান।

গণতান্ত্রিক অন্তর্ভূক্তিকরণ ঃ

গান্ধী অনুসূত সামাজিক অন্তর্ভূক্তিকরণ পদ্ধতি মূলতঃ অহিংসার আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো। তিনি শ্রম ভিত্তিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতির উপর জোর দিয়েছিলেন। অহিংস অন্তর্ভূক্তিকরণের সাথে গণতান্ত্রিক অন্তর্ভূক্তিকরণের এক সহাবস্থান লক্ষ্যনীয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বগণও এইভাবেই অন্তর্ভূক্তির পক্ষে সওয়াল করেন। যেমন নেহেরু সোশালিস্ট মতবাদের উপর ভিত্তি করে এবং আম্বেদকার জাত-পাত ব্যবস্থা নির্মূল করে অন্তভূক্তির পক্ষে সওয়াল করেন। গণতন্ত্র ও উন্নয়ণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই কোনোরূপ হিংসা ছাড়াই এই সামাজিক উন্নয়ণ সম্ভব। ন্যায়বিচার এবং সমতা সমস্ত বিষয়ের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। উপরোক্ত কারণেই বিশ্বসংস্থাগুলিকে জাতি ও ধর্ম নিরপেক্ষ হওয়ার দাবী ওঠে। জাতহীন সমাজ এবং উপনিবেশ বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম ভারত জোরালো আওয়াজ তোলে। ঐতিহ্য এবং ঐতিহ্যবাদী সংগঠনগুলি যেমন—গোষ্ঠী, জাতি ইত্যাদি সামাজিক অসাম্যের মূলভিত্তি। কারন এগুলি সামাজিক অসাম্যকে

আইনের ভিত্তিতে দৃঢ়ভাবে স্থাপিত করে। আর এই অসাম্য দূরীকরণে শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। সারা বিশ্বজুড়েই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলি সামাজিক অন্তর্ভূক্তির গুরু দ্বায়িত্ব পালন করে আসছে। স্বাধীন ভারতবর্ষেও অন্তর্ভূক্তিমূলক শিক্ষানীতির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে প্রায় 40% ভারতীয় শিশু বিদ্যালয়ে যায় না। বেশ কিছু সংস্থার যেমন এম. ভি. ফাউন্ডেশন, সমীক্ষা অনুযায়ী দাবিদ্র নয় মূলতঃ প্রাপ্তনীতি এর জন্য দায়ী। তাই শিক্ষা আজও সামাজিক অন্তর্ভূক্তির প্রধান মাধ্যম কারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন গোষ্ঠীর শিশু এক অভিন্ন আঙিনায় এসে পড়ে সেখানে তাদের বিভিন্ন আধুনিক মতাদর্শ যেমন— গণতন্ত্র, লিঙ্গ সমতা, ন্যায়বিচার সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করা হয় যা নতুন প্রজন্মের মধ্যে সামাজিক অন্তর্ভূক্তির প্রয়োজনীয়তাকে প্রোথিত করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে আম্বেদকার মনে করতেন হিন্দুধর্ম জাতপাত ও অস্পৃশ্যতাকে আইনি মানত্য দিয়েছে। আবার কমিউন্সিটদের মতে ধর্ম ভিত্তিতে গঠিত গোষ্ঠীতে লিঙ্গ বৈষম্য ও শ্রেণী শোষণ লুকিয়ে থাকে। উন্নয়ণের সাথে আধুনিকীকরণের উপর তাই বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে যাতে নাগরিকত্ব ন্যায় বিচারের পাশাপাশি সামাজিক সমতার বিষয়টিও দৃঢ় ভিত্তিতে প্রোথিত হয়।

6.5 শিক্ষা ও বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা

6.5.1 জন বিস্ফোরণ

সত্তরের দশকের মধ্যভাগ থেকেই শিক্ষা ও জনসংখ্যার মধ্যে সম্পর্ক নিরুপণে গবেষকদের মধ্যে উৎসাহ দেখা দেয়। উনিশ শতকের গোড়া থেকেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা দ্রুত হারে বাড়তে থাকে। বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর জনসংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর জনসংখ্যা পূর্বের 10,000 বছরের থেকে 50 গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধুমাত্র অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যে পৃথিবীতে জনসংখ্যা 7 গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই জনবিস্ফোরণ পরিবেশ ও মানব উন্নয়ণে কতখানি প্রভাব ফেলবে তা নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত। বহু বিশেষজ্ঞ ও নীতি প্রণয়ণকারীর মতে শিক্ষার প্রসার এই জনসংখ্যার বৃদ্ধিতে এক সীমিত স্তরে বেঁধে রাখতে সক্ষম। তাই তারা মনে করেন লিঙ্গ লাভের সুযোগ বৃদ্ধি বিশেষতঃ নারীদের জনসংখ্যার চাপ কমাতে সহায়ক হবে। আগামীতে নীতি প্রণয়ণকারীগণের কাছে বিতর্কের বিষয় কিভাবে শিক্ষালাভ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে জনবিস্ফোরণের প্রধান কারণ ছিলো মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে যাওয়া। এই সময় শিশু মৃত্যুর হারপ্রতি তিনজনে একজনের মৃত্যু থেকে কমে প্রতি একশো জনে একজন হয় উন্নত দেশগুলিতে এবং প্রতি দশজনে একজন হয় উন্নয়ণশীল দেশগুলিতে। সম্পদশালী দেশগুলিতে জন্মহার এমনভাবে স্থিতিশীল করা হয়েছিলো যাতে জন্মহার ও মৃত্যুহারের মধ্যে এক সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হয় এবং এর ফলে ঐ সব দেশগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এক শতাংশের নীচে নেমে

যায়। অর্থনৈতিকভাবে বিওসালী দেশগুলিতে মহিলাদের তাদের সমগ্র প্রজননক্ষম সময়ে সন্তান উৎপাদনের হার গড়ে সাতটি বাচ্চা থেকে দুয়ের কম হয়। কিন্তু এর বিপরীত চিত্র দেখা যায় গবীর দেশগুলিতে সেখানে মৃত্যুহার দ্রুত কমলেও জন্মহার তার সাথে তাল মিলিয়ে কমেনি। যার ফলশ্রুতি স্বরূপ জন্মহার, মৃত্যুহারের থেকে অনেক বেশী হওয়ায় সারা পৃথিবী জন বিস্ফোরণের সম্মুখীন হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, যে সমস্ত দেশগুলিতে সামাজিক ও শিক্ষাখাতে খুব কম ব্যয় করা হয় সেইসব গরীব দেশগুলিতে জনসংখ্যা সব থেকে বেশী। উপরোক্ত কারণ দূরীকরণ কড়া হাতে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারার কারণে ধনী ও গরীবের মধ্যে ফারাক ক্রমাগত বাড়তেই থাকবে। তাই সুস্থায়ী জন্মবৃদ্ধির জন্য শিশু জন্মের হার কমাতে হবে। 1976 সাল থেকেই বিভিন্ন স্কলার গণ তাদের গবেষণায় দেখিয়ে ছিলেন কিভাবে নারীদের শিক্ষিত করে তুলতে পারলে মৃত্যুহার, জন্মহার এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। এই সকল গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিলো প্রকৃত অর্থে জন্মহারের সাথে শিক্ষার সুগভীর সম্পর্ক আছে নাকি ক্ষীণ সম্পর্ক আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে নারী শিক্ষা ও নারীর প্রজনন ক্ষমতার মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান কিন্তু এর ফলে শিক্ষার উপর কোনো প্রভাব পড়ে না। উল্টে যে সমস্ত সমাজে নারী শিক্ষায় জোর দেওয়া হয় এবং নারীর কল্যাণ ও ক্ষমতায়ণের চেষ্টা করা হয় সেখানে সাথে তারা নারীর প্রদান ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয় যাতে নারীগণ সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী হন।

6.5.2 বেকারত্ব (Unemployment)

বেকারত্ব দেশের একটি জ্বলন্ত সামাজিক সমস্যা, বেকারত্ব সাধারণ ব্যক্তির জীবনে একটি অনভিপ্রেত, অবাঞ্ছিত অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীন অবস্থার সৃষ্টি করে এবং বেকারত্বের সীমাকাল সেই ব্যক্তির জীবনে দীর্ঘায়িত হলে, তা জীবনের বিভিন্ন সুযোগ ও জীবনযাত্রার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বেকারত্ব একটি গুরুতর সমস্যা যা ভারত স্বাধীন হবার পর থেকে এর সাথে যুদ্ধ করে চলেছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও অপ্রতুলান চাহিদার কারণে ভারতে বেকারত্বের সমস্যা আরোও তীব্র আকার ধারণ করেছে। এছাড়াও, ধীর অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, মৌসুমী বায়ু নির্ভরশীল পেশা, কুটির শিল্পের পতন ইত্যাদি বেকারত্ব সমস্যার সৃষ্টিতে কারণ হিসাবে কাজ করে চলেছে। এখন পরিস্থতি এতটাই জটিল হয়ে উঠেছে যে, উচ্চশিক্ষিত যুবক-যুবতীরা বেকারত্বের জ্বালা মেটাতে তারা ঝাড়ুদারের কাজ করতেও প্রস্তুত। জনসংখ্যার একটি বড় অংশ কৃষিকাজের সাথে যুক্ত এবং কাজটি শুধুমাত্র বীজ রোপণ ও ফসল কাটার — এই দুটিতেই কর্মসংস্থান জোগায়। যার বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

বেকারত্ব একটি সামাজিক সমস্যা যা অপরাধের হার বৃদ্ধি করে, রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি করে সমাজের বুকে এবং যা শেষ পর্যন্ত জাতিকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

6.5.3 দারিদ্রতা (Poverty)

দারিদ্রতা বলতে এমন এক সামাজিক অবস্থানকে বোঝায় যা সাধারণত চিহ্নিত করা হয় বেঁচে থাকার জন্য প্রত্যাশিত জীবনযাত্রার একটি নুন্যতম স্তর দ্বারা, সাধারণত যে পরিবেশে মানুষটি বেঁচে

আছে সেই পরিবেশে সুস্থভাবে বাঁচতে গেলে নুন্যতম যেসব প্রয়োজনীয় জিনিসলাগে তার দ্বারা, সেটি যদি উক্ত মানুষের না থাকে তবে তিনি দারিদ্র্য। এই ধরনের ব্যক্তিরা নির্ধারিত সামাজিক জীবনযাত্রার মান থেকে নিচুস্তরে থাকে— এদের দরিদ্র বলা হয়। অর্থাৎ একজনের যা আছে এবং একজনের যা থাকা প্রয়োজন — এই দুইয়ের মধ্যে যে বৈষম্যের অবস্থা সৃষ্টি হয় তাকেই দারিদ্র বলে।

ভারতবর্ষের একটা বিরাট অংশের মানুষ, খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণ করতে পারে না। এর ফলে ভারতীয় সমাজ সামগ্রিকভাবে প্রভাবিত হয়। এই অংশের মানুষদের দরিদ্র সমাজ বলা হয়। দারিদ্রতা সাধারণত ধনসম্পদ ও বস্তুগত সম্পদের অসম বন্টনের ফলে তৈরি হয়। এর পিছনে পশ্চিমী সমাজের শিল্পায়ণ নীতির এবং বিশ্বায়ম অর্থনীতির উল্লেখযোগ্য প্রভাব আছে। দারিদ্রতা শুধুমাত্র সুযোগের অভাব নিজেক বা নিজের জীবনের কাঠামোকে উন্নত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। দারিদ্র্যের সাথে অর্থনৈতিক অবস্থা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত যার সরাসরি প্রভাব পড়ে সেই ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন অত্যাবশীয় রসদের উপর, যেমন— খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, নিরাপদ পানীয়, এবং আয়ের উপর। সংস্কৃতি, ক্ষমতা, সামাজিক কাঠামো ইত্যাদি কারণগুলি মূলত যা ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণের বাইরে তা প্রধানত সমাজবিজ্ঞানীরা দারিদ্র্যের কারণ ব্যাখা করতে ব্যবহার করেন, ভারতের প্রায় ২/৩ অংশ মানুষ দারিদ্র্যের নীচে বসবাস করে।

অর্থনৈতিক দিক থেকে সমাজবিজ্ঞানীরা সাধারণত দারিদ্র্য দুই রকমভাবে পরিমাপ করেন—

1. **চরম দারিদ্র (Absolute Poverty)**

   চরম দারিদ্র্য বলতে বোঝায় কোনো দেশের জনসাধারণের উপার্জন এত কম যে, তারা জীবন ধারণের জন্য ন্যুনতম পরিমাণ খাদ্যশস্য, ডাল, দুধ ইত্যাদি গ্রহণ করতে পারে না।

2. **আপেক্ষিক দারিদ্র্য (Relative Poverty)**

   বিভিন্ন লোকের আয় যখন তুলনা করা হয়, তখন দেখা যায় এক শ্রেণির লোকের আয় অন্য আর এক শ্রেণির তুলনায় কম। বিভিন্ন লোকের আয় তুলনামূলকভাবে বিভিন্ন লোকের থেকে অপেক্ষাকৃতভাবে কম — একে আপেক্ষিক দারিদ্র্য বলা যায়। উন্নত দেশগুলিতে দারিদ্র্য আংশিক। অন্যদিকে আমাদের দেশে গণদারিদ্র্য দেখা যায়।

যেকোন সমাজের বিকাশ মাপার ক্ষেত্রে আপেক্ষিক দারিদ্র্য ব্যবহার করা হয়। মানুষ নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে দারিদ্র্যতা মাপার ক্ষেত্রে অনেক সূচক ব্যবহার করে। যেমন অনুন্নত দেশে জল বা ফ্লাশ টয়লেটকে প্রয়োজন অনুসারে দেখা হয় না, সেখানেই আরোও উন্নতদেশে রেফ্রিজারেটর বা টেলিফোনকে প্রয়োজনীয় জিনিস হিসাবে দেখা হয়।

6.5.4 নিরক্ষতা (Illiteracy)

নিরক্ষরতা বলতে পড়তে ও লিখতে পারার অক্ষমতাকে বোঝায়। নিরক্ষরতা, সারা বিশ্বের অন্যতম

বড় সমস্যা। নিরক্ষরতা সাধারণত বিভিন্ন আন্ত সম্পর্কিত বিষয় থেকে তৈরি হয়, জীবনের অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাঁধার সৃষ্টি করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যে সব পরিবারে প্রবল অর্থনৈতিক বাধা আছে সেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হয়। আবার যে সব পিতামাতা সামান্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত, তারাও শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হয়। সেইজন্য কোন কোনক্ষেত্রে, নিরক্ষরতা আন্তঃপ্রজন্মীয় সংক্রমণ হিসাবে পরিচিত। ভারতের সামাজিক প্রেক্ষাপটে যেসব সামাজিক বৈষম্য আছে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই নিরক্ষরতাকে প্রভাবিত করে। এছাড়া লিঙ্গ বৈষম্য, বর্ণবৈষম্য, প্রযুক্তিগত বৈষম্য ভারতের স্বাক্ষরতার হারকে নির্দিষ্ট করেছে বর্তমান সমাজে।

6.6 সারসংক্ষেপ

আমরা এই অধ্যায়ে জেনেছি বহুত্ববাদী সমাজ বলতে কি বোঝায় ও ভারতীয় সমাজ কিভাবে বহুত্ববাদী সমাজের প্রকৃত উদাহরণ। আমরা জেনেছি সামাজিক বৈষম্য কি এবং এর বিভিন্ন উপাদান যেমন ভাষা, ধর্ম, জাতি, উপজাতি, লিঙ্গ এবং অক্ষমতা যা সমাজকে শ্রেণিবদ্ধ করে ও বহুত্ব ও বৈচিত্র্য নিয়ে আসে। এছাড়াও, আমরা বিভিন্ন সমসাময়িক সমস্যা সম্বন্ধে জেনেছি এই অধ্যায় থেকে। বিভিন্ন সমসাময়িক সামাজিক সমস্যা যেমন জনসংখ্যার বিস্ফোরণ, বেকারত্ব, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ইত্যাদির শিক্ষার উপর কিভাবে প্রভাব ফেলছে তার উপর আলোকপাত করছে।

6.7 স্বমূল্যায়ণ প্রশ্নাবলী

1. ভারতীয় সমাজ কিভাবে বহুত্ববাদী সমাজ?
2. সামাজিক বৈষম্য কি?
3. দুটি সামাজিক বৈচিত্র্যের উদাহরণ দাও।
4. লিঙ্গ বৈষম্য সম্পর্কে তোমার মতামত কি?
5. ভারতীয় সমাজে ভাষার ভূমিকা কি?
6. ভারতীয় সমাজে ধর্ম কী ভূমিকা পালন করে?
7. সামাজিক অন্তর্ভুক্তি বলতে কি বোঝায়?
8. সামাজিক বর্জনের বিরূপ প্রভাব কি?
9. গণতান্ত্রিক অন্তর্ভুক্তি বলতে কি বোঝায়?
10. জনসংখ্যা বিস্ফোরণ কি?

11. অধিক জনসংখ্যার কারণে সৃষ্ট দুটি সামাজিক সমস্যার উল্লেখ কর।
12. জনসংখ্যা বিস্ফোরণের কারণে শিক্ষার উপর কি বিরূপ প্রভাব পড়েছে তা আলোচনা কর।
13. বেকারত্ব বলতে কি বোঝ?
14. পরম দারিদ্র্য কী?
15. নিরক্ষরতা বলতে কি বোঝ?

6.8 অভিসম্বন্ধ (Reference)

Bhattacharya, D. C (1996). Sociology (6th ed.) Cacutta Vijoya Publishing House.

Chodhury R. K. Society and Culture : Plurality of Culture in India, Retrieved from https://www.sociologygroup.com/plural-society-meaning

Rao, Shakar, C.N. (2012) Sociology (7th ed.). Mangalore Karnataka : S. Chand & Company Pvt. Ltd.

Sharma, C. B (2017) Social Deiversity and Education, Retrieved from : https:// egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/8326/1/Unit 16 pdf

Sharma R. S. (1990) Sudras in Anicent India (3rd ed.) New Delhi

NOTES